ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক : জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা ও সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা আমলের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা (১৯৯৮-২০১৪)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের

অধীনে পি.এইচ.ডি. উপাধি প্রাপ্তির শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

দেবাশিস মহাপাত্র

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. ইমনকল্যাণ লাহিড়ী

অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

২০১৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

একবিংশ শতাব্দীতে ভারত ও বাংলাদেশ সম্পর্ক মানবসভ্যতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার নতুন আবর্তে মানবতার পথকে প্রশস্ত করেছে উভয়দেশ। স্বাধীনোত্তর ভারতের অবদানের স্বীকৃতি ও ভাষা আন্দোলনের সফল সমাপ্তির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ। সময়ের কালপ্রবাহে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ভারতের অভিভাবকত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও শিরা ও ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে বাংলাদেশের হৃদস্পন্দন। তাই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক অতীত থেকে বর্তমানে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ভূ-রাজনীতি, ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভাস বিভিন্ন দিক থেকে একে অপরের সঙ্গে অভিন্ন হৃদয়েরও আবেগের অধিকারী। এই সম্পর্কের ধারাবাহিকতা ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা (NDA) এবং সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা (UPA) সরকারের আমলে কিরূপ ছিল তার পর্যালোচনাই আমার গবেষণা প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সম্পর্কের নয়া দিগন্ত উন্মোচন ও বিশ্ব রাজনীতির নয়া সমীকরণ অন্বেষণই এই গবেষণার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু।

তাই এই গবেষণা প্রবন্ধে বিচরণের আগে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। এই গবেষণা প্রবন্ধটি আমি আমার বাবা ও মায়ের প্রতি আমার শিক্ষাজীবনের শ্রদ্ধা হিসাবে উৎসর্গ করলাম। এই প্রবন্ধটি মূলতঃ রচিত হয়েছে গ্রন্থাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে ভিত্তি করে, এবং গবেষণা নিবন্ধটি রচনা করা যাঁর অনুপ্রেরণা ও সস্নেহ ভালোবাসা, আশীর্বাদ ও তত্ত্বাবধান ছাড়া সম্ভব হতো না, তিনি হলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ইমন কল্যাণ লাহিড়ী (ইমন দা) সহ-অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁকে আমার যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই। এছাড়া প্রণাম জানাই অধ্যাপক ত্রিদিব চক্রবর্তী, অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বসু, অধ্যাপক অনিন্দ্যজোতি মজুমদারকে, যাঁরা এই গবেষণার কাজে কোনা না কোন ভাবে সহযোগীতা ও পরামর্শদান করেছেন। প্রনাম জানাই আমার কাকু অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রকে, যিনি আমার জীবনের পথ প্রদর্শক হিসাবে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা দিয়ে চলেছেন। প্রনাম জানাই আমার শিক্ষক অপূর্ব মুখোপাধ্যায়কে-যিনি আমাকে নানাভাবে উৎসাহ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন NIAS থেকে। শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই আমার শিক্ষক মহাশয় অধ্যাপক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে, যিনি আমাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়তে ও লিখতে শিখিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার স্ত্রী সুস্মিতা মহাপাত্র ও পুত্র দেবস্মান মহাপাত্রকে, যাঁরা আমাকে গবেষণা প্রবন্ধ রচনার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে এবং সস্নেহ ভালোবাসার আবর্তে বেঁধে রেখেছে। কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই আমার ছাত্রীদ্বয় রূপালী ও মৌমিতাকে যারা প্রত্যক্ষভাবে গবেষণার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছে।

এছাড়া ধন্যবাদ জানাই দিল্লীতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের আধিকারিক ইমানূল হক চৌধুরী এবং মোর্সেদা হাইকে এবং কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে। যাঁরা অকৃত্রিমভাবে গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ব্যবহারে সহযোগিতা করেছেন। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের গ্রন্থাগারিক পার্থদাকে যিনি প্রতি মুহূর্তে সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়াও ধন্যবাদ জানাই মৌলনা আবুল কালামা আজাদ ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ এর গ্রন্থাগারিক, নেতাজী ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ-এর গ্রন্থাগারিক ও মহিষাদল প্রজ্ঞানানন্দ মেমোরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিককে। যাঁরা বিভিন্নভাবে সাহায্য ও বই ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে কৃতজ্ঞ করেছেন। এছাড়া কৃতজ্ঞতা জানাই সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সের এর গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দকে। প্রবন্ধটি রচনা করতে গিয়ে কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের যে সহযোগিতা পেয়েছি তা অনস্বীকার্য।

এরসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই অর্ণব ভট্টাচার্য্যকে যিনি আমার হাতের লেখা পাঠ করে পাণ্ডুলিপিটিকে একটি গ্রহণযোগ্য জায়গায় নিয়ে এসেছেন। গবেষণা প্রবন্ধটিকে একটি কাঠামোগত রূপদান করেছেন ধর ব্রাদার্সের কর্মীবৃন্দ। তাই তাঁদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

এই গবেষণা প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে যদি কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকে তাঁর দায়িত্ব অবশ্যই নিজের। আগামী দিনে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে সব গবেষক/গবেষিকা গবেষণা করবেন এবং যাঁরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পাঠক পাঠিকা, আশাকরি ভবিষ্যতে তাদের কিঞ্চিৎ তথ্যানুসন্ধানে সাহায্যে আসবে আমার এই গবেষণা প্রবন্ধ। এছাড়া এই গবেষণা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণে রাখতে চাই।

ধন্যবাদান্তে

দেবাশিস মহাপাত্র

বি-৭০ নিউগড়িয়া কো-অপারেটিভ
পো: পঞ্চসায়র
কলকাতা-৭০০০৯৪
মোবাইল- ৯৯৩২০৯০৯১৫
ইমেল- dmahapatramgc@gmail.com
deba_sush2007@yahoo.com

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-১০
প্রথম অধ্যায়	
NDA সরকার পূর্ব ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক	১১-৭০
দ্বিতীয় অধ্যায়	
NDA সরকারের আমলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক (১৯৯৮-৯৯, ১৯৯৯-২০০৪)	৭১-৯৪
তৃতীয় অধ্যায়	
UPA-I ও UPA-II এর আমলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক (২০০৪-২০০৯, ২০০৯-২০১৪)	৯৫-২০১
চতুর্থ অধ্যায়	
ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়নে সার্ক (SAARC) একটি মঞ্চ	২০২-২৩৯
পঞ্চম অধ্যায়	
'পূবে তাকাও নীতি' ও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক	২৪০-২৫০
উপসংহার	২৫১-২৮৩
তথ্যপঞ্জি	২৮৪-২৯৪
পরিশিষ্ট	২৯৫-৩২৮

ABBREVIATIONS

ADCs – Autonomous District Councils
AL – Awami League
APCRICRO – Association for the Protection of citizens' Rights for Indian Chitmahal Residents and Oustees.
ASEAN – Association of South East Asian Nations
BDR – Bangladesh Rifles
BIM – Bangladesh Islamic Mancha
BIMSTEC – Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Economic Technical Cooperation
BJP – Bharatiya Janata Party
BNP – Bangladesh Nationalist Party
BPDB – Bangladesh Power Development Board
BSF – Border Security Force
CBM – Confidence Building Measures
CG – Caretaker Government
CHT – The Chitagang Hill Tracts
CHTDB – Chitagong Hill Tracts Development Board
CII – Confederation of Indian Industries
EEC – European Economic Commission
EU – European Union
FDI – Foreign Direct Investment
FICCI – Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries
GAIL – Gas Authority of India Limited
IBCCI – India-Bangladesh Chamber of Commerce and Industries
IBP – India- Bangladesh Passport
ICCR – Indian Council for Cultural Relations
ICP – Integrated Check Post
IGCC – Indira Gandhi Cultural Centre
IMDT – Illegal Migrant Determinant Tribunal
IMF – International Monetary Fund
IORARC – Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation
ISI – Inter services Intelligence
ITEC – Inter Technical and Economic Cooperation
JEC – Joint Economic Commission
JMB – Jamatul Muzahiddin Bangladesh
JRC – Joint River Commission
JWG – Joint Working Group
KLO – Kamtapuri Liberation Organization
MCCI – Merchants Chambers of Commerce and Industries

MNF – Mizo National Front
MOU – Memorendum of Understanding
NAFTA – North Atlantic Free Trade Area
NDA – National Democratic Alliance
NDFB – National Democratic Front of Boroland
NLFT – National Democratic Front of Tripura
NSCN – National Socialist Council of Nagaland
NTPC – National Thermal Power Corporation
ONGC – Oil and Natural Gas Commission
OPEC – Organization for Petroleum Exporting Countries
PCJSS – Parbattya Chattagram Janasanghati Samiti
PGCIL – Power Grid Corporation of India Limited
RAW – Research and Analysis Wing
SAARC – South Asian Association for Regional Cooperation
SAFTA – South Asian Free Trade Area Framework Agreement
SAPTA - South Asian Preferential Trade Agreement
SB – Shanti Bahini
SEZ – Special Economic Zone
SFG – Strategic Foresight Group
ULFA – United Liberation Front of Assam
UPA – United Progressive Alliance
US – United States
WTO – World Trade Organization

ভূমিকা

ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক : জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা ও সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা আমলের একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা (১৯৯৮–২০১৪)

India-Bangladesh Relations : A Comparative Study of NDA & UPA Government (1998-2014)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতির আঙিনায় গড়ে ওঠা সভ্যতার দুটি কেন্দ্র ভারত ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, যাকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে বিস্তীর্ণ সীমান্ত তথা হিমালয় পর্বতমালা তাঁর গর্ভ থেকে প্রবাহিত গঙ্গা ও পদ্মা। ভারত সম্ভাব্য প্রভাবশালী শক্তির মর্যাদা লাভ করলেও, বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষতার অংশীদার ও তৃতীয় বিশ্বের অগ্রবর্তী সদস্য হিসাবে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। এই দুটি দেশের আলোচনা ব্যতীত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আন্তর্জাতিক রাজনীতির কোন কার্যকর আলোচনা সম্ভব নয়।

ভারত ও বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার এক ও অভিন্ন পীঠস্থান। দক্ষিণ এশিয়ার দুটি প্রভাবশালী রাষ্ট্র হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব অপরিসীম। অভিন্ন হৃদয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য ও পরম্পরা, ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রথা-রীতি-নীতি শিল্প ও সাহিত্য, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি একসূত্রে গ্রথিত করেছে ভারত ও বাংলাদেশ সম্পর্ককে। এইভাবে বহুমুখী সম্পর্ক উভয় রাষ্ট্রের উত্তরণে ধারবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে।

দক্ষিণ এশিয়ায় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ভাষা আন্দোলনের সার্থক সফলতা ও ভারতের প্রত্যক্ষ সহায়তায় আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে ভারতের ভূমিকা এবং বিশেষত সামরিক সাহায্য ভারতকে বাংলাদেশের মিত্রতা অর্জন করতে সাহায্য করে। এই মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে উঠে আসে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের তিক্ততা। এই যুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পর্যবেক্ষক ভারত ও পাকিস্তান উভয়কে তিনটি প্রস্তাব দেয় যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতপুষ্ট। সেগুলি হল এক, মুজিবর রহমান ও পাকিস্তান আলোচনার মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্যার সমাধান করুক; দুই, ভারত সরকার সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করবে

না ততক্ষণ যতক্ষণ না উদ্বাস্তুরা স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ জায়গায় না পৌঁছায়; তিন, মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে চালিত করার পক্ষে ছিলেন পর্যবেক্ষক। যা ভারত প্রত্যাখ্যান করে এবং সোভিয়েত সমর্থন লাভ করে।[১] যার ফলশ্রুতি হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি।

এই স্বাধীনতা গড়ে উঠেছিল ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সফল সূচক হিসাবে। এ সম্পর্কটি ছিল— "based on the Principles of mutual respect for each others sovereignty and territorial integrity, non-interference in internal affairs, equality and mutual benefit"[২] এ প্রসঙ্গে তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ আব্দুল কাদের মোল্লা বলেছিলেন— "Indias involvement in the liberation movement was based on humanitarian grounds."[৩] তাই বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান পাকিস্তানী জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বলেছিলেন "Bangladesh-India Bhai Bhai"[৪] তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বাংলাদেশের মুক্তি ঘোষণাকে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন "Dhaka is now the free capital of free country [৫] এরই সূত্র ধরে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ধারাবাহিকতা আজও বিদ্যমান।

১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ ভারতের সংবিধানের অনুকরণে রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের পরিকল্পনা করে। এবং ঐ বছর মার্চ মাসে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল— "the foundation of a special and mutually beneficial friendly ties between the two"[৬] বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা মুজীবর রহমানের শাসনকালে (১৯৭২-১৯৭৫) ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। বিদেশনীতিতে মুজীবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ঠাণ্ডা যুদ্ধে কোন সামরিক-জোটে যোগদানে বিরত থাকে। বাংলাদেশ ভারতের ন্যায় জোট নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণকরে। সুসম্পর্কের এই অধ্যায় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা ও রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশই সামনে এসে পড়ে ১৯৭৫ সালে মুজীবের নৃসংশ হত্যার পর। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এক উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়, যা ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্কের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।[৭] এইসময় বাংলাদেশে পাকিস্তানের সমর্থনকারী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে, যাদের মনে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের গুরুত্ব ও আয়তন নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। যাইহোক বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য ও স্বাধীনতার পরে বিপুল আর্থিক সাহায্যদান সত্ত্বেও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটল মুজীবের মৃত্যুর পর। বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে

মাথাচাড়া দেয় ইসলামী মৌলবাদ। প্রতিষ্ঠিত হয়— "Spiritual heritage of Bengaladesh's nationalism"[৮], অভিষেক ঘটে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের তাই সঙ্গত কারণে ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ধারাবাহিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্তৃত্বে ১৯৭৫-৮১ সালে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান; ১৯৮২-৯০ জেনারেল এরশাদ, ১৯৯১-৯৬ সাল বিএনপির নেতৃত্বে খালেদা জিয়ার সরকার; ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শেখ হাসিনার সরকার; ২০০১-০৬ পর্যন্ত বিএনপির নেতৃত্বে খালেদা জিয়ার সরকার; ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতাসীন।[৯] উক্ত সময়ে ভারতের বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জোট রাজনীতির বাধ্যবাধকতা মেনে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক চড়াই উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

তবে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রধানত তিনটি বিষয়ে মন কষাকষির জায়গা ছিল ও আছে। এক, ছিটমহল সহ সীমান্ত সমস্যা ও সেই সূত্রে চোরাচালানের বাড়বাড়ন্ত। দুই, দরিদ্র বাংলাদেশ থেকে ভারতে গণ-অনুপ্রবেশ, যার মধ্যে আছে বাংলাদেশের মৌলবাদীদের তাড়ায় ত্রিপুরায় চলে আসা চাকমা বৌদ্ধরা, পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা হিন্দুরা এবং দারিদ্র্য পীড়িত কর্মপ্রার্থী মুসলমানরা। তিন, গঙ্গা ও তিস্তার জলবন্টন সংক্রান্ত সমস্যা। বর্তমানে এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে সন্ত্রাস নিয়ে টানাপোড়েন।

আমার গবেষণার উদ্দেশ্য হলো ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের মধ্যে বিভিন্ন বিদ্যমান সমস্যার অন্বেষণ ও তার সম্ভাব্য বিশ্লেষণ। তৎসঙ্গে সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে (১৯৯৮-২০১৪) আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট রচনা করা। তাই আমি আমার গবেষণা প্রবন্ধে ভারতে NDA ও UPA সময়সমীমার মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ধারাবাহিক নিখুঁত ও যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণে ব্রতী।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও সমস্যা :

আমার গবেষণার উদ্দেশ্য হলো ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের যে ধারাবাহিকতা বা ক্রমবিবর্তন চলছে, সেক্ষেত্রে ভারতের NDA ও UPA আমলে কতটা তাৎপর্যবাহী হয়েছে এই সম্পর্ক? তা অন্বেষণ করা। NDA সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অটলবিহারী বাজপেয়ী দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন? UPA-I ও UPA-II সরকারের আমলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কতটা তাৎপর্যবাহী ও প্রাসঙ্গিক? এক্ষেত্রে আমার গবেষণার বিষয় হলো NDA এবং UPA আমলের মধ্যে সবচেয়ে কোন

আমলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক অধিক যুগোপযোগী ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা পালন করেছে? আঞ্চলিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ভারত-বাংলাদেশকে কোন চোখে দেখছে? বর্তমান সময়ের ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কি আশাবাদী? চীন ও পাকিস্তান এই সম্পর্ককে কিভাবে দেখছে বা বাধা সৃষ্টি করছে কিনা? এর উত্তর খোঁজা। এতদ সমস্যা সত্ত্বেও ভারত-বাংলাদেশ দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক কি সহযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাবে? না পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে থমকে যাবে? ভারতের UPA-II এবং বাংলাদেশের শেখ হাসিনার সরকার সত্যিই কি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আন্তর্জাতিক মঞ্চে? ইসলামিক দুনিয়া কি বাংলাদেশের মাধ্যমে ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম জোরদার করবে? না উভয়ে সচেষ্ট হবে সন্ত্রাস দমনে? পাকিস্তান ও চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব থেকে বাংলদেশ মুক্ত হয়ে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে পারবে কি? Exchange Policy ধীরে ধীরে Burgaining Policy-তে রূপান্তরিত হবে কি? SAARC এবং BIMSTEC-এর মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কতটা নির্ভরশীল? দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি কোন পথে?

এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উক্ত সময়কালের (১৯৯৮-২০১৪) মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান দ্বি-পাক্ষিক সমস্যাগুলির নিখুঁত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। যেমন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সমস্যা, জলবন্টনকে কেন্দ্র করে ভারত বিরোধী মনোভাব, ছিটমহল সমস্যার জের ও বিকাশ, অনৈতিক ও বে-আইনী অনুপ্রবেশ ও উদ্বাস্তু সমস্যা, ট্রানজিট সমস্যা, শিশু ও নারী ও গবাদী পশু পাচারকে কেন্দ্র করে বিবাদ, ভারতের আধিপত্যকামী মনোভাব, সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে বাংলাদেশের ভূমিকা, বাংলাদেশের ভারত বিরোধী মৌলবাদের সৃষ্টি ও প্ররোচনা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে পাকিস্তান ও চীনের পরোক্ষ ষড়যন্ত্রীর ভূমিকা— দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসে সদর্থক নির্ভরশীল সম্পর্ক গড়ে তোলাই গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য। সাম্প্রতিকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী স্থল সীমান্ত চুক্তির বাস্তবায়নের মাধ্যমে খানিকটা সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে অগ্রসরমান। তাই বর্তমান সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি কি রকম? উপরোক্ত সমস্যার উত্তর অন্বেষণই আমার গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য।

গবেষণার ক্ষেত্রে উত্থাপিত প্রশ্নাবলী :

ভারতের NDA ও UPA (১৯৯৮-২০১৪) আমলের ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের আলোচনায় প্রাথমিক প্রশ্ন হলো কোন সময়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক সবচেয়ে উন্নত ও গঠনমূলক হয়েছে? আবার ট্রানজিট

সমস্যা মিটে গেলে ভারতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সাতটি রাজ্য কতটা উপকৃত হবে? ভারত-মায়ানমার গ্যাস পাইপলাইন বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে হওয়া আদৌ কি সম্ভব? শক্তিক্ষেত্রে (Power Sector) উভয় দেশের অবস্থান কি রকম? সীমান্ত সমস্যা সমাধানে উভয় দেশ কতটা বদ্ধপরিকর? সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে উভয়ের বাস্তবধর্মী অবস্থান কি? বাংলাদেশ কি ভারতের উপর নির্ভরশীল? শিশু, নারী ও মাদক চোরাচালানের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ এগিয়ে। তাই এটা কি রদ করা সম্ভব? 'Noman lands' গুলো বর্তমানে কিভাবে ব্যবহৃত হয়? ছিটমহল অঞ্চলে যারা বাসিন্দা তাদের নাগরিকত্ব কোন দেশের? এবং সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে জীবনযাপন করে? বিগত দুই দশকে ভারত ও বাংলাদেশে যে নির্বাচন হয়েছে সেক্ষেত্রে উভয়দেশের নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহার কতটা সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী? তা খতিয়ে দেখা। বাংলাদেশের ধর্মীয় মৌলবাদী সংবিধান পরিবর্তিত হয়ে সম্প্রতি ধর্মনিরপেক্ষ হলেও বৌদ্ধ হিন্দু খ্রিস্টান পরিষদের পক্ষে তা কতটা কার্যকর? উদ্বাস্তু সমস্যাকে ভারত কিভাবে দেখছে? সম্পর্কের নিরিখে উভয় দেশের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষিত হচ্ছে তো? ভারত-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক People to People Contact তৈরি করতে কতটা বদ্ধপরিকর?

ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ে SAARCকে কিভাবে ব্যবহার করে? BIMSTEC-এর মতো আঞ্চলিক সংগঠনে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতকে কতটা সাহায্য করবে? আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশ ভারতকে কতটা সমর্থন করে? উভয়দেশ উভয়ের আশাপূরণে কতটা সক্ষম? ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন, পাকিস্তান প্রভৃতি রাষ্ট্র কি দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করে?—এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই গবেষণার মৌলিক বিষয়। তবে গবেষণা চলাকালীন যে সব তথ্য পাওয়া গিয়েছে তার মাধ্যমে সমাধানসূত্র খোঁজার চেষ্টা করেছি।

গবেষণা পদ্ধতি :

গবেষণা প্রকল্পটি মূলত অভিজ্ঞতাবাদী পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল এবং বিশ্লেষণধর্মী। এক্ষেত্রে মুখ্য ও গৌণ তথ্য সংগ্রহ ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিষয়গত ও গুণগত বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে Random Sampling-এর মাধ্যমে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview Method) ও গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী নথিপত্র, চুক্তি ও সন্ধির খসড়া, ধারাবাহিক টেবিল, গ্রাফ ও নক্সা, ম্যাপ, লেখচিত্রের প্রয়োজন হয়েছে এগুলির সন্নিবদ্ধ বিশ্লেষণ করতে। উপরিউক্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য

বাংলাদেশ হাইকমিশনের কলকাতা ও দিল্লিতে অবস্থিত গ্রন্থাগারে গিয়েছি। এছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের বিভাগীয় গ্রন্থাগার, নেতাজী ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজের গ্রন্থাগার; মৌলনা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ গ্রন্থাগার; কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতার সেন্ট্রার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্স এর গ্রন্থাগার, মহিষাদল প্রজ্ঞানানন্দ মেমোরিয়াল লাইব্রেরী যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতি সম্পূর্ণ গ্রন্থ ও তথ্যভিত্তিক বলে প্রতিপাদ্য। এই গবেষণার পদ্ধতি হিসাবে বিভিন্ন ঘটনা ও উপাদান থেকে সংগৃহীত তথ্যকে সন্নিবেশিত করে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার পরিকল্পনা :

প্রথম অধ্যায় : NDA সরকার পূর্ব ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক : NDA সরকারের পূর্ববর্তী সময়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এক্ষেত্রে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের সামরিক ও কূটনৈতিক সাহায্যদান এবং তৎপরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা-মুজিব সীমান্ত চুক্তি, ১৯৯৬ সালে ভারত-বাংলাদেশ জলবন্টন চুক্তি, 'গুজরাল ডকট্রিন' (Gujral Doctrine), প্রসারিত প্রতিবেশিত্বের নীতি (Extending Neighbourhood), ১৯৯৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক তথা এযাবৎকাল দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা ও সমস্যা এই অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়বস্তু। সমস্যাগুলি হল— সীমান্ত সমস্যা, জলবন্টন সমস্যা, বাণিজ্য ঘাটতিকে কেন্দ্র করে সমস্যা, চাকমা সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, সন্ত্রাসবাদকে কেন্দ্র করে সমস্যা, নারী, শিশু ও মাদক চোরাচালানকে কেন্দ্র করে সমস্যা, অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সমস্যা সমূহ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : NDA সরকারের আমলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক (১৯৯৮-৯৯, ১৯৯৯-২০০৪): এই সময়কালে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের গতি ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ আলোচনাতে প্রাথমিকভাবে উঠে আসবে। এই সময়কালে বাংলাদেশে ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকার এবং ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় দলের সরকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উত্থান পতনে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছিল তার বিশদ বিবরণ গবেষণাতে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতিকল্পে ১৯৯৯ সালে ঢাকা-কোলকাতা বাস পরিষেবা চুক্তি; ২০০০ সালে পেট্রাপোল -বেনাপোল পণ্যবাহী রেল পরিষেবা চুক্তি; ২০০৩ সালে ঢাকা-আগরতলা বাস পরিষেবা চালু এবং

এই সময়কালের মধ্যে ঘটে যাওয়া দ্বিপাক্ষিক বহুমুখী সম্পর্কের বিশ্লেষণই এই অধ্যায়ের উপজীব্য বিষয়।

তৃতীয় অধ্যায় : UPA-I এবং UPA-II এর আমলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক (২০০৪-২০০৯, ২০০৯-২০১৪) : এই সময়ের প্রথম পর্বে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক খুব সুস্থির হয়নি কারণ বাংলাদেশের খালেদা জিয়া সরকার তীব্র ভারতবিরোধী মৌলবাদী মনোভাব পোষণ করে যার কুফল ভারতকে প্রভাবিত করে। কারণ ২০০১-২০০৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ দুর্নীতির শিখরে পৌঁছেছিল। এছাড়া অভ্যন্তরীন সন্ত্রাস ও দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির জন্য দেশটির অস্থিরতা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে পশ্চিমী দুনিয়াসহ ভারতও তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করে। ২০০৫ সালে ভারতের বিদেশমন্ত্রী নটবর সিং-এর ঢাকা সফর; ২০০৬ সালে SAFTA (South Asian Free Trade Agreement)[১০]-র মাধ্যমে দ্বি-পাক্ষিক উন্মুক্ত বাণিজ্য নীতির সম্প্রসারণ; ২০০৭ সালে ভারতের বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বাংলাদেশ সফর উক্ত আলোচনাতে উঠে এসেছে। এছাড়া ২০০৬-২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে অস্থির সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসন, এই সময়কালে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক অবস্থান, দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের সমস্যার বিবরণ ও সমাধানের উপায় অন্বেষণ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

UPA-II অর্থাৎ ২০০৯-২০১৪ সাল পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক যথেষ্ট উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। কারণ বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই পুরানো সমস্যার অবসান ঘটিয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে উভয়ে ব্যস্ত। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বাণিজ্য চুক্তি সফল করে তোলার জন্য বাংলাদেশ সফর করেন; ঐ বছর জুলাই মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ইজিপ্টে শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেন; ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরে আসেন এবং 'ইন্দিরা শান্তি পুরস্কারে' তাকে সংবর্ধিত করে ভারত।[১১] ২০১১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং স্থলসীমান্ত চুক্তি ও তিস্তার জলবন্টন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ঢাকা সফর করেন; পরে ২০১২ সালে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন ভারতে আসেন এবং ঐ বছরই ভারতের কেন্দ্রীয় গ্রমোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ প্রধানমন্ত্রীর দূত হিসাবে ঢাকা যান; পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হুসেইন মহম্মদ এরশাদ হাসিনার দূত হিসাবে ভারতে আসেন উপরোক্ত দুটি সমস্যা নিরসনের জন্য। ২০১৩ সালে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্ধে ঢাকা সফরে যান 'বন্দী প্রত্যর্পণ' ও 'ভিসা

আইন' শিথিল করার বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য। পরে ঐ বছর ভারতের বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরশিদ ঢাকা সফর করেন স্থলসীমান্ত চুক্তির বিষয়ে মানচিত্র বিনিময়ের জন্য এবং ঐ বছর ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের জন্য ঢাকা যান। ঐ বছর বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দীপু মণি ভারতে আসেন আর কে মিশ্র স্মারক বক্তৃতা প্রদানের উদ্দেশ্যে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শেখ হাসিনা পুনর্বার জয়লাভ করে। এই ২০১৪ সালে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ভারতে আসেন। ঐ বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মায়ানমারের রাজধানী নেপিদয়ে ও পরে নিউইয়র্কে সাক্ষাৎ করেন।

এইভাবে সফর পাল্টা সফর, সাক্ষাৎ চলতে থাকে এবং ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে তৈরি হয় 'রবীতীর্থ'। এভাবে এই সময়কালে কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও গঠনমূলক সহযোগিতার নয়া ইতিহাস গড়ে তুলতে তৎপর হয় উভয় দেশ এবং দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও অনুসন্ধান করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায় : ভারত-বাংলাদশ সম্পর্কের উন্নয়নে সার্ক (SAARC) একটি মঞ্চ :

১৯৮৫ সাল থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি, সংহতি ও সহযোগিতার মঞ্চ হিসাবে সার্ককে সদস্যভুক্ত রাষ্ট্রগুলি সম্পর্ক উন্নয়নের একটি বাস্তব মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। ভারত বা বাংলাদেশ সার্ককে সম্পর্কের মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করতে কতটা সফল? তার বিশ্লেষণ এই অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়বস্তু।

পঞ্চম অধ্যায় : পূবে তাকাও নীতি ও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক :

ভারত ও মায়ানমার গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের জন্য ভারত বাংলাদেশের কাছে আর্জি জানিয়েছিল যে এই পাইপলাইন বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে সম্প্রসারিত হলে ভারত সত্যিই উপকৃত হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশ যদি তাঁর মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর উন্মুক্ত করে এবং ভারত যদি হলদিয়া ও পারাদ্বীপ উন্মুক্ত করে উভয় দেশ উভয় দেশের জন্য তাহলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মুক্ত বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটাতে পারে উভয়দেশ। আবার ASEAN ও BIMSTEC এর মাধ্যমে ভারতের পূবে তাকাও নীতি কতটা বাস্তবসম্মতভাবে বাংলাদেশ গ্রহণ করেছে এবং তার গুরুত্ব বিশ্লেষণই এই অধ্যায়ের উপজীব্য বিষয়।

উপসংহার : এই অধ্যায়ে রয়েছে উপরোক্ত অধ্যায়গুলির মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার মাধ্যমে তাত্ত্বিক অনুসন্ধান এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সম্ভাব্য পথ অন্বেষণ। এক্ষেত্রে বস্তুববাদ বা Realism এবং নয়া বাস্তববাদ বা Neo-Realism এছাড়া কার্যবাদ বা Functionalism এবং নয়া কার্যবাদী তত্ত্ব বা Neo-functionalism Theory-এর মাধ্যমে সম্পর্ককে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। শেষপর্বে গবেষণার উদ্দেশ্য কতটা সার্থকতা অর্জন করেছে তার উত্তর খোঁজা এবং নিজের অভিমতকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে ভারত ও বাংলাদেশ সম্পর্ক দুটি বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্ক নয়। এটা বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্কের প্রকৃতি ও পরিবর্তিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি অধ্যায় আলোচনার সময় এই বিশ্ব পরিস্থিতিটিও আলোচিত হয়েছে যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনাকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। সাম্প্রতিককালে উভয় দেশের উদার অকৃত্রিম সখ্যতা কৌশলগত সংযুক্তিকে আরো সুদূরপ্রসারী করে তুলবে।

তথ্যসূত্র

১. Saha Rekha— India Bangladesh Relations, Minerva Associates, Kolkata, 2000, Pp. 06-07

২. Bangladesh Documents, Ministry of Foreign Affaris, Peoples republic of Bangaladesh, Dhaka, pp. 587-589.

৩. Op.cit, no.1— Mr. Abdul Qader Mollah, Chief Secretary of Jamat-e-Islam, during an interview with Rekha Saha in Dhaka dated : 29-10-1991.

৪. Hindustan Standard, 11th Jan 1972.

৫. Op.cit, no. 1, Pp. 06-07.

৬. Dr. Parmanand— 'India's Relations with Eastern South Asian Neighbouring Countries in the 21st Centrury: Bangladesh Bhutan and Nepal' in V.D.Chopra (ed.) *India's foreign Policy in the 21st Century*, Kalpaz Publications, Delhi, 2006, p. 254

৭. Ghosh Anjana— Thanda Juddha uttar Antarjatik Samparka— Sankot o Prabanata, Progressive Publishers, Kolkata, 2007, P. 115.

৮. Narain Virendra— "Foreign Policy of Bangaldesh : Evolution and Prospects" in SR. Chakraborty (ed.) *Foreign Policy of Bangladesh*, Harandand Publications, New Delhi, 1994, p. 53

৯. Research Paper on "Incremental Dyanmics of Resolving India-Bangladesh Border Issues: Rethinking the Past to Construct the future"by Dinesh Magur, Institute of Social Studies, The Hague, Netherlands, 2004, p. 35-36

১০. Karim Mohd Aminul— "Bangladesh-India Relations: Some Recent trends"in *ISAS working Paper*, No. 96, Nov-2009, Institute of South Asian Studies, National University of Singapore, 2009, P. 11, Source: www.Isas.nus.edu.sg

১১. A Report on India-Bangladesh Relations-Towards increased Partnership by Aspen Institute India, New Delhi, Source: www.aspenindia.org.

প্রথম অধ্যায়

NDA সরকার পূর্ব ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক

দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিকাশ ও অগ্রগতির আলোচনা ব্যতীত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণতা লাভ করেনা। ভারত নামক মাতৃত্বের জঠর থেকে জন্ম নেওয়া পূর্ব-পাকিস্তান যৌবনে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে সম্পূর্ণতা পায় তার ভাষা, সংস্কৃতি-সাহিত্য আবেগের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে এই দুই দেশের সম্পর্কের আলোচনাই ঐতিহাসিক সমন্বয়কে সূচিত করে। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত সার্ক-এর সদস্যদেশগুলি ভৌগোলিক দিক দিয়ে প্রায় সংযুক্ত হলেও দীর্ঘদিন ধরে এদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই দেশগুলি ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসাবে অবহেলিত ছিল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেশগুলির অবস্থা প্রায় সমান। বর্তমান বিশ্বে বিকাশশীল দেশগুলির অগ্রগতি দ্রুত হলেও দক্ষিণ এশিয়ার এইসব দেশে উন্নয়নের গতি ছিল অনেকটাই স্তিমিত। অথচ বর্তমানে বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, মুক্তবাণিজ্য ও বেসরকারীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে এই দেশগুলির অস্তিত্ব রক্ষা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করতে সবচেয়ে দরকার আঞ্চলিকভাবে সংগঠিত হওয়া। যার অন্যতম সূচক বা সাক্ষ্য হিসাবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিশ্লেষণ নির্ধারক হিসাবে ভূমিকা পালন করে। তাই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের লক্ষ্য হলো উভয়দেশের মানুষের কল্যান ও জীবনমানের উন্নয়ন; সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি দ্রুততর করা, নিজেদের স্বনির্ভরতা দৃঢ়তর করা। পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা বৃদ্ধি; অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে সহযোগীতা জোরদার করা, এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই সহযোগীতার সম্প্রসারণ।

ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে ১৯৪৭ সালে যখন ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যায় তখন তারা ভারত নামক দেশটিকে দুটি ভাগে ভাগ করে গিয়েছিলেন। একটি দেশ হলো ভারত অন্যদেশের নাম ছিল পাকিস্তান। পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব বিস্তৃত ছিল ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে। দুটি ভূখণ্ড মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের। কিন্তু দুই দশকের অল্প কিছু বেশী সময় ধরে এই পাকিস্তানের অস্তিত্ব বজায় থাকলেও ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান ভাগ হয়ে যায় জন্ম নেয় আর একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র যার নাম হয় বাংলাদেশ। এই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের পেছনে এক দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস ফুটে ওঠে। যাটের দশকের মাঝামাঝি সময়

থেকেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে জন্ম নেয় ভাষার জন্য লড়াই। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাক যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়কে কাজে লাগিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের পূর্ব অংশটির স্বায়ত্ত্বশাসনের এক ছয়দফা দাবী পেশ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি আয়ুব সেই দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ১৯৭১ সালের মধ্যেই পাকিস্তান দ্রুত ভাঙনের দিকে এগিয়ে যায়। আয়ুবের উত্তরাধিকারী ইয়াহিয়া খানের আমলে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির জন্য যে সাধারণ নির্বাচন (প্রথম মুক্ত নির্বাচন) অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামি লীগ বিপুলভাবে জয়লাভ করে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের উপর মুজিবুরের দাবী অস্বীকার করা হলে ওই বিপুল জয়ে অনুপ্রাণিত আওয়ামী লীগ আবার স্বায়ত্তশাসনের দাবী তোলে। মুজিবের এই ন্যায়সঙ্গত দাবী তার বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। অবশেষে ১৯৭০ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে সশস্ত্র পাকিস্তানি সৈন্য মুজিব সমেত আওয়ামী লীগের নেতাদের বন্দী করে সংগঠনকে দুর্বল করে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের গণ অভ্যুত্থানকে দমন করতে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এর ফলে প্রায় ত্রিশ লক্ষ বাঙালী প্রাণ হারায় এক কোটির বেশী মানুষ গৃহহারা উদ্বাস্তু হিসাবে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এই উদ্বাস্তুদের সমর্থনে বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে ভারত সরকার যথাসম্ভব প্রয়াস চালায়, কিন্তু সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

এমতাবস্থায় এর ফলস্বরূপ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এপ্রিল মাসে গঠিত হয় ‘Government of Exile’[১] যার নাম হয় ‘মুক্তিবাহিনী’ এবং এর আগে ২৭শে মার্চ ১৯৭১ সালে সামরিক বাহিনীর এক আধিকারিক মুজিবের পক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ঘোষণা করে দেয়। তৈরি হয় বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী। এইসময় ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানকে সমস্তরকমের সাহায্যের আশ্বাস দেন। ১৯৭১ সালের ২৩শে নভেম্বর ইয়াহিয়াখান পাকিস্তানকে যুদ্ধের জন্য তৈরী হতে বলে এবং ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে। এবং শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন এই আক্রমণ ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণা। শুরু হয় ১৯৭১ সালের ভারত-পাক তৃতীয় যুদ্ধ। নিজের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত রাখতে ভারতও তার প্রত্যুত্তর দেয়। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ভারতের সামরিক বাহিনী ‘মুক্তিবাহিনীর’ সঙ্গে যোগদান করে তৈরি হয় ‘‘মিত্র বাহিনী’’। অবশেষে ১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করে ও ভারত বাংলাদেশকে মুক্ত করতে সফল হয়। ভারত এই সময় প্রায় ৯০ হাজার যুদ্ধবন্দীকে গ্রেপ্তার করে। সুতরাং পাকিস্তানের

গর্ভ থেকে পূর্ব বাংলার বা বাংলাদেশের জন্ম হয় অস্ত্রোপ্রচারের মাধ্যমে, যেখানে ভারতের ভূমিকা ছিল ধাত্রীর। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে এই যুদ্ধে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের জল ও স্থল সীমান্তের উপর চাপ সৃষ্টি করে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তা সত্ত্বেও মুক্তি ঘোষণার সাথে সাথে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেন "Dhaka is now the free capital of a free country we will the people of Bangladesh in their house of triumph. All nations who value the human spirit will recognize it as a significant milestone in man's quest for liberty." এরই সূত্র ধরে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের। পরবর্তীকালে এই সম্পর্ক কখনো জটিল হয়েছে, কখনও হয়ে উঠেছে সৌহাদ্যপূর্ণ। অর্থাৎ যে আন্দোলন ভাষার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল সে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে এক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে। যার অংশীদার ছিল ভারত। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের যে শ্লোগান একদিন আকাশ বাতাসকে মুখরিত করেছিল— "ও পাখি বুলবুলি জানেনা বুলির রনে হাঁটতে"— সেই শ্লোগানকে সত্য প্রমাণিত করেছিল তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।

বাংলাদেশের এই মুক্তিসংগ্রামের কূটনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ভারতের বিরুদ্ধে চীন-পাকিস্তান অক্ষ ষাটের দশকের প্রথম থেকেই গড়ে উঠতে শুরু করে। সত্তরের দশকে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান বোঝাপড়া এক এক আন্তর্জাতিক অক্ষে পরিণত করে এবং ভারতের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তোলে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়, যার বিরুদ্ধে সূচনা হয় কঠোর সামরিক অভিযান। মুক্তি আন্দোলন ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠলে সেখান থেকে ভারতে চলে আসা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা এক কোটি কুড়ি লক্ষে গিয়ে পৌঁছয় ও ভারতীয় অর্থনীতির উপর এক বিপুল চাপ সৃষ্টি করে। ভারতের আশঙ্কাকে সঠিক প্রমাণিত করে আমেরিকা ও চীন পূর্ব পাকিস্তানের এই সংকটে পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষ নেয়। এইভাবে ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে ওঠায় একেবারে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক শৈলীর মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধী এক নতুন কূটনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নেন। এমতাবস্থায় চীন-ভারতকে সম্প্রসারণবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী বলে বর্ণনা করে। কিন্তু ইন্দিরা ১৯৭১ সালের ৯ই আগস্ট তিনি অত্যন্ত সাহস ও বেপোরোয়া মনোভাবের সঙ্গে ভারত-সোভিয়েত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি কিছুটা হলেও ভারতের প্রচলিত গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার নীতিকে মর্যাদা হ্রাস করেছিল। কিন্তু তৎকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে একে এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ও কৌশলগত বাধ্যবাধকতা হিসাবে সমর্থন করা যায়। ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদ বা স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ,

কোনওটাই সম্ভব ছিল না। নিঃসন্দেহে এই ঘটনার ফলে কূটনৈতিক ও কৌশলগত ক্ষেত্রে ভারত অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছায়। এই সময় এটা লক্ষ্য করা যায় যে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক যত উন্নত হয়েছে, ভারত-চীন সম্পর্কের তত অবনতি হয়েছে। কূলদীপ নায়ার একে ‘‘ভারতের প্রতি চীনের শত্রুতা ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধুত্বের সমানুপাতিক’’[২] বলে বর্ণনা করেছেন। চীন মনে করত যে তাকে ঘিরে সোভিয়েত বেষ্টনীর ভারত এক অঙ্গ। এছাড়া চীনের চোখে কৌশলগত দিক থেকে পাকিস্তান একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র কারণ তার মধ্যদিয়ে ভারতে সহজে পৌঁছানো সম্ভব। দুই দেশের এই পৃথক পৃথক নিরাপত্তাজনিত স্বার্থ আজও ভারত ও চীনের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার পথে বাধা। অন্যদিকে পাকিস্তান খন্ডিত হওয়ায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যৌথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হওয়ায় দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষমতার ভারসাম্য পরিপূর্ণভাবে ভারতের দিকে ঝুঁকে আসে। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায়— “The emergence of Bangladesh was an event of major importance in the subcontinent. For the people of Bangladesh, it was the end of a nightmare of terror and torture, a reassertation of their individuality and personality, and an oppotunity to decide their own future development. For India it was a major victory of democratic secularism.”[৩]

আবার ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্মের পেছনে যে নৃসংসতা বা বর্বরতা লুকিয়ে আছে তা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে ‘‘গণহত্যা’’ সংগঠিত হয়েছিল পাকিস্তানের দ্বারা তা অনেক বিশেষজ্ঞ তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়— “A recent study suggests that 269000 people died duirng the war and approximately 2,00000 Bengali women were raped by Pakistani soldiers and 25000 forcefully impregnated— that is the intent to destroy”[৪] এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায়— “Bangladesh turns 40 this year. the Country’s 1971 liberation war and genocidal killing during the conflict remain the defining fulcrum for Bangladesh’s existance and trajectory.”[৫]

সুতরাং দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের আবির্ভাব একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় ভারতের অবদান অনস্বীকার্য। বস্তুতপক্ষে ভারতের ব্যাপক সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী সাধারণ মানুষ তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত

করতে পেরেছে। তখন আশা করা হয়েছিল যে, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ভারতের অনুগত একটি রাষ্ট্রে পরিণত হবে। তাই ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ভারত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করে। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল উভয় দেশ একে অন্যের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা প্রভৃতি অতি মৌলিক রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলিতে পরস্পর হস্তক্ষেপ না করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে। যার লক্ষ্য হলো "Ensure the development of Constructive bilateralism"[৬] এর ফলে শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর দেশে ধর্মনিরপেক্ষ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ও বাংলাদেশ ভারতের ন্যায় জোট নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করে। ভারত-বাংলাদেশ সৌভ্রাতৃত্বকে দৃঢ় করতে বাংলাদেশ তার সংবিধানের কাঠামো রচনা করতে শুরু করে। যেখানে বলা হয়— "The constitution Provided for Parliamentary form of democracy and incorporated all relevant articles on the basis of four state principles: secularism, socialism, Democracy and Bengali Nationalism."[৭] যা "বাংলাদেশ-ভারত ভাইভাই" শ্লোগানকে প্রতিপন্ন করে।

১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় "শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি"। এই চুক্তির পর ভারত-বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে তার সৈন্য প্রত্যহার করে। এই চুক্তির মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশকে খাদ্য, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, স্টিল, সিমেন্ট এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। যার মূল কথা ছিল 'Inspired by common ideals of Peace, secularism, democracy socialism and nationalism.'[৮] এইভাবে বাংলাদেশকে নিজস্ব ভিতের উপর দাঁড়াতে ভারত বন্ধুর পথ গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৭২ সালের জুন মাসে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর করে। পাকিস্তানের সঙ্গে একটি স্থায়ী সমঝোতায় আসার জন্য উদ্ভূত এই পরিস্থিতি ভারতবর্ষের খুবই অনুকূলে ছিল। ধৃত তিরানব্বই হাজার পাক-বন্দী সেনাদের প্রত্যর্পণ সম্পন্ন করতে পাকিস্তানের দিক থেকেও প্রচণ্ড তাগিদ ছিল। তদনুসারে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকর আলি ভুট্টো শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠকে বসলেন। সম্পাদিত হল সিমলা চুক্তি যার দ্বারা দুই দেশ পরস্পরের সার্বভৌম অখণ্ডতা বজায় রাখা, যুদ্ধোত্তর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা (LAC) লঙ্ঘন না করা বা কোনভাবে পরিবর্তনের চেষ্টা না করা এবং ভবিষ্যতে যাবতীয় বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা কেবলমাত্র দ্বি-পাক্ষিক স্তরেই আবদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়। বাংলাদেশের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করার শর্তে ভারত থেকে বন্দী প্রত্যর্পণও শুরু করা হয়। ইন্দিরা গান্ধী সিমলা চুক্তি সম্পাদনের পর লোকসভায় যে বিবৃতি দেন তার

মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি হল— "All I know is that I must fight for Peace and I must take those steps which will lead us to Peace."[৯] তাঁর বিবেচনায় ভারতবর্ষের পক্ষে ক্ষমতা অর্জনই শান্তি প্রতিষ্ঠাতে সুনিশ্চিত করতে পারে।

ঐ বছর ১৯৭২ সালের ২৪ শে নভেম্বর ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত নদীগুলির জলবন্টন সমস্যাকে সমাধান করার জন্য উভয়দেশ তৈরী করে Joint Rivers Comission (JRC) বা যৌথ নদী কমিশন। এবং ঐ বছর উভয় দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উভয় দেশ সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করে। ১৯৭৩ সালে উভয়দেশ এটিকে 'mutually acceptable solution' হিসাবে গুরুত্ব দেয়। অন্যদিকে গঙ্গার উপর ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণ পদ্মার বন্যার আশঙ্কাকে বাড়িয়ে তোলে এবং এটিই মূল ইস্যু হিসাবে গুরুত্ব পেতে শুরু করে। পরবর্তীকালে জলবন্টন সমস্যাকে সমাধানের উদ্দেশে তৈরী করা হয় 'The Joint Committee of Experts' এবং এই কমিটি উক্ত সমস্যা সমাধানের তিনটি সম্ভাব্য পথ অন্বেষণ করেন। প্রথমতঃ ফারাক্কার উপরিভাগে ভারত ও বাংলাদেশের সমস্ত খালের সংযুক্তিকরণ (Link Canal) করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত খালগুলিকে হার্ডিঞ্জ ব্রীজের কাছে গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। তৃতীয়তঃ ব্রহ্মপুত্র নদীর জল পরিকল্পনামাফিক কৃষির জন্য ব্যবহার করতে হবে এবং এরফলে গঙ্গার জলের দাবীকে খানিকটা প্রতিকার বা প্রশমিত করা সম্ভব হবে।[১০] এছাড়াও ১৯৭৩ সালের ১৭ই এপ্রিল 'ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রস্তাবনা' স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি ড. কামাল হোসেন এবং ভারতের বিদেশমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং এর মধ্যে যার মূল কথা ছিল এই উপমহাদেশের শান্তি-নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে মানবিকতার প্রতিষ্ঠা করাই আশু লক্ষ্য। এছাড়া ভারত সরকার এই বছরেই ১৭ই আগস্ট বাংলাদেশকে ঋণ ও সাহায্য বাবদ ২১০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করে। এবং উভয় দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগীতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়।

১৯৭৪ সাল হলো ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ঐতিহাসিকতা নির্ধারণের একটি সূচক। ১৯৭৪ সালের ১২-১৬ই মে দিল্লিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে উভয়দেশ বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে আলোচনা শুরু করে এবং মূলতঃ উৎপাদন শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কাঠামো নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ আলোচনা ও সহযোগীতার পরিবেশ তৈরি করে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়— "In a step further towards economic cooperation four industrial projects based on the supply of raw meterials

and products from one country to another were stated to be set up."[১১] কিন্তু এই পাঁচদিন বৈঠকের মূল বিষয় ছিল 'ইন্দিরা-মুজিব সীমান্ত চুক্তি-১৯৭৪'— এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল সীমান্ত চিহ্নিতকরণ ও 'ছিটমহল' বিনিময়ের সম্ভাব্য কৌশল নির্মাণ। এবং সেই অনুযায়ী পূর্বে ১৯৫৮ সালে নেহেরু নুন চুক্তির মাধ্যমে 'ছিটমহল' বিনিময়ের একটা চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর নেহেরু নুন চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। নেহেরু নুন চুক্তিতে এলাকা বিনিময়ের যে কথা বলা হয়েছিল তা কার্যকর করতে গিয়ে কী কী সমস্যা হতে পারে তা নিয়ে বেশ কয়েকটি মামলাও হয়। বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার পরে সেই সমস্যাগুলি ফের সামনে উঠে আসে এবং তারফলে ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা মুজিব চুক্তির জেরে আঙরাপোতা ও দহগ্রাম বাংলাদেশে থেকে যায়। বেরুবাড়ীর পুরোটাই চলে আসে ভারতের সঙ্গে। আসলে ছিটমহল বিনিময়ে সেখানকার বাসিন্দাদের নাগরিকত্ব পরিবর্তন করতে হত। কিন্তু বিনিময় আটকে যাওয়ায় নাগরিকত্ব স্থিতিশীল থাকে। তবে ছিটমহলের বাসিন্দারা এখন অনুভব করেন যে বিনিময়ের মাধ্যমে নাগরিকত্ব বদলে গেলেই বোধহয় ভাল হতো। এভাবে নাম গোত্রহীন হয়ে অন্তত থাকতে হতো না।

বস্তুত, তিনবিঘা চুক্তি এই ছিটমহল সমস্যাগুলির সমাধানে নতুন দিক উন্মোচিত করতে পারত। কিন্তু ভারতীয় ছিটমহলগুলিকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জুড়তে বাংলাদেশের কাছ থেকে কখনও জমি লিজ নেওযার প্রস্তাব ভারত সরকার দেয়নি। এ ব্যাপারে ভারতের প্রাক্তন সাংসদ অমর রায় প্রধান একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করে দিল্লিতে জমা দিয়েছিলেন। ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, জলপাইগুড়ির দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দইখাতা সীমান্ত দিয়ে একটি রাস্তা তৈরি করে বাংলাদেশের মধ্যে থাকা ভারতীয় ভূ-খণ্ডের ১৭ বর্গমাইল এলাকাকে যুক্ত করা। যেমন হয়েছে 'তিনবিঘা'। এক্ষেত্রে ভারত সরকারকে বাংলাদেশের কাছ থেকে কিছু জমি লিজ হিসাবে নিলে, তাতে ৫০ হাজার ভারতীয় নাগরিকদের নিত্যদিনের অপমান, লাঞ্ছনা দূর হতো। পরিকল্পনা অনুযায়ী ওই করিডর বা রাস্তা তৈরি করতে বাংলাদেশের মাত্র আড়াই বিঘা জমি লিজ নিলেই হত। কিন্তু সেই 'আড়াই বিঘা করিডোর' প্রস্তাব ফাইল বন্দি হয়ে পড়ে রয়েছে দিল্লির বিদেশ মন্ত্রকে। ওই 'আড়াই বিঘা করিডর'-এর সমর্থকদের দাবী, ওই পথ তৈরি হলে শালবাড়ী, কাজলদিঘি, নটনটকী, বেউলডাঙা ভারতীয় ছিটকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগ করা যেত। এবং দহলা, খাগড়াবাড়ি, কোটভজনি, বালা পাড়ার মতো বড় ছিটগুলিকে মূল ভারতীয় ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার সম্ভাবনা থাকতো।

এই ইন্দিরা-মুজিব সীমান্ত চুক্তির বাস্তবিক গুরুত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে— "The

Border Agreement of 1974 was related to 180 odd indian enclaves in Bangladesh and 70 odd Bangladesh enclaves in India as well as to 160 km of border yet to be demarcated.”[১২] “The most fruitful outcome of the agreement from India’s point of view was that “India will retain the Southern half of South Berubari Union no. 12 and the adjacent enclaves, measuring an area of 2.64 square miles approximately”....[১৩] And Bangladesh in exchange “will reatin the Dahagram and Angrapota enclaves.”[১৪] And India would lease to Bangladesh, an area of 178 meters x 185 meters near ‘Tin Bigha’ to connect Dahagram with Panhari Mouza. এ প্রসঙ্গে অবতার সিং ভাসিন বলেছেন যে However, that under the constitution of Inida ratification of an aggreement or treaty is an executive prerogative and does not require legislative approval.[১৫] এই চুক্তি প্রসঙ্গে মুজিবুর রহমান বলেছিলেন যে এই চুক্তির মাধ্যমে বন্ধুত্বের প্রসার ঘটলো। কিন্তু তার বিরোধীরা এই চুক্তিকে সমালোচনা করে এবং বাংলাদেশ বিরোধী ভারতের স্বার্থবাহী বলে আখ্যায়িত করে। মূলত মৌলানা ভাসানী এই চুক্তির বিরোধীতা করে ভারত বিরোধীতাকে আরও সক্রিয় করে তোলে। তবে এই চুক্তির গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী হলেও উভয়দেশের জনগণ মানসিকভাবে পুরোপুরি সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে পারেনি। এইভাবে চুয়াত্তরের বিবেক বিস্ময়ে পরিণত হয়। ঐ বছর জুন মাসে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি বাংলাদেশ সফরে যান এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ভাষণ প্রদান করে যার ফলে উভয়দেশ আপ্লুত হয়। এবং ভি ভি গিরি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানান। এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে— “The President of India expressed his gratitude for the very warm hospitality and friendship shown to him and his party during their visit by the government and people of Bangladesh.”[১৬]

এইসময় প্রতিবেশী দুইদেশ চীন ও পাকিস্তানের সামরিক শক্তি সম্প্রসারণের প্রতিষেধক হিসাবে এবং কিছুটা আন্তর্জাতিক দাপট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পোখারানে ভারতের প্রথম আনবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয় (১৯৭৪)। পরের বছর এপ্রিলমাসে ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ‘আর্যভট্ট’ একটি সোভিয়েত উৎক্ষেপণ ঘাঁটি থেকে অন্তরীক্ষ পর্যবেক্ষণে উৎক্ষেপন করা হয়। ঐ বছরই সীমান্তবর্তী সিকিম রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে চীনের সামনাসামনি এক প্রত্যক্ষ উপস্থিতি স্থাপন আর একটি সাহসী পদক্ষেপ। অর্থনৈতিক, কারিগরি ও সামরিক সহযোগীতার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী নানা বন্দোবস্ত চালু হয়। অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার নীতি অনুসরণ করে

চতুর্থ ও পঞ্চম পরিকল্পনার মধ্যেই আগের দশকের আর্থিক দুর্গতি অনেকটা দূর করা সম্ভব হয়। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে ভারতের প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ভারত সম্বন্ধে কিছুটা সমীহ প্রকাশ করতে থাকে। মোটের উপর আঞ্চলিক রাজনীতিতে ভারতের প্রভূত্ব নয়, অগ্রগণ্যতাই প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্দিরা গান্ধীর বিদেশ নীতির সাফল্যে।

১৯৭৫ সলের ৮ই আগস্ট শান্তি ও মৈত্রী চুক্তির খসড়া মেনেই ভারত-বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এক বছরের জন্য। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ভারতের কমান্ডার কে চেল্লাইয়া এবং বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন এম.এইচ রহমানের মধ্যে। যার মূল লক্ষ্য হলো বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগীতাকে বাড়িয়ে তোলা এবং একে অপরের স্বার্থকে হৃদ্যতার সঙ্গে রক্ষা করা। ঐ বছর ৩০ সে সেপ্টেম্বর উভয় রাষ্ট্র ‘Realistic Trade Plan’ তৈরি করে যার উদ্দেশ্য ভারত-বাংলাদেশ প্রথম বছর ৬১ কোটি টাকার বাণিজ্য করবে। ১২ই নভেম্বর ভারত-বাংলাদেশের বন্যাজনিত কারণে ১০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করে। আবার ১৭ই ডিসেম্বর মুদ্রা বিনিময় চুক্তি করে যার দ্বারা কয়লা, পাট, তামাক, মুদ্রণ সামগ্রী, বিশুদ্ধ ফল ও অন্যান্য বাণিজ্যিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রে টাকা বা রুপির ব্যবহারকে বৈধতাদান করা হয়। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে ভারতের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী বিপিন পাল দাস লোকসভায় ঘোষণা করেন যে বাংলাদেশকে ৩০৮ কোটি টাকা দেওয়া হবে। এছাড়া ১০১ জন বাংলাদেশী প্রশাসককে ভারতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় বিভিন্ন দপ্তরে। আরো বলা যায় In addition 160 Scholarships had been given to Bangaldesh nationals for studies in different courses in India.[১৭] এইসময় ১৮ই এপ্রিল গঙ্গার জলবন্টন সম্পর্কিত একটি ক্ষণকালীন চুক্তি উভয়দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় এবং তাতে ১১০০০-১৬০০০ কিউসেক জল বাংলাদেশকে প্রদান করার কথা দেয় ভারত। কিন্তু ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণ জলবন্টন সমস্যাকে আন্তর্জাতিক রূপ দেয় যা ভারত-বাংলাদেশের বৈরীতার একটি সূচক হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে সম্পর্কের সদর্থক প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরতে গেলে বলতে হয় যে---- The agreement together with the new and more specific economic arrangements and the border demarcation accord and the joint poitical declaration were hopefully expected to mark a new advance in resolving the problems of the sub-continent, constituting an important milestone in the process of normalization in the region. The border demarcation agreement between India and Bangladesh was believed by many in India to be the most outstanding achievement which resolved “issue that had eluded solution for a whole generation.”[১৮]

তবে একথা সত্য যে ১৯৭২-৭৫ সাল ছিল ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অর্থনৈতিক সহযোগীতা থেকে শুরু করে বাংলাদেশ রেলওয়ে ব্যবস্থার পুনঃগর্ঠন, টেলিযোগাযোগ সামগ্রী প্রদান, বিদ্যুৎ সরবরাহ সরঞ্জাম সামগ্রী পাঠানো সহ ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে সেতু নির্মাণে সহযোগীতাও পর্যন্ত করেছে ভারত। কিন্তু বাংলাদেশের দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা, শিল্প কারখানার অভাব, বেকারী ও একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসন জনগণের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে যা ভারত বিরোধীতায় পরিণত হয়। যার ফলে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতের রাষ্ট্রপতি তার ভাষণে বলেন— “Freindship and cooperation between our two countries will be further strengthend and consolidated in the years to come to contribute in the sub-continent for the welfare of our two people”. [১৯]

বাস্তবিকক্ষেত্রে ১৯৭২-৭৫ সু-সম্পর্কের এই অধ্যায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি কারণ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মুক্তির পর বাংলাদেশের মধ্যে সর্বস্তরে তীব্র জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম হয়— তা পরবর্তীকালে ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের বৃহৎ আয়তন বাংলাদেশীদের ভারতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে সন্দিগ্ধ করে তোলে। অনেক বাংলাদেশী ভাবতে শুরু করে যে, বাংলাদেশের বহু কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতা ভারতকে বেচে দিতে হবে। যাকে বলা যায় The situation presented ample opportunities for all the dissidents, anti-Indian, pro-Pakistani, Pro-China, anti-mujib forces to transfer the entire blame for the hardship on India- and the Banghladesh Government’s Policy of friendship with india. এইসময় বাংলাদেশে পাকিস্তানের সমর্থনকারী গোষ্ঠীর পুনরার্বিভাব হয়। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক সাহায্য ও স্বাধীনতার পর ভারতীয় বাণিজ্য মহল কর্তৃক বিপুল আর্থিক সাহায্যদান বাংলাদেশের নতুন ক্ষমতাধারী নব্য ধনিক গোষ্ঠী সেই গরিব দেশে যে নগ্ন লুণ্ঠন শুরু করে তার ধাক্কায় দেশটি অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত হয়, আর তার দায় এসে পড়ে ভারতের উপর। এরফলে ভারত বিরোধী মৌলবাদ মাথাচাড়া দেয়, অন্যদিকে বাংলাদেশে ভারত ঘনিষ্ঠ শেখ মুজিবুর রহমান দ্রুত জনপ্রিয়তা হারান, আর সেই সুযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও পাকিস্তানের মদতে বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে দুটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। যার প্রথম পরিনাম শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা। দ্বিতীয় ফল হলো সামরিক শাসক হিসাবে জিয়াউর রহমানের অভিষেক। ভারত এই সমস্ত ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। ভারত মনে করে সোনার বাংলা গড়ার কারিগর হিসাবে বাংলাদেশ ফুলের

মতো একজন রাজনৈতিক নেতৃত্বকে হারালো। এরপর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্তে দুই দেশের আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। জিয়াউর রহমান ইসলামী মৌলবাদকে উস্কানি দিয়ে ভারত বিরোধীতাকে আরও তীব্র করার প্রয়াসে লিপ্ত হন। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গঙ্গার জলবন্টন নিয়ে তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে তৈরি হয় বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (BNP) যা পরে নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়।

১৯৭৬ সালে গঙ্গার উপর ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণ ও বাংলাদেশে জলবন্টন নিয়ে নিয়মিত অভিযোগ আসে যে তারা ঠিকমতো জল পাচ্ছে না। বাংলাদেশ বিস্ময়ের সাথে উক্তি করে যে এটি "extraordinary and wholly unjustified" এবং শুখা মরসুমে জলের প্রবাহ যাতে পর্যাপ্ত থাকে তার জন্য বাংলাদেশ দাবী জানায় এবং এই প্রসঙ্গটি শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে পৌঁছায়। কারণ বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, মৎসচাষ, বনাঞ্চল, নৌ চলাচল, স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য গঙ্গার উপর নির্ভরশীল। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ঐ বিষয়ে বহুবার আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। ঐ বছর জানুয়ারী মাসে উভয় দেশ কিছু বাণিজ্য সংক্রান্ত কিছু চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ১৯৭৭ সালে ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় ঘটে এবং জনতা সরকারের আবির্ভাব ঘটে। যার ফলে প্রধানমন্ত্রী হন মোরারজী দেশাই তিনি ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ সফর করেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের শাসক জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তন করে বাংলাদেশী জাতিয়তাবাদকে ইসলামী জাতিয়তাবাদে পরিণত করেন। যার মূল কথা হলো "Bangladeshi Nationalism instead of Bengali Nationaslism. "secularism was replaced by statement. "Absolute turst and faith in the Almighty Allah", and "Socialism" by Economic and soical justice".[২০] এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে Chief Martial Law Administrator (CMLA) হিসাবে ভূমিকা পালন করতে থাকেন। তার বিদেশনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও সোভিয়েত বিরোধী অক্ষ গড়ে তোলা এবং ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহ, চীন ও পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে দ্রুত সমৃদ্ধতর সম্পর্ক স্থাপন করা। জিয়াউর রহমান মূলতঃ তিনটি ভিতের উপর তার বিদেশনীতিকে পরিচালিত করেছিলেন—

I. ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখলেও বাংলাদেশের জাতীয় ও আভ্যন্তরীন বিষয়ে ভারতের হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা।
II. বাংলাদেশ কর্তৃক বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আর্থিক অনুদানকে কেন্দ্র করে সম্পর্ক তৈরি করা। রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন থেকে বিরত থাকা।

III. ভারতের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরতা কমিয়ে ইসলামিক রাষ্ট্র ও চীনের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা।[২১]

তা যাইহোক, ১৯৭৭ সালে ৫ই নভেম্বর "ফারাক্কা চুক্তি ১৯৭৭" ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বাংলাদেশের অ্যাডমিরাল এম.এইচ খান এবং ভারতের কৃষি ও জলসেচ দপ্তরের মন্ত্রী এস.এস.বার্নালার মধ্যে। এই চুক্তি প্রাথমিকভাবে পাঁচ বছরের জন্য স্বাক্ষরিত হলেও এর প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হয়— "The Government of the Republic of India and The Governament of the People's Republic of Bangladesh, determinded to promote and strengthen their relations of friendship and good neighbourliness, inspired by the common desire of promoting the well being of their peoples."[২২] এই চুক্তির মূল বক্তব্য ছিল ১৯৭৫ সালে উভয়দেশের মধ্যে যেভাবে গঙ্গার জল বন্টিত হতো তা বৃদ্ধি করতে হবে। তাই বাংলাদেশ দাবী করে যে এপ্রিল-১-মে ২০ তারিখ পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশকে ২০০০০-২৪০০০ কিউসেক জল প্রদান করবে। এক্ষেত্রে ভারত ৩৪,৫০০ কিউসেক জল প্রদান করে। পরবর্তীকালে সেটা বৃদ্ধি করে ভারত বাংলাদেশকে শুখা মরসুমে ৪০,০০০ কিউসেক জল প্রদান করতে সম্মত হয় এবং ফারাক্কার নীচুভাগে স্থানীয় ব্যবহারের জন্য ২০০ কিউসেক জল নেবে ভারত। এইভাবে উভয়দেশ গঙ্গার জলবন্টনে সম্মতি প্রদান করে। তবে চুক্তির ফলে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে জনতা সরকারের কূটনীতি নিয়ে সমালোচনা করা হয়। তা সত্ত্বেও উভয় দেশ Joint Rivers Commission-এর মাধ্যমে বৈঠক ও পাল্টা বৈঠক, মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত রাখে। এই চুক্তিকে কটাক্ষ করে তৎকালীন ভারতের পার্লামেন্টের সাংসদ কল্যাণ রায় বলেন যে— "এই চুক্তির ফলে ভারত বাংলাদেশের মিলিটারী জুন্টার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং যাকে তিনি "total sell out" বলে অভিহিত করেন"।[২৩] আবার অন্যদিকে মার্গারেট আলভা একে "Friendship of a hostile neighbouring Country"[২৪] বলে উপস্থাপনা করেন। এরপর ১৯৮০ সালে জিয়াউর রহমান ভারতে আসেন জলবন্টন সমস্যার সুস্থ সমাধানের উদ্দেশ্যে। অন্যদিকে ফারাক্কা চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে। তাই ১৯৮২ সালের ৭ই অক্টোবর উভয় রাষ্ট্র MOU বা সম্মিলিত বোঝাপড়া করে যার ফলে ফারাক্কা চুক্তির জলবন্টনের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি পায় পরে ১৯৮৪ সালে আবার MOU স্বাক্ষরিত করে উভয়দেশ। পরে ১৯৮৫ সালে ৩ বছরের জন্য জলবন্টন চুক্তি হলেও শেষপর্যন্ত সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। তা সত্ত্বেও ১৯৮৬ সাল থেকে বাংলাদেশ ৩৫০০০ কিউসেক এবং ভারত ৪০,০০০ কিউসেক জল

শুখা মরসুমে ব্যবহার করবে স্থিরিকৃত হয়।[২৫]

সমসাময়িক পরিস্থিতিতে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের আঞ্চলিক সীমানার মধ্যে হাঁড়িয়াভাঙা মোহনায় দক্ষিণ তালপট্টি নামে যে দ্বীপটি ১৯৭৫ সালে জেগে ওঠে সেটি ভারতীয় নৌবাহিনী দখল করে নেয়। ১৯৮২ সালে ভারতের বিদেশমন্ত্রী পি.ভি.নরসীমা রাও বাংলাদেশ সফর করেন এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এরশাদ-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা চালান। ঐ বছর এরশাদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমন্ত্রণে নয়াদিল্লী সফর করেন এবং গঙ্গার জলবন্টন সম্পর্কিত ফারাক্কা চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানান। উভয়ে MOU স্বাক্ষর করেন। ভারত দুবছর চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করে। এই সময় উভয়দেশ তৈরি করে Joint Economic Commission (JEC) বা যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন যার উদ্দেশ্য হল যৌথ প্রচেষ্টায় শিল্প কারখানার প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ভারত এইসময় "তিনবিঘা" করিডোর বাংলাদেশকে লিজ দেয় বাংলাদেশের ছিটমহলগুলির সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সংযুক্তির উদ্দেশ্যে। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়— New Delhi also agreed to lease out Tin Bigha Corridors involving an area of 192 yards long and 92 yards wide to Bangladesh, to connect two Bangladeshi enclaves with the mainland.[২৬] এইসময় কয়েকটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সেগুলি হলো— প্রথমতঃ গঙ্গার স্থায়ী জলবন্টন বিষয়; দ্বিতীয়তঃ স্থল সীমান্ত ও সমুদ্র সীমান্ত চিহ্নিতকরণ ও হস্তান্তর; তৃতীয়তঃ বঙ্গোপসাগরে উদ্ভূত দ্বীপের মালিকানা; চতুর্থতঃ বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার ভারতে উদ্বাস্তু হিসাবে আগমন এবং ভারত কর্তৃক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ; পঞ্চমতঃ চাকমা শরণার্থীদের ভারতে অনুপ্রবেশ বা আশ্রয়গ্রহন। এর মধ্যে এরশাদ এর আমলে চাকমা সমস্যা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে আতঙ্কিত করে তোলে এবং নাড়া দিয়ে যায়। আবার ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক সহযোগীতা সংস্থার (SAARC) আবির্ভাব ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে আলাদা মাত্রা যোগ করে।

১৯৮৭ সালে এরশাদ এর আমলে বাংলাদেশ ইসলামীকরণের চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করে তখন চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আদিবাসী চাকমারা তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, নৃকূলগত বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে ধরে রাখতে তৎপর হয়। ঐতিহাসিকভাবে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ কিছু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অধিকার অর্জন করেছিল কিন্তু তা ধ্বংস করার পরিকল্পনা করা হয় এরশাদের সময়। মুসলিম মৌলবাদীরা বাংলাদেশী সৈন্যের সঙ্গে যৌথভাবে চাকমাদের উপর আক্রমণ সংঘটিত করে। ১৯৮৭ সালের ৩১ শে মে ৫০,৫২৭জন চাকমা শরণার্থী ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয় ৬০০০

চাকমা আদিবাসী নিখোঁজ প্রতিপন্ন হয়। মূলতঃ এরা মিজোরাম ও ত্রিপুরাকে বাসস্থান হিসাবে গ্রহণ করে সেখানকার বনাঞ্চল কেটে বসতি ও চাষবাস শুরু করে স্থানীয় আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে যা ভারত ভালোভাবে নেয়নি। চাকমা সমস্যা সম্পর্কে বলতে গেলে দেখা যায়— "Twenty years ago tribals were literally lords of the land in the Chittagang Hill Tracts, free to live according to their traditional way of life with almost, no interference. With in the last two well remembered decades they have become not only a minority in their own ancient homeland, but a depressed and improverished lower stratum, often servent of those who have taken their lands. There were frequent armed clashes between the Chakma Shanti Bahini and the Bangladesh security forces."[২৭] বাংলাদেশ মনে করে যে এই চাকমারা ভারতের উত্তরপূর্বে জঙ্গীদের দ্বারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এবং বাংলাদেশ ঘোষণা করে এই সমস্যা সমাধানে ভারত কোন ভূমিকা নেবে না এক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চাকমাদের সমস্যা শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমারের সঙ্গে আলোচনা করে মিটিয়ে ফেলা হবে। ভারত চাকমাদের উপর এই আক্রমণকে তীব্র মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে আখ্যায়িত করে। প্রকৃতপক্ষে এরশাদের আমল ছিল দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমগ্ন সামরিক বাহিনীর উপর নির্ভরশীল। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধন করে ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অধিকারকে খর্ব করে এরশাদ। এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে দেখা যায়— "The constitutional status of Islam has seemingly placed the minonrity communities- the Hindus, the Christians, and the Buddhists— in a position subservient to the majority muslims in respect of religious rights."[২৮] ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে এরশাদের অবসান ঘটে জাস্টিস শাহবুদ্দিন আহমদের উত্থান ঘটে। এবং তিনি তদারকী সরকারের প্রধান হিসাবে ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে ভারতে রাজীব গান্ধীর পর ১৯৮৯ সালে ভি পি সিং প্রধানমন্ত্রী হন।

১৯৯০ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভি.পি.সিং-এর আমলে বিদেশমন্ত্রী হিসাবে ইন্দরকুমার গুজরাল ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা সফর করেন। যদিও এই সফর কোন তাৎপর্য বহন করে না। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে তদারকী সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির নেত্রী খালেদা জিয়া জামাত-ই-ইসলামীর সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠাত্রী হন এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আবার সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও বিরোধী আওয়ামী লীগের উপর অত্যাচার বজায় থাকে। এই বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী LTTE জঙ্গীদের দ্বারা নিহত হলে পি ভি নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী হন।

ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন বিদেশনীতির ভূমিকাকে আগের থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে রাও সরকারও তার বিদেশনীতিকে এক নতুন পথে চালিত করার চেষ্টা করে। অর্থনৈতিক কূটনীতি তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাও ঘোষণা করেন যে, পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে জাতীয় স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে ভারত তার বিদেশনীতিকে এক গতিশীল পন্থা হিসাবে ব্যবহার করবে। এই কারণে তাঁর নীতির মধ্যে ভারতের চিরাচরিত নীতি থেকে প্রচুর তাৎপর্যময় বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কেও তার প্রভাব সামান্য হলেও পড়েছিল।

১৯৯২ সালে খালেদা জিয়া নয়াদিল্লী সফরে আসেন 'তিনবিঘা' করিডোর লীজ স্বাক্ষরের জন্য। পূর্বোক্ত সফরসূচী অনুযায়ী চুক্তিতে দহগ্রামকে পাটগ্রামের সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং উক্ত 'তিনবিঘা' করিডোরের উপর ভারতের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। এছাড়াও এই 'তিনবিঘা'ব্যবহারের নিয়মাবলীও নির্ধারিত হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৯২ সালের ২৬শে জুন ভারতের বিদেশমন্ত্রী মাধব সিংহ সোলাঙ্কি লোকসভায় এবং প্রতিমন্ত্রী এডুয়ার্ডো ফেলেইরো রাজ্যসভায় তিনবিঘা নিয়ে বিবৃতি দেন। এই দুই বিবৃতিতে তারা সাংসদদের বলেন যে, ঐ এলাকায় ভারতের সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে। সরকার সমস্ত আইনগত প্রক্রিয়া সম্পাদন করার পর একটি আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পালন করবে। তারা এই লীজকে সৌহার্দ্য ও সুপ্রতিবেশীসুলভ মনোভাবেরই প্রতীক বলে মনে করেছেন। পরদিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বলেন "রাজ্য সরকারের অবস্থান, আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্তপালনের ক্ষেত্রে রাজ্য ও রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা, তিনবিঘা ভূখণ্ডে ভারতের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা, কুচলিবাড়ীর মানুষের অবস্থান অবিচ্ছিন্ন রাখা ইত্যাদি বিষয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আশ্বাস দেন।"[২৯] এই বছর অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর সাইকিয়া প্রথম 'পুশব্যাক' ধারণার সূত্রপাত ঘটান। যার মূল বক্তব্য ছিল অবৈধভাবে ভারতে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের বিতাড়নের অভিযান বা ফেরৎ পাঠানোর জন্য তৎপর হওয়া। উত্তরপূর্ব ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের জন্য নয়াদিল্লী ঢাকাকে দায়ী করে। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে ভারতে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে কেন্দ্র করে জাতীয় রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠে ফলতঃ সপ্তম সার্ক সম্মেলন ঢাকাতে বাতিল হয়। পরবর্তীকালে খালেদা জিয়া গঙ্গার জলবন্টন সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় উত্থাপন করেন। যেটা নয়াদিল্লির পছন্দ হয়নি। ১৯৯৫ সালে খালেদা জিয়া সার্কের স্থায়ী কমিটির মিটিং উদ্বোধন করতে নয়াদিল্লী আসেন এবং She discussed a pakage deal to settle the water distribution problem and transit facility to India through Bangladesh.[৩০]

এক্ষেত্রে ট্রানজিট সমস্যার খানিকটা সমাধান হলেও জলবন্টন সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। ১৯৯১-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে খালেদা জিয়া সামরিক আমলাতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হন এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্ধারণ করতে পারেন নি।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে সেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনার হাত ধরে। এরপর ক্রমান্বয়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নত হতে শুরু করে। অন্যদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন এইচ ডি দেবেগৌড়া এবং তাঁর সরকারের বিদেশমন্ত্রী হন ইন্দরকুমার গুজরাল। ১৯৯৬ সালে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ও পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী ভারতের বিদেশনীতিতে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির প্রতি তার মনোভাব আরও স্পষ্ট করে তোলেন যে, ভারত দক্ষিণ এশিয়ার (পাকিস্তান ব্যতীত) সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে শর্তহীন বন্ধুত্ব স্থাপন করবে— যা 'গুজরাল নীতি' (Gujral Doctrine) নামে পরিচিত। এই অবস্থায় ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগীতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৬ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক জলবন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা উক্তনীতির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক।

১৯৯৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার মধ্যে ৩০ বছরের জন্য গঙ্গা জলবন্টন চুক্তি ১৯৯৬' স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল গঙ্গার জল সমবন্টিত হোক ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে। সেই অনুযায়ী ১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ঢাকা সফর করে এবং বাংলাদেশের দাবীকে যৌক্তিকতার সঙ্গে পর্যালোচনা করেন। এই চুক্তির পুরোধা হিসাবে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরাল ভূমিকা পালন করেন। এ প্রসঙ্গে ওয়ালিউর রহমান বলেছেন— "with foreign Minister Gujral in the capital, one can expect that he will try in helping the two countries in confidence buliding. A definitive commitment by Gujral could pave the way. Given the good will that exists between the two governments a resonable agreement on the amount of water to be discharged for almost 30 day lean period would not be an impossible task. West Bengal Chif Minister Jyoti Basus remarks could also be helpful.[৩১] যার লক্ষ্য ছিল enhancing constructive bilateralism এসবের পেছনে ছিল ভারতের কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের একটি সম্মিলন বার্তা যা ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলে ধরে। এবার আসা প্রয়োজন

যে এই চুক্তির মূল বিষয়বস্তু কি ছিল। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন দাবী করে আসছিল যে তারা ভূ-প্রাকৃতিকভাবে ভারতের নীচে (Lower Riparian Country) অবস্থান করায় ভারত উপরের দেশ হিসাবে (Upper Riparian Country) অধিক জল ব্যবহার করার অধিকার পায়। তা যাতে সমভাবে বন্টিত হয় আন্তর্জাতিক আইন মেনে। এই সূত্র ধরে উভয়দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে উল্লিখিত ছিল যে—

১। যদি মোট জলের পরিমাণ ৭০,০০০ কিউসেক প্রবাহিত হয়, তবে উভয় দেশ ৫০% করে ব্যবহার করবে।

২। যদি মোট জলের প্রবাহ ৭০,০০০-৭৫,০০০ কিউসেক হয়, তবে বাংলাদেশ ৩৫,০০০ কিউসেক জল ব্যবহারের জন্য পাবে। বাকী জল ভারত ব্যবহার করবে।

৩। যদি মোট জলের প্রবাহ ৭৫,০০০ কিউসেক হয় বা তার বেশী হয়, তখন ভারত ৪০,০০০ কিউসেক ব্যবহার করবে। বাকী জল বাংলাদেশের জন্য ছাড়া হবে।

৪। শুখা বা খরা মরসুমে (১লা মার্চ থেকে ১০ই মে) ১০ দিন অন্তর তিনটি ভাগে উভয় রাষ্ট্র ৩৫,০০০ কিউসেক জল পাবে।

৫। যদি জল প্রবাহের পরিমাণ ৫০,০০০ কিউসেক-এর নীচে নেমে যায় তাহলে আপৎকালীন অবস্থার সঙ্কট বিবেচনা করার পথ খোলা থাকবে।

৬। এই চুক্তির ৩০ বছর মেয়াদ স্থিরীকৃত হল এবং ৫ বছর অন্তর উভয় রাষ্ট্র পুর্নবিবেচনা করবে। যদি উভয়ে মনে করে ২ বছর পর ও এর পুনর্বিবেচনা করতে পারে।[৩২]

এক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার আশাতিরিক্ত জল পায় যা ভারতের বিভিন্ন মহল থেকে সমালোচনার ঝড় ওঠে। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট এই চুক্তিকে একটি নৃশংস বোঝাপড়া বলে আখ্যায়িত করে এবং প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন করে তোলে। কারণ ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও গঙ্গাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘস্থায়ী পকিল্পনার বিরোধী এই চুক্তি। এ প্রসঙ্গে বলা যায়— The Indian Position is that Bangladesh has far more water than it could possibly use, to which the Bangladesh response is that water requirements cannot be simplistically judged by adding up the annual total including floods and droughts.[৩৩] এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায়— "The 30 year India-Bangladesh agreement on water sharing from the Ganga has been claimed as the Victory of rational political will over insular and self-centred obduracies.[৩৪] The treaty may strengthen India's ties with other smaller states of South Asia, who were earlier, skeptic about any Indian initiative towards regional development.[৩৫]

এইভাবে ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গা জলবন্টন চুক্তি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন ও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধানে প্রতীক হিসাবে সূচিত হয়। উভয় দেশের বিরোধী দলগুলি এই চুক্তির সমালোচনা করলেও উভয় দেশের মধ্যে শান্তি ও সংহতি, সার্বভৌমিকতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রেখে সদর্থক উন্নয়ন যে সম্ভব তা প্রমাণ করে। আরো বলা যায় Importantly Compromise and the spirit of cooperation are gradually replacing the 'survival of the fittest' syndrome in state to state relations in general.[৩৬] দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে আঞ্চলিক শান্তি ও সংহতি এবং রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এই চুক্তি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে ও নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটায়।

১৯৯৬ সালে গঙ্গা জলবন্টন চুক্তির কূটনৈতিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রথমতঃ এই চুক্তির ফলে ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে আঞ্চলিক রাজনীতিতে তার যে আধিপত্য ও ক্ষমতা বাংলাদেশের মনে অবিশ্বাস, ভীতি ও ভূল বোঝাপড়ার সৃষ্টি করেছিল তার অবসান ঘটে। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের জাতীয় ও বিদেশনীতিতে শাসকবর্গ জলবন্টনকে যেভাবে রাজনীতিকরণ করেছিল এবং বাংলাদেশের সামরিক শাসকবর্গ আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমর্থনের ভিত্তিতে এই বিষয়কে আন্তর্জাতিক স্তরে যেভাবে নিয়ে গিয়েছিল তার অবসান ঘটে। তৃতীয়ত : বাংলাদেশ এই জলবন্টনকে আন্তর্জাতিক ইস্যু করে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ চেয়েছিল যা সম্ভব হয়নি। চতুর্থত : গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সংযোগকারী খাল তৈরির ভারতীয় প্রস্তাব বাংলাদেশ খারিজ করেছিল। অন্যদিকে নেপাল ও ভারতে জল মজুত করার ড্যাম বা জলাধার নির্মাণ না করার প্রস্তাব বাংলাদেশ দিলে ভারত তা খারিজ করে দেয়। পঞ্চমতঃ গঙ্গা জলবন্টন চুক্তি আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক উপরাংশে প্রবাহিত দেশ (Upper Riparian Country) ও নিম্নে প্রবাহিত দেশ (Lower Riparian Country)র মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। ষষ্ঠতঃ ভারত কর্তৃক বে-আইনিভাবে জল ব্যবহার করার যে অভিযোগ বাংলাদেশ করেছিল তা অনেকটা সংগত ছিল। কারণ গঙ্গার উপরিভাগে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে প্রায় ৩৫০টি প্রকল্প ভারত তৈরি করেছিল যার ফলে ২০,০০০ কিউসেক জল ভারত নিম্নে প্রবাহিত হওয়ার আগেই খরচ করে ফেলেছিল। এরফলে গঙ্গার নিম্নভাগে জলসংকট দেখা দেয় যা বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী। ভারত এ ব্যাপারে কোন সদর্থক ভূমিকা নেয়নি। সপ্তমতঃ জলবন্টনেরও ক্ষেত্রে ছোট ছোট প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ সুরক্ষিত করতে সার্ককে মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করার অভিপ্রায় দেখা যায়। অষ্টমতঃ "The same principles will we applied to the sharing of flow of other common rivers."[৩৭]

পরবর্তীকালে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র Link Canalকে নিয়ে খানিকটা সমস্যা দেখা যায়। এ ব্যাপারে বলা প্রয়োজন যে— The Bangldeshi argument of the Ganga and the Bramhaputra belonging to two separate basins for instance, ignores the fact that the three rivers-the Ganga (Padma), the Bramhaputra, the Megnna, have been interacting for centuries, the fact which is made agonizingly apparent during floods. B.M. Abbas AT's argument that the link canal would merely shift the problems from one area to the other, and does not amount to augmentation in the proper sense of the term has again been Challenged recently by B.G. Verghese. According to him : 'The Ganga and the Bramhaputra have different seasonal rhythms. The Bramhaputra's flow thoughts in February after which the river starts rising. Where as the Ganga's discharge is lowest during the last 10 days of April, two months later. This asymmetry immediatly suggests the possiblility of diverting Bramhaputra waters into the Ganga to meet critical shortfalls at this time.[৩৮] এইভাবে জলবন্টন সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হলেও বাস্তবচিত্র কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিকূলে অবস্থান করে।

এইসময় বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ এর নেতৃত্বে যে জাতীয় মোর্চার সরকার (national front) ক্ষমতায় আসে বিদেশনীতির ক্ষেত্রে না ছিল তার বিশেষ আগ্রহ, না ছিল কোন আরব্ধ কর্ম সম্পাদন করার প্রয়াস। বাইরে থেকে বিজেপি এবং বামফ্রন্টের সমর্থনে কোনক্রমে টিকে থাকা এই সরকার 'মণ্ডলায়ন' নীতি নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে ইরাকের কুয়েত আক্রমণ ঘটিত সংকটেও বিদেশমন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ইন্দর কুমার গুজরাল ও তাঁর অধীনস্থ পদস্থ আমলারাই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। প্রতিবেশী দেশগুলি সম্বন্ধে নম্র মনোভাব গ্রহণ ও আপসে বিরোধ মীমাংসার ওপর জোর দেওয়ায় গুজরালের অনুসৃত নীতি (Gujral Doctrine) বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে রাজীব গান্ধীর মৃত্যুরপর অন্তবর্তীকালীন নরসীমা রাওয়ের সরকারের সময় তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল— শ্রীলঙ্কার অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া, নেপালের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন এবং চীনে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমনের উপস্থিতি। তাছাড়া বিশ্বায়নের মুখে ভারতবর্ষের বহির্দেশীয় অর্থনীতির উদারীকরণের সূত্রপাত হয় এই সময়।

এরপর ১৯৯৬ থেকে আর এক প্রস্থ কোয়ালিশন সরকারের উদ্ভব হতে থাকে। প্রথমে দেবগৌড়া এবং পরে নিজের সরকারের বিদেশমন্ত্রী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বিদেশনীতি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে গুজরাল

নীতি' বা Gujral Doctrine সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে এটি হলো দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ভারত শর্তহীন বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায়— "It was not a case of all give and no take but India could give a little more than it took. If the neighbour was willing to more move an inch forward, India should be willing to more a yard forward[৩৯] যা নতুন ধরনের সম্পর্ক উন্মোচনে সহায়তা করে।

এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী হিসাবে তাঁর 'প্রসারিত প্রতিবেশীত্বের' (Extending Neighbourhood) নীতি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। তাঁর এই সুপ্রতিবেশী সুলভ নীতিই পুরনো 'পঞ্চশীল' নীতিরই নবীকরণ ঘটেছিল বলে বিশ্লেষণ করা যায়। অন্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, পরস্পরের ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসাই হলো এই নীতির মূল প্রতিপাদ্য সংশ্লেষ। যাকে অন্যভাবে বলা যায়— "These ideas could influence public opinion in the neighbouring countries even more than those of the governments there. In any case India's sober and constructive responses would have a beneficial impact on relations with neighbours.[৪০] জনতা আমলে বিদেশমন্ত্রী বাজপেয়ী ও এই নীতিই অনুসরণ করে এসেছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবশ্য গুজরাল প্রথমে কোন সাফল্যের প্রমাণ দিতে পারেননি। তাঁরই সময় জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে সদস্য নির্বাচনকালে তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশ ভারতের পরিবর্তে জাপানকেই মনোনীতি করেছিল। তবে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর না করা এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে এ বিষয়ে কঠোর মনোভাব গ্রহণ তাঁর এবং তাঁর শরিকদলগুলির মধ্যে সমন্বয়ের পরিচায়ক।

১৯৯৭ সালের ১৪-১৬ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তঃসংসদীয় বিশেষ অধিবেশনে যোগদান করার জন্য ভারতে আসেন। এর আগে ৬-৭ই জানুয়ারী ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করেন সম্পর্ক পুনরায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই বছর ১২ই মার্চ যৌথ অর্থ কমিশনের পঞ্চম বৈঠক হয় সহযোগীতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়। এই বৈঠকে অর্থ ও বাণিজ্য, শিল্প ও পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন কিভাবে ঘটানো যায় তা অন্বেষণ করা। এইসময় স্থিরীকৃত হয় যে উভয় দেশের মাটিতে যেসব জঙ্গী শিবির গড়ে উঠেছে তা ধ্বংস করে ফেলাই বাঞ্ছনীয় যা উভয় দেশের নিরাপত্তা স্বার্থকে সুরক্ষিত করবে। ১৯৯৭ সালে ২৫ বছরের জন্য স্বাক্ষরিত 'শান্তি ও মৈত্রী চুক্তির' মেয়াদ শেষ হয়।

১৯৯৮ সালে ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকারের আবির্ভাব ঘটে যা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে তৎপর হয়। তবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ১৯৭১-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত সম্পর্কের গ্রাফটি এতই ওঠানামা করে যে এতে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের আঙ্গিকটি কখনোই স্পষ্টত অনুমান করা যায় না। ভারত-বাংলাদেশ দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক জাতীয় স্বার্থ, আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাবে কখনো হয় মধুর আবার কখনো হয় তিক্ততর। তাই এবার নজর দেওয়া প্রয়োজন যে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অন্তরায় বা প্রতিকূল বা বৈরীতার বিষয়গুলি কি কি? তাই NDA সরকারের সময় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক পর্যালোচনার আগে সামগ্রিকভাবে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের বাধা ও সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ আবশ্যিক।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অন্তরায় বা বৈরিতার দিকগুলি হলো— (১) সীমান্ত সমস্যা (২) জলবন্টন সমস্যা (৩) বাণিজ্য ঘাটতিকে কেন্দ্র করে সমস্যা (৪) চাকমা সমস্যা (৫) উদ্বাস্তু সমস্যা (৬) সন্ত্রাসবাদকে কেন্দ্র করে সমস্যা (৭) নারী, শিশু ও মাদক চোরাচালানকে কেন্দ্র করে সমস্যা (৮) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সমস্যা সমূহ। ১৯৭১-২০১৪ সাল পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উত্থান ও পতনের পেছনে যে সমস্যা বা বৈরীতা বিদ্যমান তার গবেষণাগত আশু বিশ্লেষণ নিম্নোক্তরূপে প্রতীয়মান।

১) সীমান্ত সমস্যা : ভৌগোলিকভাবে ভারতের সাথে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানার দৈর্ঘ্য হল ৪,০৯৬ কি.মি.। কিন্তু মোট সীমানার ৪২ কি.মি. নিয়ে সমস্যা রয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে বাংলাদেশের তিনদিকে রয়েছে ভারতের স্থলসীমান্ত আর চতুর্থ দিকটি বঙ্গোপসাগরের সীমানা বেষ্টিত। তাই এক কথায় বলা যায় 'India-Locked Country'.[৪১] তাই প্রায় সকল এলাকাতেই উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিরোধ লেগেই আছে। সেখানে উত্তেজনা-বাঙ্কার খনন, রেড এলার্ট, ফ্ল্যাগ মিটিং প্রায় নিত্যদিনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। সীমান্ত কেন্দ্রীক এইসকল সমস্যা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ওঠানামাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সালে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ এর হাত ধরে সীমান্ত পুনঃর্বিন্যাস ঘটেছিল ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে এবং ধর্মীয় সত্ত্বাকে কেন্দ্র করে ১১২টি ছিটমহল ভারতের হাতে এবং ৩২টি ছিটমহল পাকিস্তানের হাতে হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার স্থলসীমান্ত পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হয়। এবং প্রাথমিকভাবে কুমিল্লা ও

ত্রিপুরার সীমান্তে সাড়ে ছয় কি.মি. স্থলভাগকে কেন্দ্র করে বিবাদ শুরু হয় যা বর্তমানে অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া সীমান্ত অনুপ্রবেশ, সন্ত্রাস ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে সমস্যাবহুল করে তুলেছে।

দ্বিতীয়ত, সমুদ্র সীমান্ত বা জলসীমান্ত নির্ধারণকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে বিরোধ দীর্ঘদিনের। কারণ বাংলাদেশ তার সমুদ্রসীমাকে কেন্দ্র করে যে Exclusive Economic Zone (EEZ) তৈরি করতে চায় তা সম্পূর্ণতা পায়নি। অন্যদিকে আন্দামান ও নিকোরব দ্বীপপুঞ্জ ভারতের হওয়ার দরুন ভারত তার স্বাভাবিক স্বার্থরক্ষা করতে সক্ষম। আবার অন্যদিকে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের আঞ্চলিক সীমানার মধ্যে ১৯৭৫ সালে হাঁড়িয়া ভাঙা মোহনার দক্ষিণ তালপট্টি বা নিউম্যুর/পূর্বাশা নামে যে দ্বীপটি জেগে ওঠে ১৯৮১ সালে ভারতীয় নৌ-বাহিনী সেটি দখল করে নেয়। প্রকৃতপক্ষে উভয়দেশ দ্বি-পাক্ষিক দল প্রেরণ করবে উক্ত দ্বীপে এবং জলপ্রবাহের দিক নির্ধারণ করে আন্তর্জাতিক আইন মেনে উক্ত সমস্যার সমাধান করবে উভয়পক্ষ এটাই ছিল নির্ধারিত। কিন্তু ভারত কার্যত তা দখল করে নৌ ঘাটি স্থাপন করেছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়— The recent developments reported by the media last year show a renewal of tension regarding the unresolved issue since the Indian Border Security Forces (BSF) has established a base in the island, which is being regularly visited by Indian naval forces.[৪২] সম্প্রতি উক্ত দ্বীপকে কেন্দ্র করে ভারতের কার্যকলাপ বাংলাদেশের মনে ভীতির সঞ্চার করে, এবং সার্বভৌমিকতাকে প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন করে তোলে।

এছাড়াও ১৯৭১ সাল থেকে মেঘালয় রাজ্যের পাদুয়া এবং সিলেট জেলার টিমবিল ভূখণ্ডের মধ্যে সীমান্ত অমীমাংসিত রয়ে গেলেও ভারত উক্ত ভূখণ্ড ব্যবহার করে আসছে। ভারতীয় সেনা পাদুয়া সেনাছাউনি থেকে বেরোনার জন্য বাংলাদেশের সীমান্তে ৩০০ মিটার ফুটপাত তৈরি করেছে যা বাংলাদেশ ভালোভাবে নেয়নি। পরবর্তীকালে ২০০৩ সালে ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে ১০,০০০ মানুষ এবং বাংলাদেশী ভূখণ্ড থেকে ১০০০ মানুষকে বলপূর্বক তাড়িয়ে দেওয়া হয় যা ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত সমস্যার একটি অংশ বিশেষ। আবার উভয়দেশের সীমান্ত অঞ্চলে BSF ও BDR গুলি চালনা ও পাল্টা গুলি চালনা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে যা উভয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাসের পরিচায়ক। বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'-এর রিপোর্ট ২০০৪ অনুযায়ী ২০০১-২০০৩ সালের মধ্যে BSF-এর হাতে ২৮৩ জন গাংস্টার মারা গেছে যারা বাংলাদেশী, তিনজন মহিলা ধর্ষিত এবং ১৯১ জন আটক ৩০ জন ডাকাত ধরা পড়েছে।[৪৩] আরো বলা যায়— Also during this period,

243 people were killed as a result of exchange of firing between the border security forces of the two countries.[৪৪]

'Push out' ও 'Push in' নীতি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সমস্যাকে নতুনভাবে তুলে ধরে। ২০০৩ সালে ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী দাবী করেন যে ভারতে তিন মিলিয়ন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশ অবশ্য এই বক্তব্যকে ভিত্তিহীন বলে উপেক্ষা করে। কিন্তু উক্তসময়ে কোচবিহারের মাথাভাঙা থানার অন্তর্গত সাতগাছিতে ২১৩ জন বাংলা ভাষাভাষী 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী'কে চিহ্নিত করা হয় এবং 'নোম্যানস ল্যান্ডে' পাঠানো হয় ফলত BSF বা BDR কেউ তাদের গ্রহণ করেনি। এপ্রসঙ্গে আরো বলা যায়— Indian BSF and miscreants killed 357 Bangladeshis and violated human rights in a total 1774 incidents in five years (1 January 2000 to 31 December 2004). The incidents that include murder, abduction and smuggling took place in the north and South eastern border areas following intrusion of the BSF and Indian Criminals into Bangladesh. Along with this, the 'Push in' attampts create inhuman situations in the border areas.[৪৫]

সীমান্ত সমস্যার আরেকটি বিষয় হলো ভারত তার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বা Fencing করছে যা বাংলাদেশের পক্ষে ভীতিদায়ক বা আধিপত্যকামিতার প্রতীক। ভারত প্রথম পদক্ষেপে ১, ৩৫৭ কিমি আন্তর্জাতিক সীমনায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে; দ্বিতীয় পদক্ষেপে ২,৪২৯.৫ কিমি, বেড়া করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়া ভারত তার ৩০০ কিমি. আন্তর্জাতিক সীমানায় বেআইনি অনুপ্রবেশকারী রোধ করার জন্য উক্ত ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া উভয় সীমান্তে যৌথ চলাফেরা, যাতায়াত সচল রাখা, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালান ও পাচার রোধ করা, শিশু ও নারী পাচার রোধ করার জন্য কাঁটাতারের বেড়া প্রয়োজন। বাংলাদেশ এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ২০০৫ সালে বলে যে ভারত নিরাপত্তা বলয়ের ১৫০ ইয়ার্ডের মধ্যে বেড়া দিতে পারবে না, ভারত তার উত্তরে বলে যে কাঁটাতারের বেড়া 'নিরাপত্তা বলয়ের' মধ্যে পড়ে না।[৪৬]

এইভাবে নানা সমস্যা সীমান্তকে ঘিরে থাকলেও ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে কিছু সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু 'তিনবিঘা' করিডোর হস্তান্তর না হওয়া বা 'ছিটমহল' সমস্যার সমাধান না হওয়া ভারত-বাংলাদেশ কৌশলগত সংযুক্তিকে সম্পূর্ণ করতে

পারেনি। ভারত ও বাংলাদেশ সম্পর্কের অন্তরায় এই ‘ছিটমহল সংকট’। ছিটমহল হলো উভয় দেশের মধ্যে অবস্থিত উভয় দেশের টুকরো টুকরো ভূখণ্ড যার কোন রাজনৈতিক স্বীকৃতি নেই। যে ভূখণ্ডের মানুষের নেই কোন নাগরিকত্ব, অধিকার, স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের পরিবেশ। শুধু আছে ভয়, অত্যাচার, লাঞ্ছনা, নির্যাতন ও আতঙ্ক। ‘ছিটমহল’ কথাটার আক্ষরিক অর্থ ‘ছিট’ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন ‘মহল’ অর্থাৎ ভূখণ্ড তাই সামগ্রিকভাবে উভয় দেশের কাছে এটি একটি বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড। এ সম্বন্ধে বলতে গেলে আরো বলতে হয়— “In this sense, Chit means a fragment and mahal means land. Chitmahals are enclaves that are geographically separated from the mainland but paying revenue to it”.[৪৭] আরো বলা যায়— They are the nowhere people. They are not citizen of any country. They have no voting rights, the official statistical agencies or census personel have never contracted them. Infact some of them have been displaced from their homes for over two decades now. Yet,they have not been classified as internally displaced people or refugees. The question of formulating rehabiliation package for them has not arisen ever.[৪৮] তাই ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের নিরিখে ছিটমহল সমস্যা একটি জ্বলন্ত সংকট।

ছিটমহলের বাসিন্দাদের না আছে হাসপাতাল, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্কুল না আছে বিধায়ক বা সাংসদ। নেই ভোটাধিকার। কেন এই অবস্থা? তা অন্বেষণ করতে গেলে ফিরে তাকাতে হয় ১৬৫৭ সালের দিকে। শাহজাহান তখন মুঘল সম্রাট। কোচবিহারের রাজা ছিলেন প্রাণনারায়ণ। প্রাণনারায়ণ কামরূপের সুবেদার মীর লুৎফুল্লাকে যুদ্ধে পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা কিছু এলাকা কেড়ে নেন। তারপরে প্রায় ৭০ বছর ধরে এভাবে এলাকা কাড়াকাড়ি চলতে থাকে। তৈরি হয় সমস্যা। যার জের এখনও ক্রিয়মান। প্রাণনারায়ণের সময় থেকেই দেখা যায়, কোচবিহার রাজাদের তহবিলে এমন কিছু এলাকার রাজস্ব জমা পড়ে সেগুলি চারদিক মুঘল এলাকা (মুঘলান) পরিবেষ্টিত। একইভাবে রংপুরের নবাবের কোষাগারে যে রাজস্ব জমা পড়েছে, যা আসছে এমন কিছু এলাকা থেকে যে মুঘল এলাকার চারিদিকে কোচবিহার রাজার এলাকা (রাজওয়ারা)। অর্থাৎ মূল ভূখণ্ড থেকে এই সব অংশ বরাবরই ব্রাত্য ও বঞ্চিত। রংপুরের নবাবের এলাকার মধ্যে থাকা রাজওয়ারাগুলিই এখন ভারতীয় ছিটমহল। আর কোচবিহার রাজার এলাকার মধ্যে থাকা মুঘলানগুলি বাংলাদেশী ছিটমহল।

১৯৩৭ সালে এ সি হার্টলে কোচবিহার এবং রংপুরের যে মানচিত্র তৈরি করেছিলেন তাতে

ছিটমহলগুলি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত ছিল। স্বাধীনতার পর কোচবিহারের রাজা এবং রংপুরের নবাব— কেউই নিজদের ভারত বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করেননি। স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। ১৯৪৯ সালে কোচবিহার আসে ভারতে। রংপুর যায় পাকিস্তানে। ছিটমহল সঙ্গে নিয়েই। ভারতীয় এলাকায় বাংলাদেশী ছিটের সংখ্যা বর্তমানে ৫১টি আর বাংলাদেশের মধ্যে ভারতীয় ছিটের সংখ্যা ১১১টি। এর মধ্যে ভারতীয় সীমানার মধ্যে থাকা আঙরাপোতা এবং দহগ্রাম ছিটের সমস্যাই কেবলমাত্র সমাধান হয়েছে 'তিনবিঘা' করিডরের মাধ্যমে। দুদেশের বাকী ছিটের বাসিন্দারা রয়ে গিয়েছে নিজভূমে পরবাসীর মতো। তাঁদের কাছে ১৫ই আগস্ট বা ২৬শে জানুয়ারীর কোন ব্যবহারিক গুরুত্ব নেই।

মূল ভারতীয় এলাকায় এলে ছিটমহলের বাসিন্দাদের সঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের মতো ব্যবহার করা হয়। এমনকি তাঁদের উদ্বাস্তু বলেও ভাবা হয়না। দেশেরই এক ভূখণ্ড থেকে তাঁরা চলে এসেছেন অন্য ভূখণ্ডে। অথচ সমস্ত মানুষই জন্মসূত্রে স্বাধীন এবং তাদের মর্যাদাও অধিকার সমান। তাই ভারতীয় সংবিধানের ১১(১) নং ধারায় বলা হয়েছে "ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার" প্রত্যেক নাগরিকের আছে। ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক অফিসার বলেন, "বাস্তব পরিস্থিতিতে ছিটমহলের বাসিন্দাদের বলা উচিত আভ্যন্তরীণ বস্তুচ্যুত (Internally displaced) মানুষ"। কিন্তু ২০০০ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষণাপত্র অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষের যে নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে আসা কাউকেই আভ্যন্তরীণ বস্তুচ্যুত বলা যাবে না।[৪৯] ছিটমহলের বাসিন্দাদের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে আসতে হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের নয়া নীতিতে তাই তাদের আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত বলা যাবেনা। তাই বলা যায়— The Peculiarity of the Chitmahal Problem make these people stand before a big question mark with respect to their status. আসলে এই লক্ষাধিক মানুষের যেহেতু কোন ভোটাধিকার নেই সেহেতু রাজনৈতিক দলগুলিও এই সমস্যা সমাধানে সদর্থক মনোভাব বা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয় না।

ভারত-বাংলাদেশ ছাড়া ছিটমহল সংক্রান্ত এই সমস্যা অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ডেও রয়েছে। নিউজিল্যান্ডের সীমানার মধ্যে এমন কিছু এলাকা এখনও রয়ে গিয়েছে যেগুলি অস্ট্রেলিয়ার কিন্তু দুই দেশের সম্মতিক্রমে এই ছিটমহলের বাসিন্দাদের দ্বি নাগরিকত্ব রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড দুই দেশেরই পরিচয়পত্র রয়েছে তাঁদের। এখানে ভারত কিংবা বাংলাদেশ কোনও দেশের সংবিধানে দ্বি-নাগরিকত্বের স্বীকৃতি নেই। তাই ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহলের বাসিন্দারা অসহায়, পরিচয়হীন।

১৯৫৮ সালের নেহেরু নুন চুক্তিতে ছিটমহল বিনিময়ের চেষ্টা একটা হয়েছিল, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর নেহেরু নুন চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। নেহেরু নুন চুক্তিতে এলাকা বিনিময়ের যে কথা বলা হয়েছিল তা কার্যকর করতে গিয়ে কী কী সমস্যা হতে পারে তা নিয়ে বেশ কয়েকটি মামলাও হয়। বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার পর সেই সমস্যাগুলি ফের সামনে উঠে আসে এবং তারফলে ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির জেরে আঙরাপোতা-দহগ্রাম বাংলাদেশে থেকে যায়। বেরুবাড়ির পুরোটাই চলে আসে ভারতের সঙ্গে। আসলে ছিটমহল বিনিময়ে সেখানকার বাসিন্দাদের নাগরিকত্ব পরিবর্তন করতে হতো। কিন্তু বিনিময় আটকে যাওয়ায় নাগরিকত্ব স্থিতিশীল থাকে। তবে ছিটমহলের বাসিন্দারা এখন অনুভব করেন যে বিনিময়ের মাধ্যমে নাগরিকত্ব বদলে গেলেই বোধহয় ভালো হতো। এভাবে নামগোত্রহীন হয়ে অন্তত থাকতে হতো না।

বস্তুত 'তিনবিঘা চুক্তি' এই ছিটমহল সমস্যাগুলির সমাধানে নতুন দিক উন্মোচিত করতে পারত। কিন্তু ভারতীয় ছিটমহলগুলিকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জুড়তে বাংলাদেশের কাছ থেকে কখনও জমি লিজ নেওয়ার প্রস্তাব ভারত সরকার দেয়নি। এ ব্যাপারে প্রাক্তন সাংসদ অমর রায় প্রধান একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করে দিল্লীতে জমা দিয়েছিলেন। ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, জলপাইগুড়ির দক্ষিণ বেরুবাড়ির দইখাতা সীমান্ত দিয়ে একটি রাস্তা তৈরি করে বাংলাদেশের মধ্যে থাকা ভারতীয় ভূখণ্ডের ১৭ বর্গমাইল এলাকাকে যুক্ত করা। যেমন হয়েছে ''তিনবিঘা''। এক্ষেত্রে ভারত সরকারকে বাংলাদেশের কাছ থেকে কিছু জমি লিজ হিসাবে নিলে, তাতে ৫০ হাজার ভারতীয় নাগরিকের নিত্যদিনের অপমান, লাঞ্ছনা দূর হতো। পরিকল্পনা অনুযায়ী ওই করিডর বা রাস্তা তৈরি করতে বাংলাদেশের মাত্র আড়াই বিঘা জমি লিজ নিলেই হত। কিন্তু সেই 'আড়াই বিঘা করিডর' প্রস্তাব ফাইল বন্দী হয়ে পড়ে রয়েছে দিল্লীর বিদেশ মন্ত্রকে। ওই 'আড়াই বিঘা করিডর' সমর্থকদের দাবী, ওই পথ তৈরি হলে শালবাড়ী, কাজল দিঘি, নটনটকী, বেউলডাঙা ভারতীয় ছিটকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগ করা যেত। দহলা, খাগড়াবাড়ি, কোটভজনি, বালাপাড়ার মতো বড় ছিটগুলিকে মূল ভারতীয় ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করার সম্ভাবনা বাড়তো।

২০০১ সালে সীমান্ত এবং এলাকা দখল সংক্রান্ত অন্য সমস্যার সমাধানে ভারত ও বাংলাদেশ একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করেছিল। সেই সময় ছিটমহলের বসিন্দাদের সংগঠন— Association for the Protection of citizen's Rights for Indian Chitmahal Residents and Oustees (APCRICRO) তৎকালীন বিদেশসচীব চোকিলা আইয়ারকে একটি চিঠি দেয়। ওয়ার্কিং গ্রুপ যেন আলোচনার সময়

তাদের বক্তব্য শোনে। সেই চিঠির উত্তর আজও আসেনি। এ প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মহেন্দ্র পি লামার বক্তব্য হলো— The Government has two options. If the Chitmahal oustees are recognized as forced migrants, they will have to be recognised as refugees and given all the benefits due to them. If they are recognised as Indian Citizens the government will have to classify them as Internally displaced people and provide rehabiliation package.[৫০]

ভারত-বাংলাদেশের একটি বড় প্রতিবেশী এবং আয়তন ও অন্যান দিক দিয়ে বাংলাদেশ খুব ছোট ও দুর্বল রাষ্ট্র সেহেতু কেউ কেউ মনে করেন এই দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক (Dependency Relationship) মেনেই পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। তাই 'ছিটমহল' সমস্যার সমাধান করতে দ্বি-পাক্ষিক সদর্থক ভূমিকা আবশ্যক। সম্প্রতি উভয় দেশের রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে বৈঠক ও পাল্টা কথাবার্তা চললেও এই বিষয়ে উভয়পক্ষ উদাসীন। এই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানকল্পে তাই প্রয়োজন উভয় দেশের নেতৃত্বের সদিচ্ছা ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ। তবেই ছিটমহল বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড না থেকে মাতৃভূমির সঙ্গে একাত্ম হবে। অতি সম্প্রতি স্থলসীমান্ত চুক্তি নিয়ে উভয়পক্ষ কার্যকরী ভূমিকা নিতে শুরু করলেও শেষপর্যন্ত মনমোহন সিং ও শেখ হাসিনা সফল হতে পারেন নি। তাই সীমান্ত সমস্যা একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

২) জলবন্টন সমস্যা : ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের তিক্ততার আরেকটি দিক হলো জলবন্টন সমস্যা। যাকে এক কথায় বলা যায় 'Linking Rivers, De-linking Relations'. প্রাকৃতিকভাবে বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত ৫৪টি নদীর জলপ্রবাহ ভারতের উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ভারত হল উপরিভাগে প্রবাহিত (Upper Riparian Country) দেশ এবং বাংলাদেশ হল নিম্নে প্রবাহিত (Lower Riparian Country) দেশ। তাই উপরিভাগ থেকে নিম্নভাগে জল প্রবাহের ধারা বা গতি স্বাভাবিক হবে এটাই কাম্য। কিন্তু ভারত তা বিভিন্নভাবে ব্যাহত করে এই সমস্যাকে জিইয়ে রেখেছে। যেটা আন্তর্জাতিক নদী আইনের বিরোধী। তবে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এই তিনটি নদীর পর্যাপ্ত জলপ্রবাহের উপর নির্ভরশীল ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান। বাংলাদেশ শুখা মরসুমে এই তিনটি নদীর উপর অধিক নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ৩৭% স্থলভাগের ২/৩ অংশ মানুষ মূলত গঙ্গার উপর নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে বলা যায়— The two countries also have diffrences over sharing the flow of water of the 54 international rivers that flow from India into

Bangladesh. The rivers are vital for Bangladesh irrigation, navigation and ecological sustance. Joint River Commission is discussing the division of water of six common rivers, notably Teesta, but with little progress water is becoming scare due to a rapid increase in population.[৫১] The non availablity of adequate water during the lean period has caused desertification, crop loss, decrease fish production and salinity in the ground water, flash foods etc.[৫২]

সমস্যার সূত্রপাত ঘটে ১৯৫১ সালে গঙ্গার জলসংকটের ফলে কলকাতা বন্দরের নাব্যতা কমে যাওয়াকে কেন্দ্র করে। তখনই ফারাক্কা ব্যারেজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ভারত। সামগ্রিকভাবে শুখা মরসুমে ৪০০০০ কিউসেক জল গঙ্গায় প্রবাহিত হলে কলকাতা বন্দরের অস্তিত্ব রক্ষা পাবে যার ফলে ফারাক্কা ব্যারেজ আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব দেয় যে গঙ্গার জলবন্ট নিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধীনে একটি উপদেষ্টা গোষ্ঠী তৈরি করা হোক, ভারত তাতে রাজী হয়নি। ১৯৬৮-১৯৭১ সাল পর্যন্ত উভয় রাষ্ট্রের সচিব পর্যায়ে বহুবার আলোচনা হলেও তার সমাধান করা যায়নি। ১৯৭০ সালে ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরি হয়। ১৯৭২ সালে উভয় দেশ তৈরি করে 'Joint Rivers Commission' (JRC) এবং এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হলো উভয় দেশের স্বার্থকে সুরক্ষিত করা এবং মরসুম অনুযায়ী জলের প্রবাহ বৃদ্ধি করা। অন্যদিকে উভয়পক্ষ দুটি প্রস্তাব দুই দেশকে দেয়— প্রথমতঃ বাংলাদেশ প্রস্তাব দেয় যে ভারত ও নেপালে গঙ্গার জলকে জলাধারে বেঁধে রাখা হোক এবং খরার সময় তা ছাড়া হোক। দ্বিতীয়তঃ ভারত প্রস্তাব দেয় যে গঙ্গার সঙ্গে বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে সংযোগকারী খাল (link canal) তৈরি করা হোক তার ফলে বাংলাদেশের জলসমস্যা অনেকটা মিটে যাবে।[৫৩] কোন পক্ষই এই প্রস্তাব সমর্থন করেনি।

পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালে যখন ফারাক্কা ব্যারেজ কার্যকরীভাবে চালু হয় তখন জলবন্টনকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফলতঃ ১৯৭৫ সালের ১৮ই এপ্রিল ফারাক্কা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় উভয়দেশের মধ্যে। এই চুক্তিতে গঙ্গার জলবন্টন সম্পর্কে যে প্রস্তাব দেওয়া হয় তা হলো— on 18th April 1975 a temporary accord was concluded between India and Bangladesh for sharing the Ganges waters between 21 April-31 May 1975. India had agreed to take a share less than its requirment. India's share of waters varied between 20 percent in the first 10 days to 24.43 percent in the last 10 days, while Bangladesh received 80 pecent and 75.57 percent respectively. The agreement was consider to be an important breakthrough.

Doubts were, however, raised if it would follow a permanent solution of the problem.[৫৪] এবার দেখা যাক বস্তবে জলের পরিমাণ কি ছিল। নিম্নোক্তভাবে তা উল্লেখ করা হোল।

ফারাক্কা চুক্তি অনুযায়ী ভারত-বাংলাদেশ জলবন্টনের পরিমাণ (কিউসেক হিসাবে)

১০ দিনের মেয়াদ	সামগ্রিক জল প্রবাহের পরিমাণ	হুগলী নদীতে প্রবাহিত জলের পরিমাণ	বাংলাদেশের জন্য প্রবাহিত জলের পরিমাণ
২১শে-৩০শে এপ্রিল-১৯৭৫	৫৫,০০০	১১,০০০	৪৪,০০০
১লা মে-১০ই মে-১৯৭৫	৫৬,৫০০	১২,০০০	৪৫,০০০
১১ই মে-২০শে মে-১৯৭৫	৫৯,২৫০	১৫,০০০	৪৪,২৫০
২১শে মে-৩১শে মে-১৯৭৫	৬৫,৫০০	১৬,০০০	৪৯,৫০০

Source : Government of Bangladesh, Crisis on the Ganges, p.1[৫৫]

উপরোক্ত চুক্তির মেয়াদ ৩১ শে মে ১৯৭৫ এ ফুরিয়ে গেলে বাংলাদেশের সমরতন্ত্রী সরকার ভারতকে জল প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য আবেদন জানায়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ গঙ্গার জলবন্টন ইস্যুকে আন্তর্জাতিক স্তরে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তুলে ধরে। ১৯৭৬ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার ৩১ নং সেশনে বিষয়টি বাংলাদেশ উত্থাপন করে। ভারত এই সমস্যাকে মিটিয়ে ফেলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং পুনর্বার দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা শুরু হয় ১৯৭৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর ঢাকাতে। ১৯৭৭ সালে ভারতে জনতা সরকারের অধীনে এই সমস্যা মিটিয়ে ফেলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু হয়।

১৯৭৭ সালের ৫ই নভেম্বর গঙ্গার জলবন্টন চুক্তি পাঁচ বছরের জন্য স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মূল বক্তব্য হলো ভারত খরার মরসুমে ২০,৫০০ কিউসেক এবং ৩৪,৫০০ কিউসেক জল বাংলাদেশ পাবে (২১-৩০শে এপ্রিল)। পরবর্তীকালে ভারত বাংলাদেশকে ৪০,০০০ কিউসেক জল প্রদান করে এবং স্থানীয় এলাকার ব্যবহারের জন্য ২০০ কিউসেক জল গ্রহণ করে। ১৯৮২ সালে এই চুক্তির মেয়াদ

শেষ হলে উভয়পক্ষ ১৯৮২ সালের ৭ই অক্টোবর Memoradum of Understanding (MOU) স্বাক্ষর করে এবং চুক্তির মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে আবার নতুন করে ১৯৮৫ সালের ২২শে নভেম্বর MOU স্বাক্ষরিত হয় চুক্তির মেয়াদ ৩ বছর বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীকালে উভয় দেশের সম্পর্কের পারদ নামতে থাকে। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে নতুনভাবে তুলে ধরে। এই বছর JRC-এর রুটিন বৈঠক সংঘটিত হয়েছিল।

ভারত-বাংলাদেশ দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কে জলবন্টন সমস্যার সমাধানে ১৯৯৬ সালের ১২ই ডিসেম্বর উভয় রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী গঙ্গা জলবন্টন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যার মূল কথা হলো—

১। যদি মোট জলের পরিমাণ ৭০,০০০ কিউসেক প্রবাহিত হয়, তবে উভয় দেশ ৫০% করে ব্যবহার করবে।

২। যদি মোট জলের প্রবাহ ৭০,০০০-৭৫,০০০ কিউসেক হয়, তবে বাংলাদেশ ৩৫,০০০ কিউসেক জল ব্যবহারের জন্য পাবে। বাকী জল ভারত ব্যবহার করবে।

৩। যদি মোট জলের প্রবাহ ৭০,০০০ কিউসেক বা তার বেশী হয়, তখন ভারত ৪০,০০০ কিউসেক জল ব্যবহার করবে। বাকী জল বাংলাদেশের জন্য ছাড়া হবে।

৪। শুখা বা খরা মরসুমে (১লা মার্চ-১০ই মে) ১০দিন অন্তর তিনটি ভাগে উভয় রাষ্ট্র ৩৫,০০০ কিউসেক জল পাবে।

৫। যদি জল প্রবাহের পরিমাণ ৫০,০০০ কিউসেক এর নীচে নেমে যায় তাহলে আপৎকালীন অবস্থার সংকট বিবেচনা করার পথ খোলা থাকবে।

৬। এই চুক্তির ৩০ বছর মেয়াদ স্থিরীকৃত হল এবং ৫ বছর অন্তর উভয় রাষ্ট্র পুনর্বিবেচনা করবে। যদি উভয়ে মনে করে ২ বছর পরও এর পুনর্বিবেচনা করতে পারে।

এই চুক্তির পরবর্তীকালে ভারতে তীব্র সমালোচনার ঝড় ওঠে। তবে ভারত চায় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে গঙ্গা সংযুক্তি। তাহলে ভারতের পশ্চিম ও উত্তরভাগে গঙ্গার জল সংকট অনেকটা মিটবে এবং ভারতের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা পাবে। তাই ভারতের নদী সংযোগ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে— However, India’s river linking projects once again reinforced the water dispute between the two countries. Given the growing need of water for agriculture in the two countries, the matter can take a serious town. Bangladesh has disliked a recent

Indian Proposal to link 30 mjor International rivers to divert water to drought prone south eastern and south western parts of India. The project task force Chief Suresh Prabhu says the availability of water in Bangladesh in 12 times higher than in India. Bangladesh's problem is having too much of water during rainy season and shortage of it during winter.[৫৬]

In this situation taking advantage of the recent treaty India has already entered into an agreement with Bhutan to divert flows of Sankos and Manas. Which are tributory to the Brahmaputra that joins the Ganges down stream. According to international law inter-basin transfer of water is lawful. If India succeeds in the diverting the flow from sankos and Manas, then Bangladesh is surely losing its Brahmaputra water also. India has already constructed diversion structure over Teesta and Mahananda and also planning to construct a reservoir on the Barak. Which is the main source of Meghna.[৫৭]

এছাড়াও গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জলসম্পদ উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে Co-basin রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বোঝাপড়া প্রয়োজন। যেমন গঙ্গাকে কেন্দ্র করে ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে এবং ব্রহ্মপুত্রকে কেন্দ্র করে ভারত, ভুটান, চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগীতার সৃষ্টি হলে এই নদী দুটিকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে যা কাঠ, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, ফল ও উল প্রভৃতি দ্রব্যের মাধ্যমে সম্ভব। আবার অতি সম্প্রতি তিস্তার জলবন্টনকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে তিক্ততার সূচনা হয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ জলবন্টন সমস্যার পেছনে যে বিষয়গুলি কাজ করছে সেগুলি হল— প্রথমতঃ উভয়দেশের মধ্যে প্রবাহিত জল সমানভাগে বন্টিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বৃহৎশক্তি ভারত তাই ক্ষুদ্র শক্তি বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকদের মধ্যে একটি ভীতির আবহ কাজ করে।

দ্বিতীয়তঃ ভারত সহযোগীতার হাত বাড়ালেও বাংলাদেশ তা এড়িয়ে যায়, অন্যদিকে ভারত দ্বি-পাক্ষিক সমস্যার সমাধান চায়, কিন্তু বাংলাদেশ নেপালকে সংযুক্ত করে ত্রি-পাক্ষিক সমাধান চায়, যা সম্ভব হয়নি।

তৃতীয়তঃ গঙ্গার জলবন্টনকে বাংলাদেশের শাসক এলিট শ্রেণী রাজনীতিকরণ করেছে। যার

দরুন জাতীয় ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের সময় তারা ভারতের 'hegemony and domination' অনুভব করে। যার ফলে বাংলাদেশের মনোভাব নঞর্থক প্রমাণিত হয়।

চতুর্থতঃ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সংযোগ হলে ৩২০ কিমি. দীর্ঘ নদীপথের তীরবর্তী মানুষ উপকৃত হতো। যার ১২০ কিমি. বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। কিন্তু বাংলাদেশ তা মানতে চায়নি তাই সমস্যা বেড়েছে।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়— The Ganges water issue has contributed to a considerable extent to the Vitiation of friendship between Bangaladesh and India, and to the identification of India as the country's major source of threat. The issue has been instrumental in fomenting anti-Indian hysteria in Bangladesh.[৫৮] এইভাবে বিভিন্ন সময় জল বন্টন সমস্যাকে কেন্দ্র করে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়েছে এবং আগামীদিন এগিয়ে চলবে। কিন্তু জলবন্টনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের 'ভারত বিরোধী' অবস্থান আজও প্রাসঙ্গিক।

২) বাণিজ্য ঘাটতিকে কেন্দ্র করে সমস্যা : জাতিরাষ্ট্র সমূহের সংহতির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব— যা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে করা যেতে পারে। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ শান্তি প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক লেনদেনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তা দ্বি-পাক্ষিক সেতুবন্ধনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক হিসেবে অনেকাংশেই দেখা দেয়নি। বাংলাদেশ এখন অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়িয়ে দেওয়ায় এ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আবার ভারতের ব্যবসায়ীগণও বাংলাদেশ-এর সাথে বাণিজ্য করার উৎসাহ হারাচ্ছে সে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিক 'হরতাল ভিত্তিক রাজনীতি'র কারণে। ফলতঃ বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।

প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ এশিয়ার 'ভূ-অর্থনৈতিক' গুরুত্বের নিরিখে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার বাতাবরণ সৃষ্টি করা। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্ক-এর একটি নির্ধারক হিসাবে ভূমিকা পালন করে। ভারত হলো বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক সহযোগী দেশ। আরো বলা যায় "Bangladesh is India's sixth largest customer."[৫৯] তাসত্ত্বেও ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সমস্যার পেছনে কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় প্রথমতঃ, ভারত দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সূচনা করার ফলে

বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যাপক বাণিজ্যিক ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। এই বাণিজ্য ঘাটতির পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রক্রিয়া। দ্বিতীয়তঃ ভারতের বৈচিত্র্যময় উৎপাদন স্বক্ষমতা যা বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ঘাটতির কারণ। এছাড়া শুল্ক, সম-শুল্ক ও শুল্কহীন দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে বাধা দূর করার জন্য উভয় দেশের সদিচ্ছার অভাব সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয়তঃ শুল্ক বা শুল্কহীন দ্রব্যের রপ্তানি ও আমদানির ক্ষেত্রে বাধা দূর করা সম্ভব হয় SAARC-এর দ্বাদশ সম্মেলন থেকে যার ফলে ২০০৬ সালে তৈরি হয় ''দক্ষিণ এশিয় মুক্ত বাণিজ্য এলাকা' (SAFTA) কিন্তু বাংলাদেশ এরপরেও রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছু বাধানিষেধ আরোপ করে।

তাই প্রাথমিকভাবে ভারত-বাংলাদেশ আমদানি রপ্তানির বিষয়গুলি দেখতে গেলে দেখা যায় যে বাংলাদেশ বস্ত্র ও সহযোগী দ্রব্য, শাক-সব্জি, খনিজ দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, জীবন্ত পশু, ধাতু, মোটরগাড়ী ও যন্ত্রপাতি এবং শিল্প কারখানার মেশিনসমূহ ভারত থেকে আমদানি করে। এছাড়া কাঁচাপাট, পাটের ব্যাগ বা থলে, মাছ, চামড়া, রাসায়নিক সার ও ঔষধ রপ্তানি করে ভারতকে। যার ফলে আমদানি রপ্তানির ধারাবাহিক টেবিল দেখলে বোঝা যাবে বানিজ্য ঘাটতির পরিমাণ অর্থনৈতিক সমস্যাকে তুলে ধরে। ১৯৮০-৯০, ১৯৯১-২০১৩ সালের ধারাবাহিক টেবিল তার প্রমাণ।

টেবিল-১

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ধারা (মিলিয়ান ডলারের হিসাবে)

সাল	বাংলাদেশ কর্তৃক রপ্তানিযোগ্য	বাংলাদেশ কর্তৃক আমদানিযোগ্য	বাণিজ্যিক ভারসাম্য
১৯৮০	৮.০০	৫৫.৬০	-৪৭.৬০
১৯৮১	২০.২০	৬৪.০০	-৪৩.৮০
১৯৮২	২০.৩০	৪৩.৩০	-২৩.০০
১৯৮৩	৬.৯০	৩৭.৯০	-৩১.০০
১৯৮৪	২৮.৩০	৬০.১০	-৩১.৮০
১৯৮৫	২৯.৬০	৬৪.৯০	-৩৫.৩০
১৯৮৬	৭.৭০	৫৪.২০	-৪৬.৫০
১৯৮৭	১১.০০	৭৪.৪০	-৬৩.৪০
১৯৮৮	৮.৭০	৯০.০০	-৮১.৩০

১৯৮৯	১০.৭০	১২০.৭০	-১১০.০০
১৯৯০	২১.৭০	১৭০.৩০	-১৪৮.৬০

Source : IMF, Intenational Financial Statitics IMF, Direction of Trade Statistics yearbook.[৬০]

টেবিল-২

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ধারা (মিলিয়ান ডলারের হিসাবে)

সাল	বাংলাদেশ কর্তৃক আমদানিযোগ্য	বাংলাদেশ কর্তৃক রপ্তানিযোগ্য	বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধিও ঘাটতির পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১৯৯০-৯১	১৮০.৮৮	৩১.০৬	-১৪৯.৮২
১৯৯১-৯২	২২৬.২৫	২.০৭	-২২৪.১৮
১৯৯২-৯৩	৩৪১.৯৭	৯.৮৫	-৩৩২.১২
১৯৯৩-৯৪	৪১৬.৬৬	১৬.৮১	-৪০০.১৮
১৯৯৪-৯৫	৬৯০.০৮	৪৫.১৭	-৬৪৪.৯১
১৯৯৫-৯৬	১০৮২.৫৫	৭২.৪৮	-১০১০.০৭
১৯৯৬-৯৭	৯৩৭.৫৫	৪৬.২৫	-৮৯১.৩০
১৯৯৭-৯৮	৯৩৫.৯২	৬৫.৫৮	-৮৭০.৩৪
১৯৯৮-৯৯	১২৩১.৬১	৬৯.৭৯	-১১৭১.৮২
১৯৯৯-২০০০	৮১৭.৩৭	৬৪.৮৮	-৭৫২.৪৯
২০০০-২০০১	১১৭১.৩৩	৬২.২৮	-১১০৯.০৫
২০০১-২০০২	১০২২.০০	৫০.২৮	-৯৭১.৭২
২০০২-২০০৩	১৩৫৭.৭৯	৮৩.৬১	- ১২৭৪.১৮
২০০৩-২০০৪	২০৯২.৬৩	৮৯.৩২	-২০০৩.৩১
২০০৪-২০০৫	২০২৫.৭৮	১৪৩.৬৬	-১৮৮২.১২
২০০৫-২০০৬	১৮৬৮.০০	২৪১.৯৬	-১৬২৬.০৪
২০০৬-২০০৭	২২২৬.০৫	২৮৯.৪২	-১৯৩৬.৬৩

২০০৭-২০০৮	৩৩৮৩.৯৪	৩৫৮.০৮	-৩০২৫.৮৬
২০০৮-২০০৯	২৮৪৩.০০	২৭৬.৫৮	-২৫৬৬.৪২
২০০৯-২০১০	৩২১৩.৭০	৩০৪.৬৩	-২৯০৯.০৭
২০১০-২০১১	৪৫৬৯.২০	৫১২.৫১	-৪০৫৬.৬৯
২০১১-২০১২	৪৭৫৫.০০	৪৯৮.৪২	-৪২৫৬.৫৮
২০১২-২০১৩ (জুলাই-মে)	-	৫৩৬.০৯	-

Source : Export Promotion Bureau and Ministery of Commerce.[৬১]

দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বাণিজ্য ঘাটতির অবসান ঘটাতে দ্বৈতকর অবলুপ্তির বিজ্ঞপ্তি জারী করে উভয়দেশ ১৯৯৪ সালে। এবং ভারত ১৬টি বিষয় করমুক্ত করে দেয়। এ প্রসঙ্গে আরো বলা যায়— "To reduce the trade imbalance, Bangladesh wanted to get access to Indian market free from tariff, paratariff and other barriers but has not succeeded yet. Despite Bangladesh's Persistent demand, New Delhi has not allowed yet duty free access for 25 categories of items, which was a decision announced by prime minister Atal Behari Vajpayee during his tenure."[৬২] পরবর্তীকালে উভয়দেশের বাণিজ্য সচিব পর্যায়ে কথাবার্তা চলে Para tariff ও non tariff নিয়ে এবং তার ফল হলো ২০০৩ সালে মার্চ মাসে দিল্লীতে তৈরি হয় Joint working group এছাড়া বাংলাদেশ এই শুল্ক সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে তার থেকে বাধা তুলে নেওয়ার আবেদন জানায়। এছাড়া বাংলাদেশ দাবী করে যে ভারতের সঙ্গে নেপালের যেভাবে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে বাংলাদেশের সঙ্গে সেভাবে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হোক। ভারত তা এড়িয়ে যায়।

অন্যদিকে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘ সীমান্ত অঞ্চল হল দারিদ্র পীড়িত ফলে বেআইনি আমদানী-রপ্তানী হল নিত্যদিনের ঘটনা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাদেশ ৯৬% জিনিস বে-আইনিভাবে আমদানী করে, মূলতঃ খাদ্যদ্রব্য এবং গবাদী পশু যেটা ভারতের ক্ষেত্রে পাঁচভাগের তিনভাগ জিনিস রপ্তানিযোগ্য। আবার বাংলাদেশও বে-আইনিভাবে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম, মশলা, ইলিশ মাছ ও সিন্থেটিক দ্রব্য ভারতে রপ্তানী করে। যার ফলে সরকারী স্তরে সমস্যা থেকেই যায়। এছাড়া সীমান্তে মাদক ও অস্ত্র চোরাচালান, স্মাগলিং প্রভৃতি প্রতিনিয়ত বিদ্যমান তাই উভয় দেশের সমস্যা বেড়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের আরেকটি বড় সমস্যা হলো 'transit' বা যাতায়াতকে কেন্দ্র করে সমস্যা। বাংলাদেশ যদি ভারতের প্রস্তাবমতো মায়ানমার হতে সে দেশের মধ্যদিয়ে গ্যাস

পাইপলাইন ভারতের ভূখণ্ডে আনার অনুমতি প্রদান করে এবং ভারতের উত্তর-পূর্বের "Seven Sister States"গুলোর সাথে সরাসরি যোগাযোগের জন্য 'Transit' এর অনুমতি প্রদান করে তাহলে বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে।

ভারত চায় বাংলাদেশ তার উৎপাদিত গ্যাস ভারতকে রপ্তানী করুক। কিন্তু বাংলাদেশ ভারতের প্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া না দেওয়ায় ভারত সরকার বাংলাদেশের ওপর অনেকটাই অসন্তুষ্ট হয়েছে। তাই ২০০৭ সালের শেষ পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও সম্পদ বন্টনের সম্পর্কের গ্রাফটি ছিল নিম্নগামী।

ভারত এবং বাংলাদেশ এই দুই দেশই BIMSTEC ও SAARC নামক আঞ্চলিক সংস্থার সদস্য। তাই এদের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান এর পরিমাণ ক্রমবর্ধমান হওয়াটাই উচিত। এই সংস্থা দুটি যদি একসাথে দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি প্রক্রিয়া ও উন্নয়নে যৌথভাবে কাজ করে তাহলে এতে দুদেশই লাভবান হবে। এক্ষেত্রে ভারত যেহেতু দক্ষিণ এশিয়ার অভিভাবক রাষ্ট্র সেহেতু তাকেই সংহতির জন্য চেষ্টা করতে হবে। যদি ইউরোপীয় ইউনিয়নের মডেল অনুসরণ করে আঞ্চলিক সংহতিকে শক্তিশালী করতে পারে তাহলে এ অঞ্চলে পশ্চিমী শক্তির প্রভাব অনেকটাই হ্রাস পাবে। ভারত-বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরটিকে বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার করতে আগ্রহী। ১৯৯৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী BIMSTEC-এর সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে ঢাকায় বলেন, আঞ্চলিক সহযোগীতার সূত্র ধরে দুদেশের মধ্যে শক্তিক্ষেত্রে আদান প্রদান ও পারস্পরিক সহায়তা বাড়ানো দরকার।[৬৩] ভারত দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলের বৃহৎ এক রাষ্ট্র, তার প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রযুক্তিগত সম্পদ-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর বাণিজ্যিক প্রভাব ফেলতেই পারতো, কিন্তু ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ঘাটতি দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, তিস্তা জলচুক্তি পিছিয়ে যাওয়ায় শেখ হাসিনা আমাদের যে সমস্ত দাবী মঞ্জুর করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছেন, সেগুলি হল— (১) মূলতঃ চট্টগ্রাম সহ বাংলাদেশের অন্যান্য বন্দর ব্যবহার; (২) এই বন্দরগুলি থেকে এবং পর্যাপ্ত স্থলপথে যাতায়াতের রাস্তা; (৩) পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরাকে যুক্ত করতে করিডর; (৪) আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে গ্যাস সরবরাহ; (৫) ভারতীয় কোম্পানীগুলির বাংলাদেশে বিনিয়োগ এবং (৬) সর্বশেষে দু-দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। তবে ভারত বর্তমানে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধানিষেধগুলি বিলোপ করেছে এবং

সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। উভয় দেশের মধ্যে বাস চলাচল, রেল যোগাযোগ স্থাপন এবং ভারতীয় বিনিয়োগের মাধ্যমে বা অনুদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের বহু প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। উভয়দেশ ১৯৮২ সালে তৈরি করেছে Joint Economic Comission তার লক্ষ্য হল অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প পরিবহন ও টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং এর ষষ্ঠ বৈঠক ২০০৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও বলা যায় : 'India's Position on trade is not the position of a friendly nation. India has chosen to conduct its trade relations with Bangladesh in an unfriendly manner."[৬৪]

৪) **চাকমা সমস্যা :** ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অন্তরায় হিসাবে চাকমা সমস্যাকে অস্বীকার করা যায়না। ঐতিহাসিক দিক থেকে এই চাকমারা হলো একটি জনজাতি। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত রাঙ্গামাটি, খাগরাচেরী ও বন্দরবন জেলাকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল বা Chittagang Hill Tracts (CHT), অন্যদিকে ভৌগোলিক দিক থেকে এই অঞ্চল ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরাম সীমান্তে অবস্থিত। এই অঞ্চলে বসবাসকরী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরাই হলো চাকমা। যারা নৃকূলগতভাবে চীন ও তিব্বতের উত্তরাধিকারী মঙ্গোলয়েড শ্রেণীভুক্ত। এরা হলো চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মেচাঁ, তানছানগাঁ, খুঁসি, চক, মুরুং, রিয়াং, পানকু, মিজো, বনজুগি এবং বোঁস উপজাতি শ্রেণীভুক্ত আদিবাসী। তবে এদের মধ্যে ৮৫% হলো মারমা ও ত্রিপুরা উপজাতির মানুষ। এদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও নৃকূলগত সত্ত্বাকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠিত হওয়ার পর চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধি এদের অস্তিত্বের সংকটের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। এক্ষেত্রে চাকমা সমস্যা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে প্রাথমিকভাবে প্রভাবিত করলেও পরবর্তীকালে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে গঠিত হওয়ার আগে ব্রিটিশ আমল থেকেই চাকমারা উক্ত অঞ্চলের ওপর তাদের অধিকার বজায় রেখেছিল। পরবর্তীকালে পূর্ব-পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী 'রাজাকার' ও 'মুজাহিদ' গোষ্ঠীতে এই আদিবাসীদের ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধের সময়। কিন্তু বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর মৌলবাদী মুসলিমদের অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়ন তাদের সন্ত্রাসবাদীতে পরিণত করে। এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে দেখা যায় The reasons for the insurgency were therefore a combination of Ethno-Cultural factors, faulty nation-builiding strategies and inapproriate development projects.[৬৫] আরো বলা যায়— The real cause of the canflict was however, large scale settlement of Bengali

muslim population in the region, and the government policy of gradually evicting the Chakmas from the area, in order to exploit the agricultural lands, forest and water resources and possible oil resources.[৬৬]

এর সূত্রধরেই ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লামার নেতৃত্বে একটি দল শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কিছু দাবীকে কেন্দ্র করে। দাবীগুলি হল (১) চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের আইনসভাসহ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে; (২) ১৯০০ সালের নিয়মনীতি সমূহ বাংলাদেশের সংবিধানে সন্নিবদ্ধ করা; (৩) মূখ্য আদিবাসী কার্য্যালয়ের কাজকর্ম সচল রাখা; (৪) সংবিধানে এমন আইন রাখতে হবে যাতে অ-আদিবাসী মানুষের সমাগম উক্ত অঞ্চলে না ঘটে। এই সাক্ষাতের কিছুদিন পর বাংলাদেশের পুলিশ ও বায়ুসেনা চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের নিষ্পাপ গ্রামবাসীদের ওপর আক্রমণ সংঘটিত করে। মুজিবুর রহমান এই আন্দোলন দমানোর জন্য আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে 'অপারেশন ড্রাগন ড্রাইভ' ১৯৭৩ সালে নেন যার পরিণামে বহু চাকমা মারা যায়। ১৯৭৫ সালে মানবেন্দ্র নারায়ণ লামা আত্মগোপন করেন। এবং এইবছর মুজিবের হত্যার পর এম.এন লামা সহ উচ্চপর্যায়ের নেতারা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। তবে এইসময় ১৯৭২ সালে তৈরি হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (PCJSS) পরে যাকে 'শান্তিবাহিনী" হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে চাকমাদের এই অস্তিত্বরক্ষার আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যাকে দমন করাই উদ্দেশ্য ছিল মুজিবুর রহমানের। কিন্তু তারপর জিয়াউর রহমান চাকমাদের স্বায়ত্বশাসনের দাবী খারিজ করে দেন এবং উক্ত অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জোর দেন এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের আসন সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। কিন্তু চাকমাদের নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য পূর্ববর্তী শাসক মুজিবুর রহমান উক্ত অঞ্চলে তিনটি সেনা ছাউনি গড়েন কুমিল্লা, কাওয়াখালী ও ময়মনসিংহে। এছাড়া উক্ত অঞ্চলে মুসলিমদের ক্রমাগত আগমন এবং সৌদি আরবের আর্থিক সাহায্যে ইসলামীয় সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র তৈরি হয় রাঙামাটিতে যার ফলে আদিবাসীদের ধরে ধরে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরীকরণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। যেটা চাকমারা ভালোভাবে নেয়নি। কারণ তারা অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ। আদর্শগতভাবে সংখ্যালঘু বৌদ্ধদের উপর আক্রমণ হিসাবে তারা দেখতে শুরু করে যার ফল হলো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা।

১৯৭২ সালে যে PCJSS বা 'শান্তি বাহিনী' তৈরি হয়েছিল তারা তাদের কার্যকলাপের সুবিধার জন্য পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত হয়— যোদ্ধার দল, চিকিৎসার দল, উৎপাদন দল এবং যোগাযোগের

দল ও প্রযুক্তিগত দল এবং জেবি লামার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এবং তিনি তৈরি করেন 'আমাদের সমর সংহিতা' (Our Military Manual) যার তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি হলো— প্রথমতঃ স্থানীয় রক্ষীদের নিয়ে তৈরি করা হয় গেরিলা ইউনিট যারা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং মুখোমুখি আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে এবং যুদ্ধ প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে পিছিয়ে আসতে হবে। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীন এলাকার উন্নতি ঘটিয়ে দলীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তৃতীয়তঃ বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে এলাকা শত্রুমুক্ত করতে হবে এবং সম্ভব হলে সমসাময়িক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করতে হবে।[৬৭] এইভাবে মাওবাদী গেরিলা কায়দায় বাহিনীগঠন ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা তাদের পাহাড়, পর্বত ও জঙ্গল এলাকায় প্রাথমিকভাবে সফল করে তুলেছিল। এবং এই চাকমা সন্ত্রাসবাদীরা আক্রমণ করতো তাঁদের যারা উক্ত এলাকার উন্নয়নের জন্য নিযুক্ত এবং বিদেশী তেল কোম্পানীর কর্মীদের উপর। এ প্রসঙ্গে বলা যায় The Shanti Bahini (SB) was also fairly successfull in its terrorist tactics to collect taxes and extort money from businessman and transport owners.[৬৮] এরপর তারা ১৯৮৮ সালের ৪ই আগস্ট খাগরাচেরীতে ৩১ বেঙ্গল রেজিমেন্টের এর উপর আক্রমণ সংঘটিত করে। এইসময় মেজর জেনারেল আব্দুস সালাম বলেন যে চাকমা গেরিলারা সংগঠিত এবং তারা তাদের লক্ষ্যপূরণে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত। আরো বলেন It is also believed that the SB has sophisticated remote control device in its arsenal.[৬৯] এ পর্যন্ত আলোচিত হল চাকামাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম তাদের রাজনৈতিক দাবী ও সংগঠিত হওয়ার ইতিহাস।

এবার পর্যালোচনা করা প্রয়োজন ভারতের সঙ্গে চাকমাদের সম্পর্ক ও সমস্যার বিবরণ। চাকমারা PCJSS তৈরি করেছিল পাকিস্তান, বার্মা ও চীনের সঙ্গে এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেই। ফলতঃ মিজো এবং নাগা জঙ্গীদের সঙ্গে PCJSS বা SB-র যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং চীন ও পাকিস্তান থেকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ হতে থাকে যা 'শান্তি বাহিনীর' মূল হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হত। এই শান্তি বাহিনী বার্মাতে ট্রেনিং ক্যাম্পে ট্রেনিং নিতে শুরু করে। পরবর্তীকালে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ আসাম (ULFA) এবং শান্তিবাহিনী যৌথভাবে ট্রেনিং ক্যাম্প পরিচালনা করতে শুরু করে।[৭০] ১৯৭৪ সালে চাকমা বিদ্রোহীরা প্রথম ভারতীয় গোয়েন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঢাকাতে এবং সাহায্য ও সমর্থন চায়। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে মুজিব হত্যার পর বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে এবং চাকমাদের প্রতি ভারতের সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। কারণ প্রথমতঃ ঢাকাতে

যে নতুন সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রতি ভারতের উদ্বেগ শান্তিবাহিনীর (SB) প্রয়োজনীতাকে বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়তঃ ১৯৭৫-এর আগস্টের পর মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (MNF) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে (CHT)-তে ফিরে আসে যা ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণভাবে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় Indian Intelligence officials saw in the SB a powerful force capable of neutralising the anti-Indian insurgent group. In fact, Indias external intelligence agency, Research and Analysis Wing (RAW) used the SB to soften the hardcore Mizo guerrillas who refused to surrender even after laldenga signed accord with the government of India.[৭১] এরপর ১৯৭৫ সাল থেকে RAW বাংলাদেশী চাকমাদের বা SBকে অস্ত্রশস্ত্র সহযোগীতা করা ও ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে। দেরাদুনের কাছে চামরাতাতে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করে ভারত এবং বিস্ফোরক ও যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে। এইসময় ত্রিপুরাতে চাকমা সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে ওঠে যার সঙ্গে যুক্ত হয় একশোজন প্রশিক্ষিত ভারতীয় গেরিলারা যারা RAW-এর অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত। তাই স্বাভাবিকভাবে শান্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা বাংলাদেশের বিরোধীতাকে সক্রিয় করে তোলে। যা ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কে ছায়া ফেলতে থাকে।

১৯৭৭ সালে ভারতে ইন্দিরাগান্ধী সরকারের পতনের দরুন SB-র সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্তিমিত হয়ে যায়। যার ফলশ্রুতি হিসাবে শান্তিবাহিনীর গেরিলারা খানিকটা মনোবল হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ১৯৮০ সালের ইন্দিরা গান্ধীর সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে চাকমাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন চাকমা সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণ সহ অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করছে। ভারত তা অস্বীকার করে। এবং PCJSS-এর সভাপতি জে বি লামা বলেন যে বিদেশে চাকমা বিদ্রোহীদের বা SB-র কোন প্রশিক্ষণ শিবির নেই বা বিদেশীদের দ্বারা বাংলাদেশ পার্টি নিয়ন্ত্রিত নয়। পরবর্তীকালে ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ভারত সফরে আসেন। এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। এবং ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে সামরিক পর্যায়ে উভয়পক্ষ স্বাক্ষর করেন যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কোন জঙ্গী কার্যকলাপকে বৈধতা দেওয়া যাবে না ও উক্ত এলাকায় যাতে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ সংঘটিত না হয় উভয় দেশ সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। ১৯৮৬ সালের পর ভারত কার্যত চাকমাদের প্রতি তার সমর্থন হ্রাস করতে শুরু করে। পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে RAW বাস্তবিকক্ষেত্রে চাকমা শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানোর প্রশ্নে সমর্থন পুরোপুরিভাবে প্রত্যাহার করে। যা চাকমা

শরণার্থীরা খুব ভালো চোখে নেয়নি যার দরুন ভারতের উত্তর-পূর্বের জঙ্গী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলির নিশ্চিন্ত বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল (CHT)। অন্যদিকে উদ্বাস্তু প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের চাকমা সমস্যাকে কেন্দ্র করে আভ্যন্তরীণ রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এবং SBকে আটানোর জন্য পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের নিয়ে বাংলাদেশ সরকার তৈরি করে Hill Council for Resisting Terrorism'। অন্যদিকে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ও আধা-সামরিকবাহিনী পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালায়। বে-আইনী গ্রেপ্তার, লুঠ, ধর্ষণ, অত্যাচার এবং শারীরিক ও মানসিক হিংসাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়। যাকে বলা যায়— Both the security forces and the settlers often indulge in organised killing to silence the hills people.[৭২] যার ফলে চাকমা শরণার্থীরা ভারতে আশ্রয় পাওয়ার জন্য উদ্বাস্তু হিসাবে অনুপ্রবেশ করে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষের জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে যার ফলে চাকমারা উক্ত অঞ্চলে সংখ্যাগুরু বা সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। এটি নিম্নোক্ত টেবিলের মাধ্যমে উদ্ধৃত করা হল।

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসী ও অ-আদিবাসী মানুষের সংখ্যার ভারসাম্য

সাল	আদিবাসী জনগনের জনসংখ্যার হার %	অ-আদিবাসী জনগণের জনসংখ্যার হার—%
১৯৫১	৯১%	০৯%
১৯৭৪	৮৮%	১২%
১৯৮১	৬২%	৩৮%
১৯৯১	৫১.৫%	৪৮.৫%

Source : Imtiaz Ahmed- "Refugees and security: the experiece of Bangladesh" in S.D. Muni and Lokraj Baral (eds.) Refugges and Regional security in South Asia, Konark Publishers, New Delhi, 1996, p. 131.

এইরকম একটি পরিস্থিতিতে ১৯৬৩ সাল থেকে ভারতের মিজোরাম, মেঘলায় ও অরুণাচল প্রদেশে প্রায় ৬৪০০০ হাজার চাকমা উদ্বাস্তু শরণার্থী আশ্রয় নেয়। ১৯৮১ সালে দক্ষিণ ত্রিপুরাতে ক্রমাগত চাকমা শরণার্থীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে যার ফলে ভারতের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির উপর

চাপ বাড়তে শুরু করে। ১৯৮৬ সালে প্রায় ৫০,০০০ চাকমা শরণার্থী ত্রিপুরাতে শরণার্থী শিবিরে থাকতে শুরু করে। অন্যদিকে এই চাকমাদের সঙ্গে অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দাদের নৃকূলগত বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এক হওয়ার দরুণ তারা অধিক সংখ্যায় অরুণাচল প্রদেশে আগমন ঘটায় যেটা অরুণাচলের বাসিন্দাদের কাছে বাড়তি বোঝা বলে মনে হয়। তারা আসামের উদ্বাস্তু সমস্যার সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে। ফলতঃ অরুণাচল প্রদেশ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন দাবী জানায় উক্ত শরণার্থীদের নির্বাসন করার জন্য। এবং এই ছাত্র ইউনিয়ান সরাসরি শরণার্থীদের সঙ্গে দাঙ্গায় যুক্ত হয়। অন্যদিকে এই শরণার্থীরা ভারতের National Socialist Council of Nagaland (NSCN) এরসঙ্গে যুক্ত হয় অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের জন্য। উক্ত সময়ে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট তাদের জোরপূর্বক বাংলাদেশে পাঠানোর বিরোধীতা করে রায় প্রদান করে। এইভাবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে চাকমা সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

চাকমা সমস্যা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে অস্থির করে তোলায় বাংলাদেশ সরকার কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেগুলি হল এরশাদের সময় তিনি বাংলাদেশ জেলা কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব শান্তি বাহিনীকে বা PCJSSকে দেন কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হয় কারণ এই কাউন্সিলের কোন সাংবিধানিক বৈধতা বা স্বীকৃতি ছিল না। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে এরশাদ চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের (CHT) আদিবাসীদের জমির উপর অর্থনৈতিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করেন এছাড়া তাদের নৃকূলগত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সরকার চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য তৈরি করে Chittagong Hill Tracts Development Board (CHTDB) যার উদ্দেশ্য হলো উক্ত অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটানো। ১৯৭৯-১৯৯৫ সালের মধ্যে চাকমাদের উন্নয়নে বিশেষ প্রকল্পের জন্য ১.৪৯ বিলিয়ন টাকা খরচ করে। ১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৯০-৯১ পর্যন্ত বিশেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ২.৮ বিলিয়ান টাকা খরচ করে যার দরুন উক্ত এলাকার রাস্তা বা সড়ক যোগাযোগ, টেলি যোগাযোগ, বিদ্যুত সরবরাহ, পানীয় জল সরবরাহ, ঝুমিয়াদের পুনর্বাসনের পরিকাঠামো নির্মাণ সম্ভবপর হয়। ভারত থেকে যেসব চাকমা শরণার্থী বাংলাদেশে ফিরে এসেছিল তাদের জন্য ছয়মাসের রেশন প্রদান, দুটি মোষ ও ৮০০০ টাকা দেওয়া হয় এছাড়া তাদের ঘরবাড়ী নির্মাণ ও কৃষিকাজের জন্য ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত সরকার প্রদান করে। এবং ১৯৯৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেক দিন প্রায় ১ কোটি টাকা চাকমাদের উন্নয়নে ব্যয় করছিল।[৭৩]

তবে ১৯৮৭ সালে এরশাদ PCJSS-এর সঙ্গে সমঝোতায় আসার উদ্যোগ নিতে শুরু করেন। সেইসময় PCJSS যে দাবীপত্র এরশাদের কাছে পেশ করেছিল তা হল (১) চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের

স্বশাসন, (২) বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া আদিবাসীদের পুনর্বাসন (৩) আদিবাসী পুলিশ বাহিনীর প্রতিষ্ঠা (৪) চাকমাদের জন্মস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। যদিও এ সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। ১৯৯০ সালের পর খালেদা জিয়া সরকার PCJSS-এর সঙ্গে ৫ই নভেম্বর ১৯৯২, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯২, ২২শে মে ১৯৯৩ গোলটেবিল বৈঠক করে চাকমা সমস্যা সমাধানের জন্য। ১৯৯২ সালের ১০ই আগস্ট SB যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত পরবর্তীকালে ১৯৯৩-র ৩১শে মার্চ পর্যন্ত তা বর্ধিত হয়। এইসময় PCJSS নেতা জে বি লামা পাঁচটি দাবী সনদ খালেদা জিয়া সরকারের কাছে রাখে। বাংলাদেশ সরকার যেন চাকমা বন্দীদের মুক্তি, চাকমা প্রশাসন থেকে সৈন্য প্রত্যাহার, গ্রামে জোরপূর্বক আদিবাসীদের বিতাড়ন থেকে বিরত থাকা এবং অ-আদিবাসীদের CHT অঞ্চলে বসবাস বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[৭৪] বাংলাদেশ সরকার PCJSS এর মূল দাবীগুলির প্রতি কর্ণপাত না করায় এবং সপ্তম গোলটেবিল বৈঠকের পর ৫ই মে ১৯৯৪ সালে জে বি লামা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন বাংলাদেশের প্রতি এবং পুনর্বার বিদ্রোহ ঘোষণার ভীতি প্রদর্শন করেন। জে বি লামা বলেন যে শান্তি প্রক্রিয়া চলছিল তা ব্যর্থ এবং আরো বলেন— “We will return to armed struggle if the present government fails to guarantee our fundamental and democratic rights in the CHT... we want regional autonomy and a separate entity for tribal people in the CHT. We are fighting for the historically recognised rights of our home land.”[৭৫]

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এলে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৯৭ সালে এই দীর্ঘস্থায়ী চাকমা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং তৈরি করে National Committee on Chittagong Hill Tracts। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর National Committee on Chittagong Hill Tracts এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি (PCJSS)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ‘Peace Accord’ বা ‘শান্তিরক্ষা’র প্রস্তাব। বাংলাদেশ সরকারের সমক্ষে এই প্রস্তাব স্বাক্ষরিত হয় এবং সরকার প্রয়োজনীয় আইন পরিবর্তন করে Chittagang Hill Tract Regional Council বা চট্টগ্রাম পার্বত্য পরিষদ আঞ্চলিক কাউন্সিল তৈরি করে যার স্ব-শাসনের দায়িত্বশীলতা স্বীকৃতি পায়। স্বাভাবিকভাবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে চাকমা সমস্যার প্রভাব খানিকটা স্তিমিত হয়।

(৫) উদ্বাস্তু সমস্যা : ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক অন্যতম দিক নির্ধারণকারী সমস্যা হল উদ্বাস্তু বা অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে সমস্যা, ঐতিহ্যগতভাবে ভারতে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু আগমন ধারাবাহিকভাবে প্রমাণিত। এই

উদ্বাস্তু আগমন বা অনুপ্রবেশের পেছনে রয়েছে উভয় দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাতাবরণ তথা সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্ম ও বর্ণগত এবং ভাষাগত অভিন্নতা ও যোগ। তাই দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত অনুপ্রবেশকারী বা উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ভারতে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভীতির কারণ তথা উদ্বেগজনক। এ প্রসঙ্গে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এক জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলার রায় দিতে গিয়ে বলেছিল— ‘‘বাংলাদেশী উদ্বাস্তুরা ভারতীয় অর্থনীতি তথা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভীতির বা উদ্বেগের, এই সমস্যা যদি অতিসত্বর সমাধান না করা হয় তবে তা দেশের পক্ষে অধিকতর মন্দ অবস্থার সৃষ্টি হবে’’।[৭৬] ১৯৪৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা সামাজিক সচলতা ও স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করেছিল যার দরুন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতের উত্তরপূর্বসহ পশ্চিমবঙ্গে ক্রমাগত আগত উদ্বাস্তু জনস্রোত ভারতের রাজনীতিতে শরণার্থী হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। ১৯৭২ সালে ভারতের রাজ্যভিত্তিক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা প্রকাশ করলে তা বোঝা যায়।[৭৭]

পশ্চিমবঙ্গ— ৭৪,৯৩,৪৭৪

আসাম— ৩,১২,৭১৩

মেঘালয়— ৬,৬৭,৯৮৬

ত্রিপুরা—১৪,১৬,৪৯১

বিহার— ৮,৬৮১

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য ভারত উদ্বাস্তু শিবির বা কলোনী স্থাপন করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখন যখন তারা এদেশের মাটিকে ব্যবহার করে নিজ দেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কার্যকলাপে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভারত সবসময় এই বাংলাদেশ বিরোধী কার্যকলাপে বাধা দিয়ে এসেছে। তবে ১৯৭১-১৯৮১ সাল পর্যন্ত ভারতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১.৮ মিলিয়ান। যারা বাংলাদেশে অত্যাচারিত, নিপীড়িত হয়ে নিজভূমে পরবাসী হয়েছিল। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে ভারতে উদ্বাস্তু আগমনের কিছু কারণ উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যার দরুন বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই সময় যারা ভারতে এসেছিল তারা ছিল অত্যন্ত দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত মূলতঃ জমিহীন শ্রমিক, ছোট কৃষক, মুচি, তাঁতি, মেথর, জেলে—এরা বাংলাদেশে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যার দরুন ভারত এদের রাজনৈতিক উদ্বাস্তু হিসাবে বিবেচনা করে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে কাপতাই জলাধার নির্মাণের সময় বহু চাকমা ভারতে অনুপ্রবেশ

করে উদ্বাস্তু হিসাবে। মূলতঃ মেঘালয় ও ত্রিপুরাতে তারা ঘাঁটি গাড়ে যার ফলে ভারতের উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির উপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পায় এবং এটি ভারত- বাংলাদেশ সম্পর্কে যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। বাংলাদেশের ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক অবস্থা ও ভারতে উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশের অন্যতম কারণ। বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর যে ক্রমান্বয়ে চাপ তা তাদের জনগণের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অনেকসময় বাধা হিসাবে দেখা দিয়েছে। যার দরুন তারা ভারতে বে-আইনিভাবে অনুপ্রবেশ করে এখানে রাজমিস্ত্রী, কারখানার শ্রমিক, কারিগর, রিক্সাচালক, গৃহস্থালীর কাজকর্ম কম পারিশ্রমিকে করতে শুরু করে। এরা মূলতঃ ভারতের উত্তরপূর্ব তথা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মহারাষ্ট্র, নয়া-দিল্লী ও পাঞ্জাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়— It is estimated that there are nearly 15 million Bangladeshi entrants in India who have crossed over the borders with out any visa or passport and hence, are illegal migrants.[৭৮] প্রকৃতপক্ষে ২০০ টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশী নাগরিকরা জাল বা নকল পাসপোর্ট সংগ্রহ করে এবং সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করে। ভারতে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যগুলির রাজনৈতিক দলগুলি মূলতঃ শাসকদল গুলি তাদের ভোটের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য রেশন কার্ড ও ভোটার পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা করে ফলে উদ্বাস্তু বা অনুপ্রবেশকারীরা রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বা বৈধতা পায় যা ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম। মহারাষ্ট্র সরকার এই উদ্বাস্তুদের চিহ্নিত করে ফেরৎ পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিল কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। ফলতঃ ভারতের সমাজ-অর্থনীতি ও রাজনীতিতে এর প্রভাব পড়তে বাধ্য যা দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের উদ্বাস্তু বা অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে প্রবেশ করলে তা সুদুরপ্রসারীভাবে ভারতীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। এপ্রসঙ্গে আলোচনা করলে দেখা যায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অবেগ অনুভূতিকে কেন্দ্র করে তাই বাংলাদেশের নাগরিকরা তাদের স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিকরা ভারতে অনুপ্রবেশ করে মসজিদ বা মাদ্রাসাগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছে। যার ফলে তৈরি হচ্ছে— The fear of dominance by the increasing number of immigrants creates social tension often leading to sons of the soil movement, also presure on existing resouces, infrastucture, employment, increases economic insecurity of the local population.[৭৯] আরো

বলা যায় যে ভারতের আসামে ১৯৭১ সালের আগে দুটি জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল কিন্তু ১৯৮১ সালে চারটি জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে ফলে এই থেকে বোঝা যায় যে অনুপ্রবেশ কি মাত্রায় পৌঁচেছিল। ফলে All Assam Students Union উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে ১৯৮০ সালে আন্দোলন শুরু করে। ত্রিপুরাতে অনুপ্রবেশের মাত্রাও সমানভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৭৭ সালে জনসংখ্যা ছিল ১৫,৫৬,৩৪২ জন ১৯৮১ সালের জনগণনায় তা দাঁড়ায় ২০,৫৩,০৫৮ জন এবং শেষ দশকে বিদেশী উদ্বাস্তু প্রায় ২০০০০০ জন ত্রিপুরাতে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরার আদিবাসীদের নৃকুলগত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে ভারতের সংবিধানের পঞ্চম তফসিল মেনে ১৯৮৫ সালে তৈরি করা হয় Autonomous District Councils (ADCS)। এক্ষেত্রে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা ত্রিপুরার আদিবাসীদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করেছিল এবং তাদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন ও হিংসা চালাচ্ছিল। যার দরুন তৈরি হয় The Tripura National Volunteer Force যারা বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে এবং ভারতে অনুপ্রবেশের প্রতিবাদ করে বলে যে, এইসব বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের ভারতে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাংলাদেশী উদ্বাস্তুরা বসবাস শুরু করে তারা কম পারিশ্রমিকে কৃষিকাজে যুক্ত হয় এবং স্থায়ী মানুষের কাজের পরিবেশকে বিঘ্নিত করে যা ভারতের কাছে সামাজিক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া এই উদ্বাস্তুরা সীমান্তে বিভিন্ন অপরাধ, চোরাচালন, অস্ত্র ও মাদকপাচার প্রভৃতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকে। ULFA, NSCN এদের সঙ্গে এই অনুপ্রবেশকারীদের যোগ প্রাথমিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে ১৯৯৮ সালে আসামের রাজ্যপাল যে রিপোর্ট তৈরি করেন তাতে পশ্চিমবঙ্গে ৫.৪ মিলিয়ন, আসামে ৪ মিলিয়ান এবং ত্রিপুরাতে ০.৮ মিলিয়ান বাংলাদেশী উদ্বাস্তু রয়েছে এছাড়া বিহার, মহারাষ্ট্র, দিল্লী ও রাজস্থানে রয়েছে।

ভারত সরকার এই বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের আটকানোর জন্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল। ১৯৮৫ সালে আসামে AASU ভারত সরকার ও আসাম সরকারের সঙ্গে 'Memorandum of Settlement' স্বাক্ষর করে বাংলাদেশীদের চিহ্নিত করার জন্য। পরে তৈরি হয় 'Illegal Migrant Determinant Tribunal' (IMDT) যা সফল হয়নি। ১৯৮৭ সালে ৩২০০ কিমি সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া শুরু হয়। ১৯৯৬ সালে দেখা যায় ১৪৬৫.৮৭ কিমি রাস্তা এবং ৮৯৬ কিমি কাঁটাতারের বেড়া সম্পূর্ণ হয়েছে যার খরচ ৫৩১.২৮ কোটি টাকা।[৮০] এ প্রসঙ্গে বলা যায় ১৯৯২ সালে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর সাইকিয়া প্রথম বাংলাদেশীদের ফেরৎ পাঠানোর জন্য 'পুশব্যাক' ধারণার সূত্রপাত ঘটান।

পরবর্তীকালে ২০০৩ সালে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানীর উদ্যোগে প্রথম মুম্বাই থেকে এবং পরে ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের বিতাড়নের অভিযান বা ফেরৎ পাঠানোর জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। আরো বলা যায় L K Advani, announced the deportion of some three million Bangladeshis who were staying illegally in India. ঢাকা নয়াদিল্লীর এই পদক্ষেপ বা প্রতিক্রিয়ায় আপত্তি জানিয়েছিল। তা সত্ত্বেও ভারতের BSF বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন সময় ফেরৎ পাঠানোর চেষ্টা করে অন্যদিকে BDR তা রুখে দেওয়ার চেষ্টা করে।

তাই ভারত সরকার কূটনৈতিকভাবে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করতে তৎপর হয়ে ওঠে। এবং অন্যদিকে বাংলাদেশ তার ভারত-বিরোধীতাকে জিইয়ে রেখেছিল তার মাটি থেকে। কিন্তু উভয়পক্ষ এই সমস্যার সমাধানে তৈরি করে Joint working Group যাদের কাজ হলো সীমান্ত ব্যবস্থাপনা। এক্ষেত্রে BSF ও BDR ছয়মাস অন্তর মিটিং করবে সীমান্ত সমস্যা নিরসনের জন্য। যদিও চাকমা শরণার্থীরা বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছিল বোঝাপড়ার মাধ্যমে।

যাইহোক ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি জ্বলন্ত ক্রমান্বয়ী সমস্যা উদ্বাস্তু সমস্যা একে কোন অবস্থাতেই বন্ধ করা যাবে না, তার পেছনে কিছু কারণ বিদ্যমান। **প্রথমতঃ** ইন্দো-পাক সীমান্তে কাঁটাতারের যে বেড়া দেওয়া হয়েছে সেখানে বিদ্যুৎ সররবরাহ হয়। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়াতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব নয় কারণ সাধারণ মানুষের বিদ্যুতের চাহিদার পরিমাণ অনেক বেশী। **দ্বিতীয়তঃ** ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত জল, স্থল, জঙ্গল, দ্বারা পরিবৃত বলে জলে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব নয়। **তৃতীয়তঃ** উদ্বাস্তু বা অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে সীমান্তে BSF আধিকারিক, শুল্ক আধিকারিক ও স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ ও টাকার বিনিময়ে অনুপ্রবেশ করতে এবং স্মাগলিং ও সীমান্ত সন্ত্রাসের বা অপরাধের পক্ষে অনুকূল। **চতুর্থতঃ** স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগীতায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্তের ১০ কিমি এর মধ্যে চাষাবাদ করে আবার পুনরায় ফিরে যায় ফলে তাদের চিহ্নিত করা সহজসাপেক্ষ নয়। এছাড়া উভয়দেশের শাসকদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সদিচ্ছার অভাব এর কারণ। তবে সীমান্ত বাণিজ্যের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি করা যায় তাহলে চোরাচালান বন্ধ হয়ে দ্বি-পাক্ষিক অর্থনৈতিক ঐক্য সূচিত হবে ফলে উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশ স্তিমিত হবে।

(৬) সন্ত্রাসবাদকে কেন্দ্র করে সমস্যা : ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল সন্ত্রাসবাদের আতুঁরঘর ও তার বিস্তার ও পরিচালনার বিষয়সমূহ। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে

বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদের ভিত্তিভূমি হিসাবে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে ভারতের অভিযোগ অনুযায়ী বাংলাদেশ ইসলামিক মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বাংলাদেশে একদিকে ভারত বিরোধী ইসলামিক মৌলবাদী গোষ্ঠী অন্যদিকে পাকিস্তানমুখী বিদেশনীতি ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি করতে তৎপর ও সক্রিয়। মুজিব হত্যার পর মুজিব অনুগামীরা ভারতপন্থী নীতি অনুসরণ করলেও তার পরবর্তী অনেকেই ভারত বিদ্বেষীনীতি অনুসরণ করায় ভারত-বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে সক্রিয় বা ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশ কখনওই ভারতকে তার বিশ্বাসযোগ্য প্রতিবেশী হিসাবে ভাবেনি। ধর্মীয় অভিন্নতার কারণে ভারত-বিদ্বেষী পাকিস্তানই ছিল তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত যেই ক্ষমতা অলিন্দে বিরাজ করত বাংলাদেশ বরাবরই চীন, আমেরিকা ও পাকিস্তানের মদতে তার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করতো, এমনকী এখনো তা করছে।

প্রকৃতপক্ষে এই সন্ত্রাসবাদের পিছনে কয়েকটি কারণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ বাংলাদেশে ভারতের আধিপত্য বিরোধী ইসলামী মৌলবাদী গোষ্ঠীর ভারত-বিরোধী অবস্থানকে কেন্দ্র করে জঙ্গী ভারত বিরোধীতা।

দ্বিতীয়তঃ, বাংলাদেশে পাকিস্তানের ‘Inter Service Intelligence’ বা ISI এবং আলকায়দা সহ ইসালামী দুনিয়ার অন্যান্য জঙ্গী গোষ্ঠীগুলির প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি। তৃতীয়তঃ ভারতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সাতটি রাজ্যের (Seven Sister States) বিচ্ছিন্নতাবাদী, চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী জঙ্গী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ISI ও আলকায়দা সহ অন্যান্য জঙ্গীগোষ্ঠীর কাছ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য ও যোগাযোগ বৃদ্ধি। এছাড়া বাংলাদেশের মাটিতে প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষণ নিয়ে ভারত-বিরোধী জঙ্গী কার্যকলাপ সংঘটিত করা। এগুলিই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে সন্ত্রাসবাদী সমস্যার মূল কারণ।

এবার বিশ্লেষণ প্রয়োজন ধারাবাহিক ঘটনাবলী ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের গতিবিধি কিভাবে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। ভারতের দাবী বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত ভারতের উত্তরপূর্বের জঙ্গী বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন করে। সেই অনুযায়ী বাংলাদেশে ৯৯টি ভারত-বিরোধী জঙ্গী শিবির রয়েছে এবং ৮৮ জন উগ্রপন্থী নেতাকে বাংলাদেশ আশ্রয় প্রদান করেছে। এবং উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা অভিযোগ করে যে বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারত-বিরোধী জঙ্গী কার্যকলাপ পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন যে— ‘‘বাংলাদেশ

কোনভাবেই অন্যকোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জঙ্গী কার্যকলাপকে সহযোগীতা করতে পারেনা।"[৮১] ১৯৬৮ সালে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টকে ভারত সরকার অবৈধ ঘোষণা করায় তারা চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে ULFA ও PCJSS-এর সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে এবং CHT অঞ্চলে গিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির খোলে। যার দরুন ১৯৮৯ সালে ULFA ভারতে জঙ্গী কার্যকলাপ চালানোর জন্য বাংলাদেশের মাটিতে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এবং এই ULFA জঙ্গীরা অনুপ্রবেশের জন্য আসাম সীমান্তে কাছাড় ও বরাক উপত্যকাকে কাজে লাগায়, যার দরুন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ঢোকা এবং বেরোন সহজ হয়ে দাঁড়ায়। ভারত 'অপারেশন রাইনো' সংঘটিত করার পর ১৯৯১ সালে এই অভিযান সফল হয় এবং ৪২১৯ জন আলফা কর্মী গ্রেপ্তার হয়, ১০২৩ টি অস্ত্র ও ৬৫.৮৬ লাখ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরফলে ১৯৯২ সালের ২২শে জুলাই ULFA নেতারা ঢাকায় যে সাধারণ পরিষদ এর বৈঠক করে তাতে স্বীকার করে যে এরফলে তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে এবং তাদের পায়ের তলায় মাটি সরে গিয়েছে। পরবর্তীকালে তারা সিলেটের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলি থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধসামগ্রী সংগ্রহ করতে শুরু করে। এছাড়া বাংলাদেশে আলাফা প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে ওঠে নতুনভাবে যেখানে থাইল্যান্ড, মায়ানমার, রোমানিয়া, কাম্বোডিয়া থেকে অস্ত্র ব্যবসায়ীরা এসে আলফা নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং অস্ত্র সরবরাহ শুরু করে। এই অস্ত্র সরবরাহ বা বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রামের নিকট কক্সবাজার এলাকা। এই কক্সবাজার হল বিদেশী অস্ত্র ও যুদ্ধ সামগ্রী সরবরাহের transit point যেখানে NSCN জঙ্গীরাও অস্ত্র আমদানী করতো ফলে ULFA ও NSCN-এর মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই জঙ্গী কার্যকলাপে ISI এর ভূমিকা সম্পর্কে বলা যায়— The Inter Services Intelligence (ISI) of Pakistan uses the Madrasas and Mosques in Sylhet or Cacher areas for Providing money to the ULFA and the Muslim institutes in Coxbazar and Sylhet are misused for supplying arms Coming form Thailand and Myanmar.[৮২] বাংলাদেশ সরকার উক্ত কার্যকলাপ বন্ধে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও শেষপর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। বাংলাদেশ ছাড়াও ULFAর আটটি ক্যাম্প ভুটানে ছিল এবং মায়ানমার থেকেও আলফার কার্যকলাপ পরিচালিত হতো। এই দেশগুলি থেকেও অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান ঘটতো উক্ত জঙ্গী গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে।

তবে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ দলের শেখ হাসিনার সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে উভয় দেশ অঙ্গীকারবদ্ধ হয় যে কেউ কোন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে প্রশ্রয় দেবে না। সেই অনুযায়ী ১৯৯৭ সালে আলফা নেতা অনুপ চেটিয়াকে বাংলাদেশ গ্রেপ্তার করে এবং ছয় বছরের জন্য তার জেল হয়।

এই ছয় বছরের মধ্যে ভারত সরকার— বাংলাদেশ, মায়ানমার, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের জন্য বহুবার বৈঠক করে। কিন্তু তার ফল শূন্যতে গিয়ে ঠেকে। ১৯৯৯ সালে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন যে সীমান্তে দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বাংলাদেশের ক্যাম্প থেকে তারা ভারতে নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালাচ্ছে। ২০০০ সালে শেখ হাসিনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহঃ নাসিম স্বীকার করেন যে একটি গুপ্তচর সংস্থার সহযোগীতা নিয়ে ভারতের জঙ্গীরা বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে।[৮৩] ২০০১ সালে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যে— বর্তমানে বাংলাদেশে ভারতের যে জঙ্গী গোষ্ঠীগুলির ক্যাম্প আছে তারা হল— ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা (NLFT), ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ আসাম (ULFA), ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অফ বোড়োল্যান্ড (NDFB)। এছাড়া এইবছর নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের খাগরাচেরী অঞ্চলে NLFT-র ১২ জন সদস্য বাংলাদেশের হাতে ধরা পড়ে। এবং বোঝা যায় যে এইসব জঙ্গীগোষ্ঠীগুলি চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে সন্ত্রাস পরিচালনা করছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষরা তৈরি করেছিল কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (KLO) যারা বাংলাদেশী ছিটমহলে প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তোলে এবং ভারতের উত্তর-পূর্বের জঙ্গীগোষ্ঠী সহ ISI-এর সঙ্গে গভীর যোগাযোগ বজায় রেখে সন্ত্রাস পরিচালনা করে। এ প্রসঙ্গে ২০০১ সালে ভারতের সাবেক উপ প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী আগরতলায় এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে বলেন যে, বাংলাদেশে ISI ও আলকায়দার তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারফলে ভারতের সাতটি রাজ্যে প্রায় ১৪টি জঙ্গী গোষ্ঠী তাদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি করেছে। এরা হোল মণিপুরে— PLA, UNLF, PRPK এবং MLF; আসামে- ULFA, NDFB; নাগাল্যান্ডে— NSCN (ইশাক মুইভা) NSCN (K); ত্রিপুরার- ATTF এবং NLFT; মেঘালয়ে ANVC এবং HNLC জঙ্গী গোষ্ঠী। যারা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ তথা ISI এর সাহায্যে কার্যপরিচালনা করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে উভয় দেশ ২০০৪ সালে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে যে তালিকা প্রকাশ করে তাতে— ভারত যে তালিকা দেয় সেখানে ১৯৪টি জঙ্গী শিবির বাংলাদেশের মাটিতে রয়েছে যারা ভারত বিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে, অন্যদিকে বাংলাদেশ ৩৯টি জঙ্গী শিবিরের তালিকা দেয়।[৮৪] ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের বিদেশমন্ত্রী নটবর সিং বাংলাদেশ সফরে গিয়ে বলেন যে— ভারতের সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক সমস্যাবহুল, যেখানে সমাধানের প্রত্যাশা নেই বললেই চলে। ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে ভারতের প্রতিরক্ষা দপ্তর ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (BSF) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত ৯৯টি ক্যাম্প চিহ্নিত করেছে। তবে ভারতের গোয়েন্দা দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে ভারত-বিরোধী জঙ্গী ক্যাম্প-এর সংখ্যা ১৪৪টি।[৮৫]

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে কৌশলগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদ একটি বড় বাধা বা সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের ইসলামী মৌলবাদ, ধর্মীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষাসহ বিশৃঙ্খলা, মুসলীম জঙ্গীদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক জঙ্গী গোষ্ঠীর যোগাযোগ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করে চলেছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়— Efforts have also been made by Indian Commentators to see Bangaldesh as a 'Cocoon of terror' disrupted and dyfunctional state of Bangladesh is set to become a monolith Islamic state and a breeding ground of Islamic terror will be in calculably disastrous for India and the rest of the south Asian Region.[৮৬] আরো বলা যায়, Diplomatic sources said India wanted the military backed interim government to dismantle the Islamic Religious schools near the joint border in Bangladesh become they were allegedly Providing training facilities to Indian Insurgency groups. Bangladesh denied the presence of such facilities but agreed to monitor the activities of madrasas Closely.[৮৭] এইভাবে বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদীদের বিচরণভূমিতে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে অনুপ চেটিয়াকে হস্তান্তর, পরেশ বরুয়াকে গ্রেপ্তার করা ও বন্দী প্রত্যর্পণকে কেন্দ্র করে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তবে বর্তমানে উভয় দেশ বন্দী প্রত্যর্পণ ও সন্ত্রাস দমনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

(৭) নারী, শিশু ও মাদক চোরাচালানকে কেন্দ্র করে সমস্যা : নারী, শিশু ও মাদক দ্রব্যের চোরাচালান, ভারত-বিদ্বেষী প্রচারণা ও ক্রমবর্ধমান মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য ভারত তার নিকট প্রতিবেশীর প্রতি খুবই সন্দিহান। থাইল্যান্ড থেকে ভায়া মায়ানমার হয়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ মাদক দ্রব্যের আমদানী ঘটে। আবার বাংলাদেশ থেকে ভারতের মধ্যে দিয়ে এই মাদক দ্রব্য মধ্যপ্রাচ্যে পাচার হয়। ভারতের বারংবার অভিযোগ সত্ত্বেও বাংলাদেশ এবিষয়ে খুব ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের (CHT) ১৭২ কিমি অংশজুড়ে রয়েছে ভারত ও মায়ানমার সীমান্তবর্তী এলাকা। তাই স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের এই এলাকা আন্তর্জাতিক অস্ত্র ও মাদক চোরাচালানের রমরমা কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার জেটিতে বাংলাদেশ পুলিশ, সৈন্যবাহিনী ও নৌসেনার যৌথ অভিযানে ১.৮ মিলিয়ন রাউন্ড যুদ্ধ সামগ্রী, ১৭৯০ ধরনের অস্ত্র, ২৭,০২০ টি গ্রেনেড এবং ১৫০ টি রকেট লঞ্চার, ৮৪০ টি রকেট, ১০০টি রাইফেল, ১০০টি টমি বন্দুক এবং একে-৪৭ রাইফেল বাজেয়াপ্ত হয়। এছাড়া ২০০৩ সালে ২৭সে জুন জঙ্গীদের সঙ্গে লড়াই করে বোগরা অঞ্চলে ১০০,০০০ বুলেট বা গুলি এবং ২০০ কি.গ্রা. বিস্ফোরক উদ্ধার

হয়।[৮৮] সাউথ এশিয়া মিডিয়া নেট এর মতে এই অস্ত্র চোরাচালানের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় নারী ও শিশুদের এবং এরা আক্রমণের মুখে সবচেয়ে বেশী প্রাণ হারায়। ২০০১ সালে বাংলাদেশে অস্ত্র চোরাচালান কারবারে ৩১০৫ জন মৃত্যুবরণ করে যার মধ্যে ১৫০০জন অস্ত্রসহ মারা যায় এবং এদের মধ্যে দশ শতাংশ ১৮ বছরের উপর মহিলা ও আরো দশ শতাংশ ১৮ বছরের নীচে কিশোরী ও শিশু। এইভাবে অবৈধ ও বে-আইনি অস্ত্র কারবার বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যাকে জিইয়ে রাখে।

বাংলাদেশে অবৈধ অস্ত্র চোরাচালানের জন্য সীমান্ত এলাকা, সমুদ্র বন্দর ও বিমান বন্দরগুলির নমনীয় তল্লাসী ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণভাবে দায়ী। জাপান এবং কোরিয়া থেকে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম সমূহ ভারতে প্রবেশ করে বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে সেইহেতু ছোট ছোট অস্ত্রশস্ত্র ও এইপথে ভারতে আসে যা ভারত ও বাংলাদেশের অস্ত্র ব্যবসায়ীদের একটি অলিখিত চুক্তি বলা যায়। ভারতের উত্তরপূর্বের জঙ্গী গোষ্ঠীগুলির ক্রমাগত অস্ত্রের ও যুদ্ধসামগ্রীর প্রয়োজন বাংলাদেশকে ব্যবহার করে তারা তাদের প্রয়োজন মেটায়। তাই বাংলাদেশে প্রায় ১০০০ বে-আইনী অস্ত্র কারখানার খোঁজ মেলে এবং এগুলি বিদেশী সরঞ্জামে সমৃদ্ধ পুলিশের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১১০০০ অস্ত্র, ৫০০ অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম এবং ৫০০০ রাউন্ড গুলি এই কারখানা থেকে শেষ সাতবছরে পাওয়া গিয়েছে। মূলতঃ ঢাকা বিমানবন্দর এবং চট্টগ্রাম ও খুলনা সমুদ্রবন্দর অস্ত্র চোরাচালানের transit বা বহন পথ হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসাবে ভারত ও বাংলাদেশে বেকারী, দারিদ্র, যুবমনে হতাশা-বঞ্চনা সংঘটিত অপরাধ প্রবণতাকে বৃদ্ধি করছে। যার দরুন অস্ত্রের প্রয়োজন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আবার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা মাদক পাচারে বা স্মাগলিং এর কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়। চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা দিয়ে ভারতের উত্তরপূর্বে মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত এলাকা মারফৎ দিল্লীও মুম্বাইতে বে-আইনী মাদক প্রবাহ অব্যাহত। বাংলাদেশ থেকে তাজাকিস্তান হলো মাদক চোরাচালানের পথ এবং আফগানিস্তান থেকে বিশ্বের ৭৭% মাদক বা আফিং পাচার হয় বিদেশে। ২০০০-২০০৩ সাল পর্যন্ত ৩২টন মাদকের অর্ধেক হেরোইন বাংলাদেশে পাচার হয়ে আসে। ভারতের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের ময়মনসিংহ এলাকাতে প্রায় ১০০টি ফেন্সিডিল সিরাপ কারখানা গড়ে উঠেছে যা বাংলাদেশে পাচার করা হয় মাদকাসক্তদের জন্য। এবং এই সিরাপ পাচারের জন্য নারী ও শিশুদের ব্যবহার করা হয়। ঢাকায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় ক্রীড়াঙ্গন এর পাশে মুকারাম মসজিদ এলাকাতে এই ফেন্সিডিল সিরাপের বড় বাজার যার জন্য মতিঝিল থানার পুলিশকে মাসে

৫০০০ টাকা উৎকোচ হিসাবে দিতে হয় ব্যবসায়ীদের। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে এই সিরাপ বাংলাদেশে পাচার হয় এবং বাংলাদেশের যুবসমাজ এই মাদকের দ্বারা আসক্ত। অন্যদিকে ভারতে এই মাদক চোরাচালানের কাজে প্রায় ২৫,০০০ জন যুক্ত।[৮৯] সমসাময়িকভাবে বাংলাদেশের বহু জায়গায় এই ফেন্সিডিল তৈরির নকল কারখানা গড়ে উঠেছে যা বাংলাদেশকে ভয়ঙ্করভাবে মাদক চোরাচালানের পথে ঠেলে দিচ্ছে।

এবার নারী ও শিশু পাচারের ক্ষেত্রে ভারত এবং বাংলাদেশ উভয়েই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র পীড়িত রাষ্ট্র হিসাবে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েই নারী ও শিশুপাচারের সম্মুখীন। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় মূলতঃ বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, থাইল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি ভারতের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের ও আরবের দেশগুলিতে নারী ও শিশুপাচারের ভিত্তিভূমি হিসাবে পরিচিত। মূলতঃ নারীদের দেহব্যবাসা ও বে-আইনী, অবৈধ কার্যকলাপে লাগানো এবং শিশুদের উটদৌড়, খনিশ্রমিক ও মাদক চোরাচালানের কাজে ব্যবহার করা হয়। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়— The issue of trafficking of women and Children from Bangladesh in different parts of Asia, though the land border has been another in Indo-Bangladesh relations. According to one source, every year more than 15,000 women and Children are trafficked out of Bangladesh, whereas, over 50 women and children are trafficked out of Bangladesh through land border areas every day.[৯০] এইভাবে প্রতিদিন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নারী ও শিশু পাচার ভয়াবহ হয়ে উঠেছে যার দরুন SAARC এবং UNO উভয়েই এই সমস্যার নিরসনে তৎপর। আরো এ প্রসঙ্গে বলা যায় বাংলাদেশের জনগণের দারিদ্র্য সামাজিক অসাম্য ও লিঙ্গ বৈষম্য, অশিক্ষা, সচেতনতার অভাবের দরুন আন্তর্জাতিক পাচার চক্র শিশু ও নারীদের উন্নত জীবনযাপনের লোভ দেখানো, কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফুঁসলিয়ে নিয়ে আসে এবং পরে তাদের উপর যৌন শোষণ, দেহব্যবসায় বাধ্য করা, গৃহবন্দী করে শ্রম করতে বাধ্য করা ও নানা অত্যাচার শুরু হয়। UNICEF-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিমাসে ৪০০ শিশু ও নারী পাচারের স্বীকার হয়। অন্য একটি গবেষণাতে দেখা গেছে যে ১২-৩০ বছরের মধ্যে প্রায় ৩০০০০০ বাংলাদেশী শিশু ও নারী শেষ দশ বছরে ভারতে পাচার হয়ে এসেছে। এবং প্রায় ২০০,০০০ যুবতী পাকিস্তানে বিক্রি হয়েছে।[৯১] এইভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারত, পকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে নারী ও শিশু পাচার নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে যা দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কে একটি ভয়াবহ সমস্যা।

৮) অন্যান্য সমস্যা : ভারত-বাংলাদেশ দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানান দিক থেকে বিরোধ থাকলেও বন্ধুত্ব ও সম্ভাবনাময় দিকগুলোও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। উভয়দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মারাত্মক সমস্যা ও নেতৃবর্গের দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যের কারণে সহযোগীতার ক্ষেত্রসমূহ সঠিকভাবে বিকশিত হয়নি। কিন্তু কেবলমাত্র মার্জিত ও সহনশীল নীতি প্রনয়নের মধ্যদিয়ে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে আরো উন্নত করা যেতে পারে। তাই অন্যান্য সমস্যাগুলির প্রতিও দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ যদি ভারতের প্রস্তাবমত মায়ানমার হতে সে দেশের মধ্যদিয়ে গ্যাস পাইপলাইন ভারতের ভূ-খণ্ডে আনার অনুমতি প্রদান করে এবং উত্তর পূর্বভারতের “Seven Siter States” গুলোর সাথে সরাসরি যোগাযোগের জন্য ‘transit’ বা বহনের অনুমতি প্রদান করে তাহলে সম্পর্কের— উন্নয়ন ঘটতে পারে। ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্য রয়েছে এগুলো বাংলাদেশের মূলভূমি দ্বারা আবৃত ভারত থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন। এই সাতটি রাজ্য হলো ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশ। এই রাজ্যগুলিতে একদিকে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে এবং সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এ সকল সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এইরকম অবস্থায় বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন করার জন্য দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত-বাংলাদেশের ওপর দিয়ে এই সাতটি রাজ্য বাSeven Siters State এ যাওয়ার একটি transit দাবী করছে দীর্ঘদিন ধরে। এই সমস্যা বাংলাদেশ খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে। এছাড়া অন্যদিকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ও ভারতের হলদিয়া বন্দর, পারাদ্বীপ বন্দর প্রভৃতি বন্দরগুলো যদি একদেশ অপর দেশের জন্য উন্মুক্ত করে দেয় তাহলে দ্বি-পাক্ষিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ভারত ব্যবহার করতে আগ্রহী। কারণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি থেকে সমুদ্রপথে পণ্য ঐ সকল বন্দরে এলে সেখান থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আনা খুবই সহজসাধ্য হবে। এতে ভারতের পূবে তাকাও নীতির বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত তিস্তার জলবন্টন ও স্থল সীমান্ত চুক্তির জন্য ভারতের উপর নির্ভরশীল। ভারতের কেন্দ্র-রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এই চুক্তি রূপায়ন বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ফলতঃ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ আরো চায় ভিসা আইনের পরিবর্তন যা ভারত খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে। টিপাইমুখ জলাধার নির্মাণকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অভিযোগ ভারত বিবেচনা করবে আশ্বাস দিয়েছে; পরিবেশগত সমস্যা ও দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে চলেছে।

তথ্যসূত্র

১. Saha Rekha- 'India-Bangladesh Relations" (Chapter-1), Minerva Associates, Kolkata, 2000, P. 05.

২. Chawla Sudarshan— "South Asia: Security and Stability under Challenges" in Sudarshan Chawla & D.R.Sardesai (eds.) *Changing Patterns of Security and Stability in Asia* (Chaper 6), Allied Publishers pvt. Ltd., New Delhi, 1980, p. 144

৩. Dutta V.P.- "India's Foreign Policy" (Chapter-6), Vani Prakashani, New Delhi, 1990, p. 170

৪. Alamgir Jalal and D'costa Bina— "The 1971 Genocide: War crimes and political crimes" in *Economic and Political weekly* Vol. XLVI, No-13, March 26, 2011, EPW Research Foundation, Mumbai, 2011, p. 38.

৫. Mohaiemen Naeem— "Flying Blind : waiting for a Real Reckoning on 1971" in *Economic and Political weekly*, Vol-XLVI, No.036, Sep 03, 2011, EPW Research Foundation, Mumbai, 2011, p. 40

৬. Chakraborty Santanu— "Cooperation in South Asia— The Indian Perspective" (Chapter-3), K.P.Bagchi & Company, Kolkata, 2008, p. 31

৭. Dr. Bhuiyan Shahjahan Hafez— "Patterns of Govermance in BD : A Review of five Regims— 1972-2001" in *Regional Studies*, Vol. XXV, No- 4, Autumn 2007, Institute of Regional Studies, Islamabad, 2007, p. 52

৮. Text in Foreign Affairs Record, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, March 1972, p. 63

৯. Chakraborty Radnaraman & Chakraborty Sukalpa (eds.)— "Samasamayik Aatarjatik Samparka" (Chapter-V), Progressive Publishers, Kolkata, 2004, Pp. 413-414

১০. Dutta C.R.— "Water strees in Eastern India with Particular Reference to— The Hoogly-Bhagirathi River", in B.K.Jahangir & Jayanta Kr. Dey (eds.)— *India-Bangladesh cooperation Broadening measures*, K.P.Bagchi & Company, Calcutta, 1997, p. 122

১১. Foreign Affairs Record— Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, May 1974, p. 156

১২. *The Statesman*, 17th May, 1974.

১৩. Land Boundary Agreement 1974, Article-I, Clause-14, Source: Bangladesh Documents, Vol-2, No. 4, April-June-1974, Pp-14-16

১৪. Ibid.

১৫. Bhasin Avtar Singh— "India-Bangladesh Relations 1971-1994" Document Vol-I, Siba Exim, New Delhi, 1996, Pp-1467-1705.

১৬. *Bangladesh Observer*, 20th June, 1974.

১৭. *Asian Recorder*, 30th April-4th May, 1975, New Delhi, p. 12568

১৮. Op.cit., no-3, p. 178

১৯. *The Statsman*, 15th August 1975

২০. The Constitution of Bangladesh, Ministry of Law, Justice and Parliamentary affairs, Article-140, Dhaka, 1999, Pp. 56, 04.

২১. Mainruzamman Talukdar— "Bangladesh in 1976: Struggle for survival as an Independent state" in *Asian Survey*, Vol- 17, No-02, Feb 1977, Berkeley, 1977, Pp. 191-194.

২২. The Statesman, 6th November, 1977.

২৩. The Statesman, 29th November 1977.

২৪. Op.cit, no-1, p. 85

২৫. Upreti B.C.— "Indo-Bangladesh Water Dispute" in S.R.Chakraborty (ed.)— *Foreign Policy of Bangladesh*, Har Anand Publication, New Delhi, 1994. p. 144

২৬. Tajuddin Muhammad— "Foreign Policy of Bangladesh— Libaration war to Seikh Hasina", National Book organisation, New Delhi, 2001, p. 20

২৭. Lifschultz Lawrence— "Signs from the Hill Tracts' in *Frontier*, 10th November, 1984, p. 9.

২৮. Islam M.R.— "Costitutionalism and Governance" in M.Alauddin and Samiul Hasan (eds.) *Development, Governance and the Enviornment in South Asia: A focus on Bangladesh*, Macmillan, Basingstoke, 1999, p. 173.

২৯. Das Avijit— “Tin Bigna Andolon: Prekhapot O Prakiti” in Uttarbanga Sambad, Siliguri, p. 114

৩০. Op.cit. no- 26, p. 21

৩১. Rahaman Waliur— “Transition to Decmocracy— Kalidoscope of a Changing World” The University Press Ltd. Dhaka, 2011, p. 40

৩২. Source: Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, Webside- http:/ //www.meadev.gov.in.

৩৩. Mukherjee Deb— “Bangladesh” in J.N.Dixit (ed.) *External Affairs-Cross Border Relations*, The Lotus Collections, Roli Books Pvt Ltd., New Delhi, 2003, p. 199

৩৪. Indian Express, 34th December, 1996

৩৫. Sen Sumita— “The Ganga Water Treaty-From Uncertainty towards stablitity” in Asian Studies, Vol-XV, No.1, May-June 1997, Netaji Institute for Asian Studies, Kolkata, 1997, p. 31.

৩৬. Ibid, p. 32

৩৭. Sarker Md. Masud— “Bangladesh Foreign Pilicy Viz-a-viz: Nature and Trend” in *Regional Studies*, Vol-XXVI, No. I, winter 2007-2008, Institute of Regional Studies, Islamabad, 2008, p. 07.

৩৮. Op.cit., no-6, p. 100

৩৯. Dutta V.P.— “Indias foreign Policy—Since Independence” National Book Trust, New Delhi, 2007, p. 85

৪০. Ibid.

৪১. Hussain Akmal— “Geo Politics and Bangladesh Foreign Policy” CLIO, June 1983, Vol-7, No. 2, 1989, Pp. 99-100

৪২. *The Daily Star*, 1st October, 2003

৪৩. Yasmin Lailufar— “Bangladesh-India Tusseles’ in *South Asian Journal*, No.-5, July-Sep 2004, Lahore, Pakistan, 2004, p. 89

৪৪. Ibid.

৪৫. Op.cit, no-37, p. 12

৪৬. *The Daily Star*, 15th October 2003

৪৭. *The Hindu*, 3rd May, 2010

৪৮. Ibid.

৪৯. *Sen Arindam— "The Chitmahal Problem: Need for uegent solution" in Human scape, Vol-IX,* Issue-XI, Nov 2002, Oxfam, New Delhi, 2002, p. 05

৫০. *The Hindu*, 3rd May 2010.

৫১. Ahsan Abul- "Bangladesh- India Relations: convergence and discord" in *South Asia free media Association* (SAFMA), 9th-10th Oct, 2004, Lahore, Pakistan, 2004, P. 12

৫২. *The Hindu*, 28th Oct, 1996.

৫৩. A.T.B.M. Abbas- "Bangladsh-India Negotiations on Ganges waters" in Mujaffar Ahmad and Abul Kalam (eds.) *Bangladesh Foreign Relations-Changes and Directions*, The University Press, Dhaka, 1989, P. 25.

৫৪. *Op.cit*, no. 25, p. 142

৫৫. Hossain Ishtiaq— "Bangladesh-India Relations: Issues and Problems' in Emajuddin Ahamed (ed.)- *Foreign Policy of Bangladesh- a small States imperative*, The University Press Ltd., Dhaka, 1984, p. 41

৫৬. Mahapatra Debasis- "Indo-Bangladesh Relations : Need for Strategic factor" in *focus*, Vol-VII, Mahishadal Girls' College, Purba Medinipur, 2013, p. 34.

৫৭. *Op.cit*, no. 45, p. 10

৫৮. Haque Ehsanul- "Towards a Rational Water Resources Management : The case of Bangladesh and India" in B.K. Janangir and Jayanta Kr. Roy (eds.) *India-Bangladesh Cooperation-Broadening Measures*, KP Bagchi & Company, Calcutta, 1997, Pp. 113-114.

৫৯. Khosla I.P.- "Bangladesh-India Relations' in *South Asian Journal*, No. 09, Jan-Mar-2005, Lahore, Pakistan, 2005, p. 77

৬০. Lama Mahendra P- "Bangladesh-India Trade Relations: Some Critical Issues" in

S.R.Chakraborty (ed.) *Foreign Policy of Bangladesh*, Har Anand Publication, New Delhi, 1994, p. 118

৬১. Choudhury Jafar Ahmed- "Bangladesh Foreign Economic Relations" Oitijjya, Dhaka, 2004, p. 45

৬২. *Weekly Holiday*, Dhaka, 12th August, 2005

৬৩. Nandi Debasis- "Bharat-Bangladesh Samparka-Bangladesh : Bharater Ek Asthitisil Pratibesi" in *Samaj Tattva*, Vol-XIII, Issue-02, Dec 2007, Association for social Studies, Kolkata, 2007, p. 78

৬৪. Sobhan Zafar- "Trade and Economic Cooperation : The Costs of Non-Cooperation" in Farooq sobhan (ed.), *Daynamics of Bangladesh-India Relations-Dialogue of young Jaurnalists Across the Border*, The University Press Ltd., Dhaka, 2005, p. 12

৬৫. Behera Ajoy Darshan- "Insurgency in the Bangladesh Hills: Chakmas' search for Autonomy" in *Strategic Analysis*, Vol. XIX, No. 7, Oct, 1996, Institute for Defence Studies and Analysis, New Delhi, 1996, p. 988

৬৬. Amnesty International Report on "Bangladesh, Human Rights in the Chittagong Hill Tracts" ASA 13/01/06, Feb 2000, http:///www.amnesty.org.

৬৭. Bhaumik Subir- "Insurgent crossfier: North-East India", Lancer Publisher, New Delhi, 1996, p. 275

৬৮. Op.cit., no. 65, p. 994

৬৯. Ibid, p. 995

৭০. Hussain Anwar- "Ethnicity and Security of Bangladesh" in Iftekharuzzaman (ed.) *South Asia's Security : Primacy of Internal Dimension*, Academic Publishers, Dhaka, 1994, p. 184

৭১. Op.cit., no. 67, pp. 272, 274

৭২. Ahmed Imtiaz- "Refugees and Security: the experience of Bangladesh" in S.D. Muni and LokRaj Baral (eds.) Refugees and Regional Security in South Asia, Konark Publishers, New Delhi, 1996, p. 133

৭৩. Khan Zillur- "Bangladesh in 1992" in Asian Survey, Vol. 33, No. 2, Feb 1993, Berkeley, 1993, p. 154.

৭৪. "Why Chakma Refugees fear Return to Bangladesh"- Decan Herald-13th June, 1993.

৭৫. *The Hindu*, 9th May, 1994

৭৬. "Illegal Bangladeshis area a Security threat; says SC" PTI, 26th Feb, 2001

৭৭. Bhasin A.S. (ed.)- "India-Bangladesh Relations-1971-1994" Document, Vol. II, Siba Exim, New Delhi, 1996, p. 989

৭৮. *The Telegraph*, 26th Aug. 1998

৭৯. Thapliyal Sangeeta- "Bangladeshi Migrants in India: A cause for concern" in South *Asian Studies*, Vol. 35, No. 2, July-Dec 2000, New Delhi, 2000, p. 45

৮০. Annual Report 1995-1996, Ministry of Home Affairs, Govt of India, New Delhi, p. 16

৮১. Hauzel Hoihnu- "Arms, Drug Smuglling and Cross Border Terrorist Activities" in Farooq Sobhan (ed.) *Dynamics of Bangladesh-India Relations- Dialogue of young Journalists Across the Border*, The University Press Ltd., Dhaka, 2005, Pp. 44-45.

৮২. Op.cit, no. 79, p. 46

৮৩. Op.cit, no. 81, p. 46

৮৪. Op.cit, no. 43, p. 90

৮৫. Op.cit, no. 63, p. 79

৮৬. Op.cit., no. 59, p. 72

৮৭. Op.cit, no. 37, p. 07

৮৮. Op.cit, no. 81, Pp. 40

৮৯. Op.cit, no. 81, Pp. 43-44

৯০. Op.cit, no. 43, Pp. 89-90

৯১. Source: http://www.unodc.org/southAsia/en/frontpage/2009/september/Bangladesh-interview with prof. zakir hossian on human traffiking.html.

দ্বিতীয় অধ্যায়

NDA সরকারের আমলে ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক (১৯৯৮–৯৯, ১৯৯৯–২০০৪)

ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা (NDA) সরকারের আমলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় যে উভয় দেশ তার ঐতিহ্য, পরম্পরা ও সুহৃদয় সম্পর্ক রক্ষা করতে তৎপর। এক্ষেত্রে ভারতে কেন্দ্রে মিলিজুলি সরকার গঠনে NDAর উদ্ভব ভারতীয় রাজনীতিতে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এর আগে যেসব জোট সরকার তৈরি হয়েছিল সেগুলি নির্বাচনোত্তর কতকগুলি দলের অপরিকল্পিত সমন্বয়— যা শুধুমাত্র বিপক্ষ কোন দল বা গোষ্ঠীর ক্ষমতা দখল রুদ্ধ করার প্রয়োজনে গঠিত। সুতরাং দীর্ঘকালিন নীতি প্রনয়ন বা অনুসরণ বহুলাংশে সম্ভব ছিলনা। বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা তখন তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে স্থির হয়েছে। ১৯৯৮ সালে সাধারণ লোকসভা নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার আগে BJP কতকগুলি সমস্বার্থসম্পন্ন রাজনৈতিক দলকে একত্র করে মোর্চা গঠন করেছিল যা National Democratic Alliance বা NDA নামে পরিচিত এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দলগতভাবে হোক, ব্যক্তিগতস্তরে হোক, কোন টানাপোড়েন বিদেশনীতির প্রতিবন্ধক হতে দেয়নি। তার অন্যতম কারণ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার ছাড়াও বিদেশমন্ত্রকের ওপর ব্যক্তিগত নজর রেখেছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তার অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা সর্বজনবিদিত। সুতরাং ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত NDA সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন ভারতের বিদেশনীতিতে সুনির্দিষ্ট কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

NDA সরকারের আমলে ১৯৯৮ সালের ১১ই মে দ্বিতীয় পোখরান বিস্ফোরণ বিদেশনীতির ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যবাহী ঘটনা। পশ্চিমী গণমাধ্যমগুলির তদন্ত প্রক্রিয়ার প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের গোপন পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ কর্মসূচীর অকাট্য প্রমাণ হস্তগত হওয়ার পর, ভারতের আশু কর্তব্য সম্পর্কে দলীয় ও সরকারি স্তরে চিন্তাভাবনা শুরু হয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এবার সময় এসেছে নিজেকে পরমাণু অস্ত্রসম্পন্ন দেশ হিসাবে প্রমাণ করার। তাই কেবলমাত্র দু-একটি পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ নয়। এর প্রধান কারণ পাকিস্তান বা চীন-এই দুই প্রতিবেশী দেশের পারমাণবিক ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা। এই আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ পাকিস্তানের যাবতীয় ক্ষেপনাস্ত্র উৎপাদনে চীনের কারিগরী ও সরঞ্জাম ব্যবহার। তাছাড়া পকিস্তান তার পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের একটি অংশ

চীনকে দিয়েছিল রাস্তা তৈরির জন্য।

অন্যদিকে আরো একটি কারণ হল, বিশ্বব্যবস্থায় শুধুমাত্র কয়েকটি শক্তিমান দেশের হাতে এই চূড়ান্ত চাপসৃষ্টিকারী অস্ত্র থাকার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ জানানো। আর পাকিস্তান যেহেতু চোরাপথে গোপনে তার পারমাণবিক কার্যকলাপের প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছিল এবং ব্রিটেন-আমেরিকা-ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্র তা না জানার ভান করে চলার ফলে ভারতের প্রয়োজন ছিল পাকিস্তানের অবস্থানকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসার। এই হিসাব পুরোপুরি মিলে গেছে দ্বিতীয় পোখরান বিস্ফোরণের (১১ই মে ১৯৯৮) পরেই পাকিস্তানের পাল্টা বিস্ফোরণের মাধ্যমে। পারমাণবিক বিস্ফোরণে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে দেশে এবং বিদেশে তা স্পষ্টতই প্রত্যাশিত ছিল। উপ-মহাদেশের সুস্থিতির বিনাশ, দুই শক্তিধর রাষ্ট্রের সম্ভাব্য সংগ্রামে অকল্পনীয় ধ্বংসলীলা, দারিদ্র্যপীড়িত দেশ দুটির অমার্জনীয় সামরিক বিলাসিতা, ভারতের আধিপত্য স্পৃহা ইত্যাদি নানা অভিযোগ উঠলেও একথা সত্য যে— "Pokhran II Nuclear tests signalled that India was also Poised for developing a deterence strategy".[১] প্রসঙ্গত, একথাও অস্বীকার করা চলে না যে প্রতিবেশী একটি দেশ যখন ভারতের নিরাপত্তা চূর্ণ করার জন্য তলে তলে পরমাণু অস্ত্র অর্জন করে চলেছে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে তাকে সংযত করা দূরে থাক প্রশ্রয় দিয়ে আসা হয়েছে, তখন আর কিছু না হোক আত্মরক্ষার খাতিরেই ভারতকে ধৈর্যের পরীক্ষা দেওয়া একটা সময়ে বন্ধ করতেই হয়। ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর বিশ্বরাজনীতিতে তাই NDA সরকার পৃথক পরমাণু অস্ত্রনীতি ঘোষণা করেছে।

আভ্যন্তরীণ জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ভারত পোখরান-II বিস্ফোরণ ঘটালেও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে তার কোন সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েনি। বরং বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দল ও তার নেতৃত্ব নিরাপত্তার খাতিরে এই বিস্ফোরণকে সমর্থন করেছেন এবং শেখ হাসিনা ওয়াজেদ আরও বলেন যে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে ভারত-বিরোধী কোন কার্যকলাপ করতে দেওয়া হবে না। তার প্রতিক্রিয়া হল— She has not criticised Indias nuclear explosion in May 1998. She visited New Delhi after the explosion and stated that every country has soverign right to perceive its security threats and take measures suitable to remove it.[২] তিনি ভারতের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে উচ্চকিত প্রশংসা করে বলেন যে উভয় দেশ আঞ্চলিক রাষ্ট্র হিসাবে তাদের সমস্যাগুলি দ্রুত মিটিয়ে ফেলবে। ১৯৯৮ সালে উভয় দেশ দিল্লীতে সীমান্ত সংক্রান্ত একটি সম্মেলনের আয়োজন করে এবং সীমান্ত চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই বছর জুন মাসে ভারতের অয়েল এন্ড ন্যাচারাল

গ্যাস কমিশন (ONGC) বাংলাদেশে নয়টি গ্যাসের কূপ ও অন্যান্য ছয়টি গ্যাসের কূপ উন্নয়নের অনুমোদন পায়। উভয়দেশ অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও ট্রানজিট সুবিধা পাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করে। এই বছর উভয় দেশ কোন কোন পণ্য অগ্রাধিকার পাবে আমদানী ও রপ্তানীর ক্ষেত্রে, বহুমুখী বাণিজ্যের প্রসার, সীমান্ত বাণিজ্য প্রভৃতি নিয়েও আলাপ আলোচনা করে। এছাড়াও ১৯৯৮ সালে অনুপ্রবেশজনিত সমস্যাকে কেন্দ্র করে আসামের রাজ্যপাল একটি রিপোর্ট তৈরি করেন তাতে ৫.৪ মিলিয়ন পশ্চিমবঙ্গে, ৪ মিলিয়ান আসামে, ০.৮ মিলিয়ন ত্রিপুরায় এবং বিহার, মহারাষ্ট্র, দিল্লী ও রাজস্থানে বাংলাদেশী উদ্বাস্তুরা ছড়িয়ে রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এই রিপোর্টকে বাংলাদেশ খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। ফলতঃ অনুপ্রবেশজনিত সমস্যা থেকেই যায়।

১৯৯৯ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বিদেশমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী ও ভূতল পরিবহন মন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীসহ একটি প্রতিনিধি দল ১৯-২০ জুন ঢাকা সফর করেন। এই সফরের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ঢাকা-কলকাতা বাস যাত্রার সূচনা। যদিও ১৯৯৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে কোলকাতা-ঢাকা বাস পরিষেবা শুরু করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই অনুযায়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ঢাকায় এই বাস পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। দুই রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানকে বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই এই বাস পরিষেবা শুরু করার কথা ভাবা হয়েছিল। এই বাস যোগাযোগ উভয়দেশের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে নয়া দিগন্ত উন্মোচনে সক্ষম হয়েছিল।

এই সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী বৈঠক করেন এবং উক্ত বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়। এছাড়া ভারত তিন বছরের মধ্যে ২০০ কোটি টাকা অনুদান প্রদানের আশ্বাস প্রদান করে। উভয় দেশ বাণিজ্য সহযোগীতা বৃদ্ধি তথা বহুমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন করার জন্য সহমত হয়। এছাড়া বাংলাদেশের দাবী মেনে কিছু পণ্যের উপর থেকে রপ্তানী ও আমদানী শুল্ক প্রত্যাহার করার আশ্বাস দেয় ভারত। উভয় দেশ সীমান্ত বাণিজ্য নিয়ে আলাপ আলোচনা চালায় এবং সীমান্তে পণ্য পরিবহন বা পণ্য ওঠানামা কিভাবে করবে তা Joint Group of Experts কে খতিয়ে দেখতে বলা হয়।

এইবছর এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের জলসম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রজ্জাক যৌথ নদী কমিশনের ৩৩তম

অধিবেশনে দিল্লী আসেন। এইসময় যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি উভয় দেশের মধ্যে প্রবাহিত নদীগুলির জলবন্টন নিয়ে আলোচনা করেন। এবং তিস্তাতে যাতে একইভাবে জলবন্টন করা যায় তার প্রস্তাব দেন। ১৯৯৯ সালে ১৯-২৪ মে বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তোফেল আহমেদ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যিক সহযোগীতার বিষয়ে কথা বলতে ভারতে আসেন। ঐবছর ৯-১৫ই আগস্ট বাংলাদেশ পার্লামেন্টের স্পীকার হুমায়ুন রশিদ ভারতে আসেন। এই সময় উভয়দেশের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ও পাল্টা বৈঠক চলতে থাকে। এরমধ্যে ১২-১৬ই অক্টোবর বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সচীব মহঃ ইদ্রিশ আলি ভারতে আসেন সঙ্গে বাংলাদেশের সৈন্যবাহিনীর ডিজি এবং নৌবাহিনীর সহযোগী প্রধানকে নিয়ে কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল Defexpo-99এ যোগদান করা। পরে ৩০ শে মার্চ-৪ই এপ্রিল ১৯৯৯ সালে MILAN-99 এ বাংলাদেশ নৌ-মহড়ায় পোর্টব্লেয়ারে অংশগ্রহণ করে। ১৯৯৯ সালে ভারতের নৌবাহিনীর রিয়ার অ্যাডমিরাল জেনারেল ভি ভরতন ১-৪ই নভেম্বর তিনটি ভারতীয় নৌ জাহাজ নিয়ে চট্টগ্রাম পরিদর্শনে যান এবং ৪ই নভেম্বর বাংলাদেশের তিনটি নৌজাহাজ নিয়ে যৌথ মহড়া শুরু হয়।[৩] এছাড়া বাংলাদেশের সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে বহুবার বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে। উক্ত বিষয়ে ১৯৯৯ সালের ২৪-২৮শে অক্টোবর BSF ও BDR-এর মধ্যে ডি জি পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয় ঢাকাতে।

১৯৯৯ সালের ২৬শে ২৮শে অক্টোবর ঢাকাতে উভয়দেশের সচিবগণ "India-Bangladesh Protocol on Inland Transit & Trade" পুনর্বহাল সম্পর্কিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং ২০০১ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। নতুন খসড়া অনুযায়ী ভারতের দক্ষিণপূর্বের রাজ্যগুলিতে কিভাবে পণ্য পরিবহন পরিচালিত হবে তার উল্লেখ করা হয়। উক্ত খসড়া অনুযায়ী ভারত কলকাতা, হলদিয়া, পান্ডু ও করিমগঞ্জ এবং বাংলাদেশ নারায়ণগঞ্জ, শ্রীরাজগঞ্জ, খুলনা এবং মংলা পোর্ট পণ্য পরিবহনের জন্য উভয়দেশ ব্যবহার করতে পারবে। উভয়দেশ জাহাজ থেকে পণ্য উঠানো ও নামানোর জন্য উক্ত বন্দর বা কাস্টমস স্টেশনকে ব্যবহার করবে।

১৯৯৯ সালের ১৩ই নভেম্বর ডারবানে কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের প্রধানদের বৈঠকে ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ হয়।[৪]

তাছাড়া উভয়দেশ শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণে বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করে। ভারত বাংলাদেশী

ছাত্রদের স্কলারশিপ প্রদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। ভারতীয় শিল্পীরা বাংলাদেশের ঢাকাতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পরিচালনা করতে শুরু করে। চলচ্চিত্র প্রদর্শনী , শিল্পকলা প্রদর্শনী, সংগীতানুষ্ঠান প্রভৃতি উভয় দেশ আয়োজন করে। এছাড়া ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস বাংলাদেশের স্থানীয় শিল্পীদের নিয়েও নানাধরনের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংঘটিত করে। যা উভয়দেশের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে তুলে ধরে।

২০০০ সালের ২০-২২ শে জানুয়ারী ভারতের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী অজিত কুমার পাঁজা ঢাকা সফর করেন এবং বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এবং অর্থও কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বহুমুখী আলোচনা হলেও কৃষিক্ষেত্রে উভয়দেশ MOU স্বাক্ষর করেন। এই বৈঠকের মধ্যে থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি উঠে এসেছিল সেটি হল ঢাকা-আগরতলা বাস যোগাযোগ স্থাপন। ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে উভয়দেশের স্বরাষ্ট্র সচীব পর্যায়ের আলাপ আলোচনা শুরু হয় সীমান্ত ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে এবং ঐ মাসে BSF ও BDR ডিজি পর্যায়ে বৈঠক হয় দিল্লীতে এবং অক্টোবর মাসে যথাক্রমে ঢাকাতে যার ফলশ্রুতি হিসাবে ২০০১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে যৌথ কর্মী গোষ্ঠী (JWG) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পর্যায়ে বৈঠক করে। মে মাসে উভয়দেশের বাণিজ্যসচিব পর্যায়ে কথাবার্তা চলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে। এবং ঢাকা-আগরতলা বাস যোগাযোগ বিষয়ে আলোচনা হয়। এই বছর মে মাসে ভারতের সেনা প্রধান জেনারেল ভিপি মালিক বাংলাদেশ সফরে যান এবং প্রথম ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী অভিযান মহড়া সূচিত হয় তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদীতে যাকে বাংলাদেশে যমুনা নদী বলা হয়।

২০০০ সালের জুলাই মাসে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে রেল পরিষেবার প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একসময় যে রেলওয়ে লাইন ব্যবহার করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলার দুটি অংশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হত সেই রেলপথকে ব্যবহার করে ভারতের পেট্রোপোলের সাথে বাংলাদেশের বেনাপোলের যাতে দ্রুত রেল যোগসূত্র রচিত হয় তারজন্য দুটি রাষ্ট্র উদ্যোগী হয়। এই চুক্তিটি ছিল শুধু মাত্র পণ্যসামগ্রী আদানপ্রদানের উদ্দেশ্যে।[৫]

২০০০ সালের ৬-৮ই আগস্ট বাংলাদেশের বিদেশ সচিব সি এম সফি স্বামী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ দূত হিসাবে একটি চিঠি নিয়ে দিল্লী আসেন এবং ভারতের বিদেশ দপ্তরের পক্ষ থেকে বিদেশ সচিব আলোচনার জন্য আহ্বান জানান। ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের

জলসম্পদ প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি বিজয়া চক্রবর্তী বাংলাদেশ সফরে যান এবং বাংলাদেশ পাল্টা সফর করে ও সচিব পর্যায়ে বৈঠক ও আলাপ আলোচনা চলে। ঐবছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমান্ত অঞ্চলে ব্যাপক বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যার দরুণ ভারত সরকার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করে।

২০০০ সালের ১৩-১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিদেশ সচিব সি এম সফিস্বামী দিল্লী আসেন বৈদেশিক কার্যালয় বোঝাপড়ার উদ্দেশ্যে। এবং ভারত-বাংলাদেশ বহুমুখী সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলোচনা শুরু করেন। উভয়দেশ ঢাকা-আগরতলা বাস যোগাযোগে উদ্যোগী হয় এছাড়া দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের পুনর্বীক্ষণ করতে উভয়ে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগীতা, জল বন্টনের ক্ষেত্রে সহযোগীতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভিসা ব্যবস্থার সরলীকরণ, সাংস্কৃতিক বিনিময়, সন্ত্রাস দমন প্রভৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে স্থলসীমান্ত নির্ধারণ ও চুক্তির বিষয়েও আলোচনা হয় এবং যৌথ কর্মী গোষ্ঠীকে (JWG) এই বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় যে তারা যেন এই বিষয়টি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করে।

এছাড়াও ঐ বছর উভয়দেশের মধ্যে শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ বিষয়ে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা বজায় রেখে এগিয়ে চলার চেষ্টা করা হয়। ভারত ১০০ জন বাংলাদেশী ছাত্রকে ভারতে পড়াশোনা করার অনুমতি দেয় এবং বহুছাত্রকে Indian Council for Cultural Relations (ICCR) এর পক্ষ থেকে স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। এছাড়া ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাস সংগীতানুষ্ঠান, নৃত্য পরিবেশনা, চলচ্চিত্র ও শিল্পকলা প্রদর্শনী সংঘটিত ও পরিচালনা করে। এছাড়া ২০০০ সালে ভারত প্রায় ৩,৬৩,২০৪ জন বাংলাদেশী নাগরিককে ভারতে প্রবেশের অনুমতি বা ভিসা দিয়েছিল।[৬] এছাড়া সাংস্কৃতিক বিনিময় ও গণমাধ্যম পরিবেশনার ক্ষেত্রে উভয় দেশ সদর্থক ভূমিকা পালন করে।

অন্যদিকে ভারতে BJP পরিচালিত NDA জোট সরকার অনুপ্রবেশ, জলসম্পদ ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ও পাল্টা বৈঠক করতে থাকে।

২০০১ সালের ১২-১৩ই জানুয়ারী ঢাকাতে যৌথ নদী কমিশনের' ৩৪ তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালে গঙ্গা জলবন্টন চুক্তির ন্যায় তিস্তার জলবন্টন যাতে সম্ভব হয় সে বিষয়ে ভারতের সহযোগীতা প্রত্যাশা করে এবং বন্যার সময় আগে থেকে অনুমান করে সতর্ক করা ও সহযোগীতা বৃদ্ধি করাও সীমান্ত বা উভয়দেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির জলবন্টন নিয়ে

আলোচনা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ ভারতের কাছে গঙ্গার ওপর জলাধার নির্মাণের জন্য অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা চায়— যা ভারত সম্মত হয়। বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানীয় জল আর্সেনিকগ্রস্ত হয়ে পড়ায় উভয় দেশ তা প্রতিকার করার ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।[৭] ২০০০ সালে পণ্যপরিবহনের জন্য যে রেলপথ নির্মাণ করা হয় তা ২০০১ সালের ২১শে জানুয়ারী ভারতের রেলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ও বাংলাদেশের যোগাযোগমন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু যৌথভাবে উদ্বোধন করেন।

২০০১ সালের এপ্রিল মাসে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের দ্রুত অবনমন ঘটে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (BSF) বাংলাদেশের বাংলাদেশ রাইফেলস্ (BDR)-এর মধ্যে সম্মুখসমরকে কেন্দ্র করে। সম্পর্কের সংকট ঘনীভূত হয় দুটি সরকারের মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে শেখ হাসিনার আমলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'তালিবানিকরণ' ঘটে যারফলে 'ইসলামীয় মৌলবাদী শক্তি' হিন্দুবিদ্বেষ ও তীব্র ভারত বিরোধীতাকে মূল শ্লোগান হিসাবে তুলে ধরে। অন্যদিকে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গীগোষ্ঠীগুলি পাকিস্তানের আই এস আই (ISI) এর সঙ্গে হাতমিলিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে ভারত বিরোধীতাকে সক্রিয় করে তোলে বাংলাদেশের সমাজে। তাই স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের রাজনীতি ও সামরিক বাহিনী ভারত বিরোধী অবদানকে সুদৃঢ় করে উপরোক্ত ঘটনার মধ্যদিয়ে। ২০০১ সালের ১৫-১৯শে এপ্রিল মেঘালয়ের পায়রডিহা ও পরে আসাম সীমান্তে ভারতের BSF এবং বাংলাদেশের BDR পরস্পর রক্তক্ষয়ী সম্মুখ সমরে জড়িয়ে পড়ে। যা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে শেষ ২৯ বছর সংঘটিত হয়নি এবং এই ঘটনা ভারতের পূর্ব-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের অভিযানকে মনে করিয়ে দেয়। এই সংঘর্ষের ফলে ভারতের ১৬ জন BSF জওয়ান মারা যান।[৮] প্রকৃতপক্ষে দ্বি-পাক্ষিক সীমান্ত সম্পর্কে ভুল বোঝাপড়ার ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলাদেশ এই আক্রমণ পরিকল্পনা মাফিক সংঘটিত করে। এ প্রসঙ্গে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে ও কূটনৈতিক পর্যায়ে কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়— The Prime Minister Conveyed to the then Bangladesh Prime Minister India's deep Sence of hurt and anguish over the inhuman treatement meted out to the BSF Personnel. She (Seikh Hasina) expressed her deep sadness and concern and regretted the loss of lives. The situation was defused quickly by Prompt diplomatic action reflecting the resilience of India-Bangladesh relations.[৯] একথা সত্য যে বাংলাদেশের প্রাক-নির্বাচনী পরিস্থিতিতে ভারত-বিরোধী সামাজিক প্রেক্ষাপটে শেখ হাসিনা এই ঘটনার ক্ষেত্রে BDR-এর বিপক্ষে কোন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হননি।

এই ঘটনার কারণ দর্শাতে গিয়ে বাংলাদেশের BDR-এর প্রধান মেজর জেনারেল ফজলুর রহমান বলেছিলেন যে বাংলাদেশের জমি পুনরুদ্ধারের জন্য BDR এই অপারেশন করেছে। প্রকৃতপক্ষে এই অপারেশন ছিল পূর্ব পরিকল্পিত এবং সতর্কতামূলক তাই বাংলাদেশ রাইফেলস্ (BDR) ১৬ই এপ্রিল মধ্যরাতে ঠিক ১টার সময় বাংলাদেশ সৈন্যের পাঁচটি ব্যাটলিয়ান ও ১৯নং ডিভিশন ময়মনসিংহ সৈন্য শিবির থেকে হঠাৎ অস্ত্রসজ্জা ও মর্টারের দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে BSF-এর উপর আক্রমণ সংঘটিত করে। এই অপারেশন করার আগে BDR স্থানীয় প্রায় তিনহাজার মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। এইভাবে ষড়যন্ত্রের শিকার হয় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

প্রকৃতপক্ষে মেজর জেনারেল ফলজুল রহমান বাংলাদেশের কট্টরপন্থী ইসলামী মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন। এবং তাকে ঘিরে যেসব সেনা অফিসাররা থাকতেন তারা ছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বিরোধী। তাই স্বাভাবিকভাবে ভারত-বিরোধী ঐক্য বাংলাদেশ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যা আক্রমণে পর্যবসিত হয়। ফজলুর রহমান আশা করেছিলেন যে ভারত এই আক্রমণের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে যার মাধ্যমে তাঁর ভারত বিরোধী রাজনৈতিক পূর্ণমূল্যায়ণ সফল হবে। কিন্তু ভারত এই ঘটনাকে অপ্রত্যাশিত বলে ব্যক্ত করে। এবং ভারত সরকার অত্যন্ত ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যক্ত করে যে এই সমস্যা পারস্পরিক বোঝাপড়া ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা হবে।

এইরকম পরিস্থিতিতে ভারত সরকার আত্মসংবরনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিরোধী অবস্থান থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেছে। ভারত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিজের শক্তিকে প্রমাণ করা থেকে বিরত থাকলেও BSF এর ২১২নং এবং ৭৪নং ব্যাটেলিয়ান আসামের ধুবড়ীতে মানকাচর এলাকাতে সৈন্য সমাবেশ ঘটায় এবং উচ্চপদস্থ সেনা আধিকারিকরা BDR আধিকারিকদের পরামর্শ দেয় যে তারা যেন ভারতীয় যে জায়গায় রয়েছে সেখান থেকে তারা যেন ফিরে যায় না হলে ভারতীয় সৈন্য তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে অপারেশন শুরু করবে। এই পরিস্থিতিতে ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার এবং ঢাকাতে অবস্থিত ভারতের হাইকমিশনার উচ্চপর্যায়ে কূটনৈতিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উক্ত সমস্যার নিরসনে সচেষ্ট হন। ২০শে এপ্রিল ২০০১ সালে উভয় বাহিনী অর্থাৎ BDR ও BSF কোন সংঘর্ষ না করে আপন অবস্থানে সরে যায়। এইসময় বাংলাদেশের মেজর জেনারেল ফজলুর রহমান ভারতের BSF এর ডি জি গুরুবচন জগত এর কাছে উক্ত ঘটনার জন্য দুঃখ বা খেদ প্রকাশ করেন।[১০] ভারত এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। তবে একথা সত্য যে এই ঘটনার ফলে ভারতের

অভূতপূর্ব ক্ষতিসাধন হয় যা অপূরণীয়। এবং এই ঘটনা NDA সরকারের কাছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের প্রথম সংকট বলে অভিহিত করা যায়।

এই অপ্রত্যাশিত ও পরিহার্য ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ ফজলুর রহমান তার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এই ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এই বছর ছিল বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের সময়। যার দরুণ বেগম খালেদা জিয়ার পার্টিকে ভারত বিরোধীতায় উৎসাহিত করা; অন্যদিকে শেখ হাসিনাকে অপদস্ত করার লক্ষ্যে এই ঘটনা ঘটানো হয়। যার দরুন বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী ভারতের উত্তর-পূর্বের চরমপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গী গোষ্ঠীগুলিকে অপ্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করতে শুরু করে।

এই পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রথমতঃ বাংলাদেশ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হিসাবে তার সঙ্গে কৌশলগত ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সচেতনতা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক পদক্ষেপ হল ভারতের বিদেশমন্ত্রী যশবন্ত সিংহ বাংলাদেশ সফরে যান এবং শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য উদ্যোগী হন। তৃতীয়তঃ ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে উচ্চপর্যায়ের প্রখরতাও সতর্কতার সহিত কাজ করার কথা বলা হয়। যার ফলে ভারত তার ছিটগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়।

এরপর ২০০১ সালের ১২ই জুলাই যাত্রীবাহী রেল পরিষেবা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আরও একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের কারণে উভয়দেশের মধ্যে যাত্রীবাহী রেলব্যবস্থা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। যদিও ১০ই জুলাই আগরতলা-ঢাকা বাস পরিষেবার জন্য উভয়দেশ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত করে। এর আগে জুন মাসের ১১-১৪ তারিখ বাংলাদেশ থেকে একটি প্রতিনিধিদল ভারতে আসে ১৯৭৪ সালে স্থলসীমান্ত চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। এবং এটা স্থিরিকৃত হয় যে উক্ত বিষয়ে 'যৌথ সীমান্ত কর্মী গোষ্ঠী' এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সেই অনুযায়ী ২-৪ই জুলাই ঢাকাতে মিটিং করে ও গৃহীত রিপোর্ট উভয় সরকারের কাছে প্রেরণ করে। ঐ বছর জুন মাসে ২২-২৫ তারিখ ভারত-বাংলাদেশ 'যৌথ নদী কমিশনের' ১৯তম বৈঠক দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে ৫ ও ৬ই সেপ্টেম্বর যৌথ স্থায়ী কমিটির ৮ম বৈঠক ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে জলপথ পরিবহন ও বাণিজ্য সহযোগীতা বৃদ্ধির ব্যাপারে দ্বি-পাক্ষিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যাইহোক ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের 'আধিপত্যবাদ'কে সামনে রেখে ও 'anti-India attack'কে মূল ইস্যু করে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার দল বাংলাদেশ জাতীয় দল— জামাত-ই-ইসলামী তথা চারটি দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে জয়লাভ করে। নির্বাচনে জয়লাভ করার চারমাস পরে খালেদা জিয়ার দল ব্যাপক ও হিংসাত্মক হিন্দু নির্যাতনে অংশগ্রহণ করে। এই ১০ শতাংশ হিন্দু বাংলাদেশী যারা আওয়ামী লীগের সমর্থক তারা এক দারুন বিভীষিকার সম্মুখীন হয়। এবং আওয়ামী লীগ দল তথা দলের বর্ষীয়ান নেতারাও এই হিন্দুদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি বা তৎপর হয়নি। বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা যখন নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের কারণে ঘরছাড়া, গ্রাম ছাড়া, দেশছাড়া, হাজার হাজার বিপন্ন মানুষ যখন আশ্রয় নিয়েছে লঙ্গরখানায়, সরকার তখন তাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপনের। এই সময় বাংলাদেশের 'যুগান্তর' পত্রিকায় একটি শিরোনাম 'সংখ্যালঘুরা বিভিন্ন সীমান্ত পথে দেশ ছাড়ছে'। খবরে বলা হয়েছে, 'বৃহত্তর রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনির হাট, নীল ফামারী ও দিনাজপুর অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংখ্যালঘু লোকজনের উপর নির্যাতন, নিপীড়ন ও হুমকির মুখে গত ৭ দিনে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে দেড় সহস্রাধিক লোক পরিবার পরিজন নিয়ে ভারতে পালিয়ে গেছে। বিভিন্ন সূত্র জানায় প্রতিদিনই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন সীমান্ত অতিক্রম করছে'।[১১] এরফলে ভারতের সীমান্তে অনুপ্রবেশজনিত সমস্যা তথা উদ্বাস্তু আগমন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০০১ সালে বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ প্রসঙ্গে শাহরিয়ায় কবির আরো বলেছেন যে— "এবার নির্বাচনের আড়াই মাস আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সারা দেশে হিন্দু অধ্যুষিত জনপদ সমূহে যে নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনাবলী আমরা প্রত্যক্ষ করেছি নিঃসন্দেহে তা বাংলাদেশকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো একটি মনোলিথিক ইসলামিক দেশে পরিণত করার সুদূর প্রসারী চক্রান্তের অন্তর্গত। উপর্যুপরি নির্যাতনের কারণে হিন্দুরা দেশ ছেড়ে চলে গেলে বাংলাদেশের সেক্যুলার শক্তি যত দুর্বল হবে বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের পাকিস্তানিকরণ ও তালিবানীকরণ প্রক্রিয়া তত নির্বিঘ্নে হবে। এই উদ্দেশ্যেই খালেদা জিয়ার সরকারকে নীল নক্সার নির্বাচনের মাধ্যমে দুই তৃতীয়াংশেরও বেশী আসনে জয়ী করে ক্ষমতায় বসানো হয়েছে।"[১২] বাংলাদেশে খালেদা জিয়ার সরকারের দায়িত্বগ্রহণের রাত থেকে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে নজিরবিহীন আক্রমণ ও নির্যাতন আরম্ভ হয়েছিল ১১১ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদীদের হামলা ও হুমকির

কারণে যারা ঘরছাড়া ও এলাকা ছাড়া হয়েছেন। তাদের অনেকের উদ্বাস্তু জীবন এখনও অব্যাহত রয়েছে। অনেকে পিতৃপুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে চিরদিনের জন্য দেশত্যাগ করেছেন।

এইরকম একটি পরিস্থিতিতে ২০০১ সালের ২৬-২৭ শে অক্টোবর ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর বিশেষ দূত হিসাবে ভারতের তৎকালীন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিশ্র বাংলাদেশ সফর করেন। উভয়দেশ দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে বোঝাপড়ার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই সফরে ব্রজেশ মিশ্র বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সঙ্গে বৈঠক করার সময় নির্বাচনোত্তর সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তখন তাঁকে বলা হয় কোথাও কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও বাংলাদেশে 'চমৎকার সম্প্রাদয়িক সম্প্রীতি' বিরাজ করছে। বরং মিশ্রের কাছে পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে দিল্লীতে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে বিশ্বহিন্দু পরিষদের বিক্ষোভ সম্পর্কে। সেই বিক্ষোভে বাংলাদেশের পতাকা পোড়ানোর ঘটনায় ব্রজেশ মিশ্র দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের এই সফর সম্পর্কে 'Centre for Study of India-Bangladeh Relations'-এর ডাইরেক্টর বিমল প্রামানিক বলেছেন— 'There is no evidence that Mishra protested to Dhaka on the mistreatment of minorities in his meetings with the Bangladesh Leadership'।[১৩]

এই পরিস্থিতিতে ভারতের অমৃতসরে বিজেপির এক কর্মী সমাবেশে দলের সভাপতি কৃষ্ণমূর্তি বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়নের খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন নির্যাতনের ঘটনা ঘটার পর ভারতের ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল বিজেপির পক্ষ থেকে এই প্রথম বড় ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ ও প্রতিবাদ।'[১৪] এক সংবাদ সম্মেলনে অশোক সিংহল (বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শীর্ষ নেতা) মন্তব্য করেছেন যে, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সেনারা সংখ্যালঘুদের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছিল সাম্প্রতিককালে মৌলবাদীদের আচরণ তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই ৪০ হাজার হিন্দুকে সেদেশ থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য করা হয়েছে এবং আরও এক লাখ মানুষ দেশ ছেড়ে চলে আসার জন্য উন্মুখ।...এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ দেশের মানুষের মনে যদি প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে তবে আমাদের পক্ষে সেই আগুন নেভানো কঠিন হবে।[১৫]

উপমহাদেশের যেকোন একটি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটলে,

প্রতিবেশী দেশগুলোতে তার প্রতিক্রিয়া ঘটবেই। তাই দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কে এর প্রভাব খানিকটা হলেও পড়েছিল। অন্যদিকে বিএনপি জামাত জোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচনের অনেক আগেই বলেছেন তারা ক্ষমতায় গেলে বাংলাদেশের তেল ও গ্যাস বিক্রি সম্পর্কে শেখ হাসিনা যে অনমনীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা মানা হবে না। শেখ হাসিনা বহুবার বলেছেন, পঞ্চাশ বছরের মজুদ না রেখে তাঁরা বিদেশী কোম্পানীর কাছে তেল ও গ্যাস বিক্রি করবেন না। তাঁর এই প্রত্যয়ী মানসিকতা আমেরিকা ও ভারতের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায় কারণ এরা উভয়েই বাংলাদেশের তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন ও কেনার ক্ষেত্রে আগ্রহী। বিভিন্ন কারণে পাকিস্তানের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত চেয়েছিল এবার আওয়ামী লীগের বিরোধী দল বিএনপি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোক যার ফলস্বরূপ তারা নিঃঝঞ্ঝাটে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর যাতে নিজেদের অধিকার ও আধিপত্য বজায় রাখতে পারে। এইভাবে তারা বিএনপি-জামাত জোটকে ক্ষমতায় আনার প্রক্রিয়ায় নিজেদের যুক্ত করেছে। বাংলাদেশে 'অবাধ ও নিরপেক্ষ' নির্বাচনের ব্যাপারে মার্কিন প্রশাসনের নজিরবিহীন আগ্রহ, নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফল ঘোষণার আগেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন প্রেরণ এবং নতুন সরকারের প্রতি ভারত, পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শর্তহীন সমর্থনকে কোন অবস্থায় বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের পাকিস্তানিকরণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আধিপত্য কায়েমের চক্রান্ত থেকে বিচ্ছন্ন করে দেখা সম্ভব নয়।

ভারত ও আমেরিকার ক্ষেত্রে বিএনপি জামাত জোটকে সমর্থন বুমেরাং হয়েছে। তেল ও গ্যাস পাওয়ার জন্য বাংলাদেশে যে মৌলবাদী সরকারকে ভারত সমর্থন দিয়েছে তারা বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়ন করে ভারতে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে এটা দিল্লীর নীতি নির্ধারকরা কতটা ভেবেছেন জানিনা। তবে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের জন্য এই পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে হুমকি স্বরূপ। একইভাবে পাকিস্তান বা ভারতের মতো আফগানিস্তানে লাদেন ও তালিবানদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বিএনপি জামাত জোটের পক্ষে সেভাবে সমর্থন করা সম্ভব হয়নি, যদিও তত্ত্বাবধায়ক সরকার আফগানিস্তানে তালিবানী সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে আমেরিকাকে সমর্থন দানের অঙ্গীকার করেছিল বিএনপির সঙ্গে পরামর্শ করেই। আবার পাকিস্তানে জামাতে ইসলামী যেভাবে লাদেন ও তালিবানদের সমর্থন করেছে বাংলাদেশের জামাতীরা তা করতে পারছে না কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অখুশি হবে এই ভয়ে। বাংলাদেশে লাদেনের পক্ষে বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠন প্রতিদিন মিছিল মিটিং করেছিল এবং দিন দিন তা বাড়তে থাকে, যা বিএনপি জামাত জোট অথবা প্রভু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে স্বস্তিদায়ক নয়। যার প্রতিফলন ঘটেছে বিজেপির উদ্বেগ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রূকুটিতে।[১৬]

তবে একথা সত্য যে ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি জামাত জোটকে ক্ষমতায় বসিয়ে খাল কেটে কুমীর আনার যে ব্যবস্থা করেছিল তা প্রমাণিত হতে থাকে। খালেদা ও নিজামীদের সরকার ভারত ও আমেরিকাকে তেল ও গ্যাস বিক্রি করবে এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তীব্র বিশৃঙ্খলার আকার ধারণ করে। ভারত ও আমেরিকা সাম্প্রদায়িক ও আফগান ইস্যুতে বুঝতে পারে যে তারা কত বড় ভুল করেছে। এই ভুল তারা কিভাবে শুধরোবে এটা তাদের বিষয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও বিশ্বাসী কোন বাঙালী যেমন নিজেদের জীবন থাকতে বাংলাদেশকে আফগানিস্তান বা পাকিস্তানে পরিণত হতে দেবে না, তেমনি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরও বিদেশী একাধিপত্য মেনে নেবে না।

বিএনপি পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায় যে নির্বাচনের সরকারী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার আগেই ভারতের বাজপেয়ী সরকার খালেদা জিয়াকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। ভারতের এই খবরে বিস্ময় প্রকাশ করেছিল পাকিস্তানও কারণ জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের সমন্বয়ে গঠিত খালেদা জিয়ার চার দলীয় জোটকে সবার আগে স্বীকৃতি জানিয়েছে ভারত। এবং NDA সরকারের এই আচরণে স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের জনগণও বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। এক্ষেত্রে ভারত কেন শেখ হাসিনাকে সমর্থন দেয়নি তার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে— হাসিনার সরকার ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দেয়নি, গ্যাস রফতানি করতে অস্বীকার করেছে, এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে নিজেদের ভারতবিরোধী প্রমাণ করতে চেয়েছে, সব থেকে আতঙ্কের ও বিভীষিকার যে বাংলাদেশ সৈন্য বিএসএফ এর ১৬জন জওয়ানকে হত্যা করে পাকিস্তানের ন্যায় ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে— যার দরুণ হাসিনার প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী খুব একটা সদর্থক ছিল না। অন্যদিকে বিএনপির প্রতি ভারতের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায় উঠে এসেছে যে বিএনপি বাংলাদেশে বিরোধী দলে যতটা ভারত বিরোধী অবস্থান নেয় ক্ষমতায় এলে তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এবং এটা সত্য যে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থাকলে ভারত-বিরোধী হতে পারবে না। তাই কৌশলগত ও নিরাপত্তা স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-বাংলাদেশ সরকার ও বিরোধী দল উভয়ের কাছ থেকে নিরাপদ থাকবে।

তবে বাংলাদেশে বিএনপির জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চরমপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিরাপদ বিচরণভূমিতে পরিণত হয় বাংলাদেশ। এ প্রসঙ্গে শর্বরী মুজমদারের লেখা প্রতিবেদনে বলা হয়— ‘ভারত সরকার NLFTর কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, কারণ তারা

ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীন করার জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানে লিপ্ত। NLFT-র মুখপাত্র ইয়ামরুক বলেছেন, খালেদাজিয়া তাদের এই মর্মে আশ্বস্ত করেছে যে, বাংলাদেশে তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থানের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না'। ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ আসাম (ULFA)-র মুখপাত্র রুবি ভুইয়া বলেছিলেন— 'হাসিনার সরকার আমাদের নাজেহাল করেছে। তারা ভারতীয় এজেন্টদের অনুমতি দিয়েছে এদেশে আমাদের উপর হামলা করার জন্য।' বিএনপির বিজয়ে এটাই প্রতিফলিত হয়েছে উলফার প্রতি বাংলাদেশের মানুষ সহানুভূতিশীল; যারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে, যারা জানে আমাদের আকাঙ্ক্ষার কথা— তারা আওয়ামী লীগকে উচিৎ শিক্ষা দিয়েছে।[১৭] আরো বলা যায় যে— আওয়ামী লীগের আমলে উলফা নেতা অনুপ চেটিয়াকে গ্রেফতার করে বিচার করা হয়েছে এবং সাজাও দেওয়া হয়েছে। উলফার সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান পরেশ বড়ুয়াকে হত্যার জন্য চারবার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের মতে আওয়ামী লীগের আমলে পরেশ বড়ুয়া ঢাকা ত্যাগ করে করাচী গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। এখন তিনি আসামের কাছাকাছি থেকে দল পরিচালনা করার জন্য ফিরে আসতে পারেন।[১৮] এইভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী নাগা-মিজো-টিপরা অসমিয়াদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। একদিকে ভারত বিরোধী ইসলামী মৌলবাদী ঐক্য অন্যদিকে জঙ্গী সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর হিসাবে বাংলাদেশ নিজের অস্তিত্বকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করে। তাই NDA সরকারের বিদেশনীতি প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ায়। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের স্বাভাবিক গতি শ্লথ হয়ে দাঁড়ায়।

এইরকম পরিস্থিতিতে ২০০১ সালের ২-৪ই ডিসেম্বর 'কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ড্রাস্ট্রি' এবং 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম' এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'ইন্ডিয়া ইকনমিক সামিট ২০০১' এ বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী এম সইফুর রহমান ভারতে আসেন এবং উভয় দেশের অর্থনৈতিক সহযোগীতা বৃদ্ধি ও বিকাশের ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। এর ঠিক পরেই ১৮-২৯শে এপ্রিল বাংলাদেশের যোগাযোগ সচিব ভারতে আসেন ভারত থেকে লোকোমেটিভ ইঞ্জিন কেনার জন্য এবং ভারত লোকোমটিভ ইঞ্জিন প্রদানে সম্মত হয়। ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগীতা সংস্থা (SAARC) আয়োজিত সাউথ এশিয়া সাব রিজিওনাল ইকনমিক কো-অপরারেশন (SASEC) এর মিটিং এ ভারতের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস দপ্তরের সচিব এবং শক্তিক্ষেত্র দপ্তরের সচিব ঢাকা সফরে যান। বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীদের সঙ্গে বিদ্যুৎ ও শক্তিক্ষেত্রে কিভাবে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগীতা বাড়ানো যায় সে ব্যাপারে গভীর

আলোচনা হয়। এরপর ২২-২৫ শে ডিসেম্বর ভারতের বস্ত্র দপ্তরের সচিব ঢাকা যান পাট শিল্পের ক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগীতা বাড়ানোর জন্য। ২০০০-২০০১ সালে দ্বি-পাক্ষিক বানিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৪৬.০৬ মিলিয়ান মার্কিন ডলারে যা বাণিজ্য ঘাটতিকে খানিকটা মেটাতে সহায়তা করে।

এছাড়া উভয় দেশ শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় সহযোগীতা বজায় রাখে। বহুসংখ্যক বাংলাদেশী ছাত্র ভারতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার জন্য আসে এবং ICCR-র পক্ষ থেকে তাদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থাও করা হয়। উভয় রাষ্ট্রে সরকারী ও বেসরকারী স্তরে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান জোরদার হয় ২০০১ সালে। তাছাড়া এই বছর ৪,০০,৯২২ জন বাংলাদেশী নাগরিককে ভারত ভিসা প্রদানের মাধ্যমে উভয়দেশ যোগাযোগের প্রসার ঘটায়।

২০০২ সালের ২৭-৩১শে জানুয়ারী ঢাকাতে ‘গঙ্গার জল বন্টন চুক্তি ১৯৯৬’ সম্পর্কিত যৌথ কমিটির মিটিং হয় এবং হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পরিদর্শের উদ্দেশ্যে উভয় দেশের আধিকারিকরা মিলিত হন। মার্চ মাসে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের গঠনমূলক আলোচনা ও বাণিজ্যিক সহযোগীতার পুনর্বীক্ষণ সম্পর্কিত একটি আলোচনা ঢাকায় হয়। ভারতের বাণিজ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা সফর করেন। এছাড়াও এই মার্চ মাসে দিল্লীতে দ্বি-পাক্ষিক জলপথ পণ্য পরিবহন ও বাণিজ্য সহযোগীতার পুনর্বীক্ষণ সম্পর্কে সচিব পর্যায়ের আলোচনা হয়। এর আগে ফেব্রুয়ারী মাসে উভয় দেশ ঢাকাতে নিজেদের নিরাপত্তা বিষয় সংক্রান্ত একটি আলোচনা ‘যৌথ কর্মী গোষ্ঠী’র দ্বারা আয়োজিত করেছিল।

২০০২ সালে ভারত তার ‘পূবে তাকাও নীতি’র বাস্তব প্রয়োগ করতে পূর্বের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির লক্ষ্যপূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বছর ১০ই এপ্রিল ভারত বাংলাদেশের ষোল ধরনের উৎপাদিত জিনিসের সঙ্গে সংযুক্ত ৪০টি স্বতন্ত্র দ্রব্যকে শুল্কমুক্ত বলে ঘোষণা করে। যদিও বাংলাদেশ ১৯১ টি দ্রব্যকে শুল্কমুক্ত করার জন্য ভারতের কাছে আবেদন করেছিল এবং তারা বলে যে আমদানী রপ্তানী শুল্কের যে বোঝা তা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যকে ব্যাহত করছে। ভারত ও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার আশ্বাস দেয়।[১৯] এইবছর মে মাসে বাংলাদেশ ইসলামিক মঞ্চ (BIM) প্রতিষ্ঠিত হয় ‘‘বৃহৎ বাংলাদেশ’ গঠনের দাবীকে কেন্দ্র করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ, ভারতের আসাম ও মায়ানমারের আরাকান প্রদেশ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বৃহৎ বাংলাদেশ গঠনের চেষ্টা ও ইসলামীকরণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে উদ্বেগপূর্ণ করে তুলেছিল। ২০০২ সালের জুন মাসে উভয় দেশ মাদক ও অন্যান্য সংযুক্ত দ্রব্যসমূহ চোরাচালান রোধে চুক্তিবদ্ধ হয়। উভয়দেশ মাদক চোরাচালান রোধের জন্য মাদকবিরোধী অপারেশন এবং জাল

নোট পাচার রোধ ও সীমান্তে বে-আইনী অবৈধ চোরাচালান রোধে অপারেশন, প্রযুক্তিগত সহযোগীতা, তথ্য বিনিময় করবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। এবং এইসময় ভারতের NDA সরকার বাংলাদেশের BNP সরকারের সঙ্গে অতি সতর্কতার সহিত সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একজন প্রাক্তন ভারতীয় গোয়েন্দা অফিসারের বক্তব্য অনুযায়ী 'The RAW wielded inordinate Policy influence on Bangladesh at the expense of the Ministry of External Affairs.'[২০]

২০০২ সালের ৭ই নভেম্বর ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী হরিয়ানার বিওয়ানীতে একটি সভাতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে বাংলাদেশে ISI ও আলকায়দার তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গী গোষ্ঠীগুলিকে প্রত্যক্ষ সমর্থন জোগাচ্ছে। এর ঠিক তিনদিন পর ঢাকাতে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশন বা দূতাবাস উক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের কাছে অভিযোগ জানায়। ২৭শে নভেম্বর ভারতের বিদেশমন্ত্রী পার্লামেন্টের লোকসভাতে বলেন যে ঢাকাতে পাকিস্তানের মিশন ISI র দ্বারা ভারত বিরোধী জঙ্গী কার্যকলাপে মদত দিচ্ছে না তবে আলকায়দা বাংলাদেশে শিবির তৈরি করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ বাঙ্গালোরে এক সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেন 'India had intelligence reports and other evidence to buttress those charges'.[২১]

২০০৩ সালে ভারত-বাংলাদেশ দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানাধরনের যে সমস্যা রয়েছে তা সমাধান করে শক্তিশালী সহযোগীতামূলক সম্পর্ক স্থাপনে উভয় দেশ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে। এবং এ বিষয়ে ২৯-৩০ শে মার্চ উভয় দেশের দূতাবাস পর্যায়ে আলোচনা শুরু হয়। পারস্পরিক বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন এবং বিভিন্ন বিষয়ে উভয়দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে ১৯-২২শে মে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী সইফুর রহমান ভারতে আসেন। এর ঠিক পরেই ২০০৩ সালের ১৪-১৫ই জুলাই 'যৌথ অর্থ কমিশনের' ষষ্ঠ বৈঠক ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে দীর্ঘ ছয়বছরের পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীরা মিলিত হয় অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক সহযোগীতাকে আরো দৃঢ় করতে।[২২]

এই ষষ্ঠ 'যৌথ অর্থ কমিশনের' (JEC) বৈঠকে প্রাথমিকভাবে ভারত যে ২০০ কোটি টাকা বাংলাদেশকে দিয়েছিল তা বাংলাদেশ প্রায় খরচ করে ফেলেছে বলে আলোচনা হয়। এছাড়া উভয়দেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ বৃদ্ধি ও পণ্য পরিবহন বিষয়ে সহযোগীতা এবং শিয়ালদহ-

জয়দেবপুর যাত্রীবাহী রেল পরিষেবা স্থাপনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে সচেষ্ট হয়। অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে, তথ্যপ্রযুক্তি ও কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগীতা বৃদ্ধি করতে উভয় দেশ রাজী হয়। এছাড়া বাংলাদেশের স্কুল শিক্ষকদের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও বঙ্গোপসাগরে উদ্ভুত প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রকল্প ভারত গ্রহণ করে। এই বৈঠকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উভয়দেশের মানুষের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন বা People to People Contact যা ঢাকা আগরতলা বাস যোগাযোগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। ২০০৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ভারতের সড়ক পরিবহন ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রী বি সি খান্ডুরী এবং বাংলাদেশের যোগাযোগ মন্ত্রী নজমূল হুদা এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সম্মিলিতভাবে আগরতলা ও ঢাকা থেকে বাস পরিষেবার সূচনা করেন। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে— 'The Agartala-Dhaka link follows the hugely successful existing bus service between Kolkata and Dhaka. The new bus service is expected to become increasingly popular, particularly after certain problems relating to issue of Visas and imposition of travel tax are resolved between the two sides.[২৩]

এইসময় দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে বা Free Trade Agreement (FTA) কে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া ও দরকষাকষি শুরু করা। যা উভয়দেশের বাণিজ্য দপ্তর ২০-২২ শে অক্টোবর করেছিল। কারণ ভারত-শ্রীলঙ্কা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সাফল্য উভয়দেশের বাণিজ্যক্ষেত্রে উদারীকরণ এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করতে তৎপর হয়েছিল। এবং উভয়দেশের অর্থনৈতিক সহযোগীতা মুক্ত বাণিজ্যের প্রতীক হিসাবে উঠে এসেছিল। এই মুক্ত বাণিজ্য বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ উদার অর্থনীতির শর্তাধীন আবহে প্রবেশ করবে। তাই উভয় দেশ মুক্ত বাণিজ্য অনুশীলনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ফলতঃ স্বাভাবিকভাবেই ভারত ও বাংলাদেশের রপ্তানীকারীরা এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক হ্রাসের জন্য বৈঠক বা মিটিং করে এবং গঠনমূলক সহযোগীতার পথ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা চালায়।

এরপর ২০০৩ সালের ২৮-২৯শে সেপ্টেম্বর দীর্ঘ তিন বছর পর উভয় দেশের মন্ত্রী পর্যায়ে 'যৌথ নদী কমিশনের' (JRC) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উভয়দেশ জলবন্টনকে কেন্দ্র করে সহযোগীতার প্রসার এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে উভয়দেশের মধ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ভূ-গর্ভস্থ পানীয় জলের আর্সেনিকগ্রস্থতা দূর করা ও বিপর্যয় মোকাবিলা প্রভৃতি কথাবার্তা হয়। ১৯৯৬ সালের গঙ্গা জলবন্টন

চুক্তির বাস্তবতা নিয়েও পূর্ববীক্ষণ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ এই বৈঠকে ভারতের প্রস্তাবিত নদী সংযোগ প্রকল্প নিয়ে আলোচনার দাবী তোলে। ভারত সেক্ষেত্রে এই প্রকল্প বর্তমানে প্রাথমিক ধারণার স্তরে রয়েছে বলে ব্যক্ত করে।

এইসময়ে সীমান্ত ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে উভয়দেশের সরকারী পর্যায়ে কথাবার্তা চলতে থাকে। ২০০৩ সালের এপ্রিল মাসে BSF ও BDR-এর ডিজি পর্যায়ে যে আলোচনা হয় তাতে উভয়দেশ সীমান্ত পাহারার সময় সমন্বয় বজায় রেখে সীমান্তে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয় তার যৌথভাবে মোকাবিলা করবে বলে উভয়ে রাজী হয়। উভয় দেশ সৈন্যদের মধ্যে যাতে Confidence bulding measures (CBM) গড়ে তোলা যায় তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। এছাড়া ভারতীয় প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সৈন্য প্রশিক্ষণ শিবিরে বাংলাদেশী সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ও ক্রীড়া বিষয়ে পারস্পরিক আদান প্রদানের জন্য উভয়দেশ সম্মত হয়।

আরো বলা যায় যে উভয় দেশ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিক সহযোগীতা বৃদ্ধি করতে তৎপর হয়। বহু বাংলাদেশী ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ভারতে আসে যা ভারত অনুমতি প্রদান করে। এইভাবে উভয়দেশ সু-সম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এইভাবে NDA সরকারের আমলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর স্থাপিত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পর্ক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমসাময়িক সময়ে ভারতের বিদেশনীতিতে যে সমস্যাটি সবথেকে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেটি হল ক্রমবর্ধমান আন্তঃরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দরুন ভারত বিশ্বমঞ্চে সন্ত্রাসবাদ দমনের বহু আবেদন জানালেও তা নিবারণে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। এক্ষেত্রে পশ্চিমী দেশগুলির একপেশে আত্মকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বাছাই করা কয়েকটি দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রের (Rougue State) ওপর তাদের বৃষদৃষ্টি, ভারতকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাই সার্ক এলাকায় এ ব্যাপারে যৌথ প্রয়াস গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কারণ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামীকরণ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘরে পরিণত হওয়া ভারতের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় The RAW expert has identified "Creeping Islamisation of Bangladesh" as source of threat to Indian security.[২৪] এছাড়াও এই সময়ে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ ও অনুপ্রবেশকারী উদ্বাস্তুদের নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করে। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে

ভারতের BSF ১৬২ জন বাংলাদেশীকে আটক করে যারা ভারত হয়ে পাকিস্তানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ভারতে উদ্বাস্তু হিসাবে অনুপ্রবেশ করেছিল। এইভাবে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান অক্ষ সন্ত্রাসবাদ ও উদ্বাস্তু সমস্যাকে জিইয়ে রাখতে তৎপর হয়েছিল।[২৫]

ভারতের NDA কোয়ালিশন সরকার ও বাংলাদেশের খালেদা জিয়া সরকারের আমলে আরেকটি বিষয়কে নিয়ে সম্পর্ক খানিকটা ম্রিয়মান হয়েছিল তা হল নদী সংযোগ প্রকল্পের বাস্তবতা নিয়ে। গঙ্গার জলবন্টনের বিষয়টি গত তিন দশক ধরেই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অন্তরায়। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ব্রহ্মপুত্রের জল। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা থেকে ১৭,৩০০ কোটি ঘনমিটার জল উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের শুখা এলাকায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা বাংলাদেশে আলোড়ন তুলেছিল। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া জাতীয় সংসদে বলেছিলেন— ‘‘ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্প ও দেশে নানা সমস্যা সৃষ্টি করবে। বিপন্ন হবে কৃষি-অর্থনীতি, নদীর নাব্যতা, সুন্দরবনের ভূ-জীব বৈচিত্র্য। বাড়বে নদী জলে ও প্লাবনভূমিতে লবণতার প্রকোপ।’’[২৬] এসব উদ্বেগের কথা জানিয়ে ছিলেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা ২০০৩ সালের ২৮ ও ২৯সে সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে। দিল্লি অবশ্য আশ্বাস দিয়েছিল এই প্রকল্পের রূপরেখা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। পরে এ বিষয়ে ঢাকার সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

নদীর প্রবাহ আন্তর্জাতিক সীমা নিরপেক্ষ। সিন্ধু অববাহিকার জল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করে। অনন্ত ৫৩টি নদী পশ্চিমবঙ্গের সীমা ছাড়িয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ভারতের এই নদী সংযোগ পরিকল্পনা ওইসব নদীর প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করবে। তাই বাংলাদেশের উদ্বেগ ও আশঙ্কা অমূলক নয়। এ কথাও সত্যি যে পৃথিবীর নদী শাসনের ইতিহাসে এই বৃহত্তম প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছে পরিবেশ প্রকৃতির উপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা না ভেবেই। প্রকৃতিতে কোনও উপাদানই উদ্বৃত্ত নয়। নদীর জলের হ্রাসবৃদ্ধি ও প্রকৃতির নিয়ম। বর্ষায় যে আপাত ‘উদ্বৃত্ত’ জল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার বিস্তীর্ণ এলাকাকে প্লাবিত করে সাগরে মেশে তার উপরই বহুলাংশে নির্ভর করে এ অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য। পৃথিবীর দুই শতাধিক নদী অববাহিকা রাজনৈতিক বিভাজনে নানা দেশের অধীন। তাই উজান আর ভাটির দেশের মধ্যে জল ব্যবহারের একটি উভয়ত গ্রাহ্য সূত্র থাকা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক বিধিতে বলা হয়েছে— নদীর জল ভাগাভাগির ক্ষেত্রে অববাহিকার বিভাজনের আয়তনগত ও উভয়দেশে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত বিবেচ্য হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে জল ব্যবহার যেন যুক্তিগ্রাহ্য, সুষম এবং মানব কল্যাণমুখী হয়। এক দেশের প্রকল্প যেন অন্যদেশের পরিবেশ

ও বাস্তুতন্ত্রকে ব্যাহত না করে। এ সব বিধিনিষেধ জলের মতোই তরল কোনও দেশ না মানলে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া নেই।

এই উপমহাদেশে জল এখন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অন্যতম মাধ্যম। দুর্বিষহ খরার সময় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের মানুষ যখন জলের জন্য হাহাকার করেন তখন অন্ন, বস্ত্র-বাসস্থান আর পাকিস্তানের মোকাবিলা করার থেকে তৃষ্ণা নিবারণ সরকারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। শুখা এলাকায় জল দেওয়ার আশ্বাস তাই বদলে দিতে পারে ভোটের সমীকরণ। অন্যদিকে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের জলের দাবী বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। তাই নদী সংযোগ প্রকল্পের বাদানুবাদেরও বিতর্কের নেপথ্যে রয়েছে দুদেশের রাজনৈতিক পরিকল্পনা।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি বাস্তবতা হল আমরা সত্যিই পরস্পর প্রতিবেশী এবং আমরা কাছে থেকেও দূরে। নরম অর্থে, দূরত্বের মানে ‘পরস্পরের প্রতি উদাসীনতা’, তিক্ত অর্থে দূরত্বের মানে ‘পরস্পর বৈরীতা’— তাই এক্ষেত্রে একটা তত্ত্ব হলো বৃহৎ ভারতের বাংলাদেশকে নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। ভারত এখন পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র। পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্যাও সে সামলে উঠতে চলেছে। এখন আমেরিকাও কিছুটা তার পক্ষে। চিনের সঙ্গেও সম্পর্ক খারাপ নয়। সুতরাং বাইরের দিকটা নিয়ে বেশী মাথা না ঘামিয়ে ভারতকে এখন মন দিতে হবে নিজের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিবৃদ্ধির দিকে এবং বর্তমানে ভারত সেটাই করছে। সেখানে বাংলাদেশ অকিঞ্চিৎকর। ভারতের পক্ষে কথাটা কিছুটা সত্য। বাংলাদেশের পক্ষে কিন্তু উল্টোটাই সত্য। বাংলাদেশ কখনওই ভারতের বিষয়ে উদাসীন ছিল না থাকতেও পারেনা। তার নিজের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সামাজিক স্থিতিশীলতা ভারতের ঘটমান পরিবর্তনগুলি দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। বস্তুত পাকিস্তান সৃষ্টির পর এখানে যেমন সৃষ্টি হয়েছিল ভারত বিরোধী লবি, তেমনই বাংলাদেশের জন্মের সময় ভারতের মহৎ সহযোগীতার সূত্র ধরে সৃষ্টি হয়েছিল অন্ধ ভারতপ্রীতি। এই দুইপক্ষের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং ভারসাম্য দ্বারাই নির্ধারিত হয় বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক চালচিত্রের অনেকখানি। দু-দেশের বহিঃসম্পর্কে তার প্রভাব পড়ে।

২০০৪ সালের মে মাসে ভারতের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের নেতৃত্বে সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা বা United Progresive Alliance (UPA) জয়লাভ করে এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকারের (NDA) পতন ঘটে। অন্যদিকে বাংলাদেশে BNP পরিচালিত খালেদা জিয়ার সরকার UPA সরকারের

সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়। তাই ২০০৪ সালের প্রথম কয়েক মাসে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি।

১৯৯৮-২০০৪ এই সময়ে বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্বে ১৯৯৮-২০০১ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনা ওয়াজেদ এর সরকার ভারতের সঙ্গে কৌশলগতভাবে সহযোগী প্রতিবেশী হিসাবে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিল। ভারত-বিরোধী জঙ্গী শিবির ধ্বংস করা, অনুপ চেটিয়াকে গ্রেপ্তার করা, ইসলামী মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও দমন করা হাসিনার সদর্থক বিদেশনীতির সাফল্য। পরবর্তীকালে ২০০১-২০০৪ সাল পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়া ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়নে যতটা না তৎপর ছিলেন তার থেকে ভারত বিরোধী অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে মৌলবাদের হাত শক্ত করেছিলেন। বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গীদের নিরাপদ আশ্রয় প্রদান আলকায়দাসহ ইসলমিক দুনিয়ায় জঙ্গী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহ দান ও আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ, পাকিস্তানমুখী বিদেশনীতি নির্ধারণ, অস্ত্র-মাদক চোরাচালানের স্বীকৃতি প্রভৃতির মাধ্যমে BNP জোট সরকার পাকিস্তানমুখী বিদেশনীতি ও ভারত বিদ্বেষী অবস্থানকে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

অন্যদিকে ভারতে BJP নেতৃত্বে NDA সরকার হিন্দু জাতীয়তাবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে আভ্যন্তরীণ ও বিদেশনীতিতে অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় ‘During the six years of Hindu nationalist BJP and its Hindutva allies ruled India, it turned both bariers into powerful symbols of Party’s Promise to Protect India’s Hindus from what it termed Islamic aggression.[২৭] আরো বলা যায় The BJP ‘embraced a very different set of intellectual preecepts to guide India’s foreign and defence policies’and which clearly impacted on the nature of Indian national security policy during 1998-2004 NDA.[২৮] বাংলাদেশ সম্পর্কে কঠোর বাস্তববাদী বিদেশনীতি অনুসরণ ছিল NDA সরকারের লক্ষ্য। দক্ষিণ এশিয়ায় ভূ-রাজনীতিতে বাংলাদেশের ওপর ভারতের নজর ছিল সন্দেহজনক অবস্থানে। তা সত্ত্বেও কৌশলগত সমঝোতার প্রশ্নে বাজপেয়ীর সরকার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে পরম্পরা ও ঐতিহ্য বজায় রেখেছিল। ভারত তার নিকটতম প্রতিবেশীর উপর ‘ভারতীয় আধিপত্যকে’ অপ্রত্যক্ষভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

NDA সরকারের শেষ পর্যায়ে ২০০৪ সালের ৪-৭ই জানুয়ারী পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে চূড়ান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে SAARC-এর দ্বাদশ সম্মেলন শুরু হয়। এই সম্মেলনে

ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ছিলেন কেন্দ্রীয় আকর্ষণ। তাঁর ভাষণে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষায় ভূটানের স্বতঃপ্রনোদিত সাহায্যের ভূয়সী প্রশংসা, সার্কভুক্ত দেশগুলির গরিবী দূরীকরণের জন্য ভারতের পক্ষ থেকে দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন তহবিলে ১০ কোটি ডলার অনুদান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদলে দক্ষিণ এশীয় ইউনিয়ন স্থাপনের আহ্বান সকলের নজর কাড়ে। এই সম্মেলনে সাত দেশের রাষ্ট্র নেতারা এক ঐতিহাসিক চুক্তিতে সই করেছিলেন। চুক্তির নাম হল সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট বা SAFTA (সাফটা)। এরফলে সাতটি দেশ মিলে তৈরি হবে একটি দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল বা SAPTA যার সময়সীমা ২০০৬ সালের ১লা জানুয়ারী নির্ধারিত হয়। এই চুক্তির ফলে সাতটি দেশের পারস্পরিক বাণিজ্য উদার হবে— একে অন্যের পণ্য আমদানির ওপর (কিছু নির্দিষ্ট ব্যতিক্রম সাপেক্ষে) নিয়ন্ত্রণ তুলে নেবে, আমদানি শুল্ক কমাবে, তা ছাড়াও অর্থনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একে অন্যকে নানাধরনের বিশেষ সুবিধা দেবে। এ পর্যন্ত এই দেশগুলির মধ্যে এক ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা হয় যার নাম সাউথ এশিয়ান প্রেফারেনশিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট (SAPTA)। এইভাবে উদার বাণিজ্যিক সম্পর্কের ভিত্তিতে দেশগুলি ক্রমশ একটি অভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাবে প্রত্যাশা করা যায়। তাই স্বাভাবিকভাবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারীভাবে পরিলক্ষিত হয়।

এইরকম একটি পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কূটনীতির দ্বৈত টানাপোড়েনের মধ্যে অগ্রগতিলাভ করলেও ভারতের সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা সম্পর্কের গতিকে মন্থর করে তোলে। তা সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার অভিভাবক হিসাবে ভারত তার প্রাধান্য বজায় রাখতে তৎপর হয়েছিল।

তথ্যসূত্র

১. Menon B Benugopal— “India China Relations: Critical Issues”in Rajen Harshe and K.M.Seethi (eds.) *Engaging with the world: Critical reflections on Indian foreign Policy*, Orient Longman, New Delhi, 2005, p. 167

২. Tajuddin Muhammad— “Foreign Policy of Bangladesh- Liberation war to Seikh Hasina’(Chapter-V), National Book organisation, New Delhi, 2001, p. 190.

৩. Annual Report- 1999-2000, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, p. 05

৪. Ibid.

৫. Annual Rpeort-2000-2001, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, p. 05

৬. Ibid.

৭. Saeed Amera— “Indian Foreign Policy under BJP” in *Regional Studies*, Vol-XXII, No-02, Spring 2004, Institute of Regional studies, Islamabad, 2004, Pp. 13-14

৮. Dixit J N- ‘Indian Foreign Policy and its Neighbours’ Gyan Publishing House, New Delhi, 2001, Pp. 212-213.

৯. Annual Report-2001-2002, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, p. 03

১০. Op.cit., no-8, p. 216

১১. Kabir Sahariar— “Bangladeshe Sampradayeek Niryatan Ebong Amar Rastradrohita”, Subarna, Dhaka, 2002, p. 88

১২. Ibid, p. 93

১৩. Gokuldas M.V. and Bhattacharya Pinaki— “Bangladesh A Prickly Relationship” in *India and Neighbours year book 2005*, CNF, New Delhi, 2005, p. 103.

১৪. Vorer Kagoj, 3rd Oct, 2001

১৫. *Dainik Janakantha*, 3rd Oct, 2001.

১৬. Op.cit., no-11, p. 112

১৭. Op.cit., no-11, Pp. 50-51

১৮. *Asian Times*, 7th Oct, 2001

১৯. Op.cit., no-13, p. 113

২০. Op.cit., no-13, p. 112

২১. Op.cit., no- 13, p. 101

২২. Annual Report-2003-2004, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, p. 12

২৩. Ibid, p. 4

২৪. Prof. Mahmud Khalid— "Bangladesh Politics : 'us or Them'Syndrome"in *Regional studies*, Vol. XXIV, No. 4, Autumn 2006, Institute of Regional studies, Islamabad, 2006, p. 88

২৫. Swami Praveen— "On a dangerous Journey" in *Frontline*, Vol. 20, No. 5, Mar 1-14, 2003, National Press, Chenni, 2003, p. 123

২৬. Rudra Kalyan— 'Nadi Sanyog Ek Avastab Prakalpa"in *Desh*, Vol-70, No. 24, 17th Oct 2003, ABP Pvt Ltd., Kolkata, 2003, p. 35, 37

২৭. Pocha Jahangir— "India erecting a barrier along Bangladesh border targets terrorism, illegal migration"Globe, Boston, 2004, p. 13

২৮. Orgden Chris— "Norms, Indian Foreign Policy and the 1998-2004 National Democratic Allance" in *The Round Table*, Vol. 99, No. 408, June 2010, Routledge, UK, 2010, p. 311.

তৃতীয় অধ্যায়

UPA-I এবং UPA-II এর আমলে ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক (২০০৪–২০০৯, ২০০৯–২০১৪)

ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতিতে একমেরুকরণের উত্তরোত্তর প্রভাব বৃদ্ধি ভারতের জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, তাই এহেন পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিকাশ নতুনভাবে আন্দোলিত হবে এটাই স্বাভাবিক। ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন UPA-I জোট সর্বাধিক সংখ্যক আসন লাভ করে। যার ফলে ২০০৪ সালের ২২শে মে ড. মনমোহন সিং ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এই সময় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বিদেশমন্ত্রী এম মোর্সেদ খানের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ভারতে প্রেরণ করেন ৩১শে মে থেকে ৪ই জুন পর্যন্ত যার উদেশ্য ছিল ভারতের নতুন সরকারকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো। এই সফরে উভয় দেশ তার নিরাপত্তা স্বার্থকে সুরক্ষিত করা ও দ্বি-পাক্ষিক বিষয় সমূহের ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়। এই প্রতিনিধিদল পুনরায় ৩১শে অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর ভারতে আসে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ত্রয়োদশ দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক সংস্থার (SAARC) শীর্ষ সম্মেলনে ঢাকায় যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এবং উভয় দেশ দ্বি-পাক্ষিক সহযোগীতার ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকাতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ এক্সপার্ট কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে তিস্তার জলবন্টন সম্পর্কে ‘যৌথ টেকনিক্যাল গ্রুপের’ প্রস্তাবকে অনুমোদন প্রদান করা হয়।[১] এছাড়াও এই সময়ে উভয় দেশের BDR ও BSF এর ডিজি পর্যায়ের আলোচনা চলতে থাকে সীমান্ত ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে। সীমান্ত সুরক্ষা ও অপরাধ দমনে উভয়দেশ সীমানা পাহারার ব্যবস্থা করবে আশ্বাস দেয় এবং সীমান্তে শান্তি ও সুস্থিতি বজায় রাখতে তৎপর হয়। এই সময় ভারতের বিদেশ সচীব শ্যাম শারণ বাংলাদেশকে— “a Close friend and a Valued Partner’[২] বলে আখ্যায়িত করেন। ২০০৪ সালের ১৬-১৮ই নভেম্বর বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ভারতে আসেন। এই সফরকালে তিনি ভারতের বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠক করেন এছাড়া CII ও FICCI সঙ্গে ও বৈঠকে বসেন এবং ভারতে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রক তথা FICCIর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে তিনি বক্তব্য উপস্থাপনা করেন।

এই সফরে উভয়দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিশদ আলাপ আলোচনা হয়।

এইসময় নভেম্বর মাসে ব্যাংককে বিমস্টেকের সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেজা জিয়ার সাক্ষাৎ হয় এবং ভারতের স্বরাষ্ট্রসচীব ধীরেন্দ্র সিং দাবী করেন যে বাংলাদেশের মাটিতে ভারত বিরোধী সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শিবিরগুলি পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে তা অস্বীকার করে। তাই ২০০৪ সালের ২২শে নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং গুয়াহাটিতে সংবাদ মাধ্যমের একটি সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেন যে— 'We can choose our friends, but we cannot choose our nieghbours. We have Still not given up hope'.[৩]

২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে CIIএর একটি অর্থনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিতে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী সইফুর রহমান ভারতে আসেন। এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী সহ অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ চট্টগ্রাম বন্দরটি ভারতের উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির পণ্য পরিবহনের জন্য উন্মুক্ত করার সদর্থক মনোভাব পোষণ করে। তৎসঙ্গে মায়ানমার থেকে ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে পাইপলাইন আনার ক্ষেত্রেও ইচ্ছা প্রকাশ করে। অন্যদিকে শিয়ালদহ ঢাকা রেল যোগাযোগ স্থাপনের বিষয়টি খতিয়ে দেখার আবেদন জানায়।[৪]

প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিকে— ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশ প্রভৃতিকে তেল আমদানির খরচ জোগাতে বিদেশী মুদ্রাভাণ্ডার উজাড় করে দিতে হয়। বাংলাদেশের তবুও প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। আর সমস্ত দেশ একথা বিশ্বাস করে যে, প্রাকৃতিক গ্যাসই ভবিষ্যতের ভরসা। কেননা, তেল বা কয়লার মতো শক্তির উৎপাদন ব্যয় সাপেক্ষ তো বটেই, এগুলির ভান্ডারও ফুরিয়ে চলেছে। অন্যদিকে কিয়োটো প্রোটোকলের খাঁড়া সদস্য দেশগুলিকে ২০০৮ আর ২০১২ সালের মধ্যে কমাতে হবে দূষণমূলক গ্যাস নিষ্কাশন। ভারতের মোট শক্তির চাহিদার অর্ধেকটাই এখন কয়লা দিয়ে পূরণ হয়, আর এই চাহিদার প্রায় কুড়ি শতাংশই এখন আমদানির মাধ্যমে মেটাতে হয়। তাই এ সব থেকে নিষ্কৃতির উপায় একটাই— প্রয়োজন প্রাকৃতিক গ্যাস। কিন্তু ভারতের গ্যাসের ভান্ডার নেহাতই সীমিত— তাই গ্যাস আমদানির উপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়। সমস্যা হল উপমহাদেশের রাজনৈতিক সমীকরণ। সেই রাজনৈতিক বাধা অতিক্রম করতে পারলে ভারত-বাংলাদেশ ও পাকিস্তান পরস্পরের

শক্তি সহযোগিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

ভারত চায় বাংলাদেশ থেকে গ্যাস কিনতে, ভারত চায় ইরান বা মধ্য এশিয়া থেকে পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস আমদানি করতে। আবার বিশ্বের তাবড় তাবড় গ্যাস ও তেল কোম্পানী চায় এই ব্যবসায় ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু উপমহাদেশীয় রাজনীতির বন্ধ দরজায় তারাও অসহায় বোধ করে। যেমন হয়েছে বৃহৎ মার্কিন সংস্থা ইউনোক্যালের। এই সংস্থা বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে গ্যাস উত্তোলনের কাজ করছে। কিন্তু সে গ্যাস বিক্রি করার ব্যবস্থা না বাড়লে লাভের অঙ্ক ও বাড়বে না। তাই ইউনোক্যাল প্রস্তাব দিল বাংলাদেশের জাতীয় সংস্থা পেট্রোবাংলাকে- যে এক হাজার তিনশো কিলোমিটার পাইপলাইন পেতে তারা বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাংশে বিবিয়ানাতে অবস্থিত তাদের গ্যাসের খনি থেকে দিল্লিতে গ্যাস সরবরাহ করবে।[৫] ২০০৪ সালে এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল রাস্তায় নামে। তাই স্বাভাবিকভাবে উক্ত প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়।

এরকম আরো একটি প্রস্তাবের দশা হয়েছিল। সেটি হল মায়ানমারের পশ্চিম সমুদ্রতটে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান মেলাকে কেন্দ্র করে। সমুদ্রের তলায় পাইপলাইনের মধ্যদিয়ে গ্যাস আনা ব্যায় সাপেক্ষ, ভারতের প্রস্তাব, মায়ানমারের এই গ্যাস ভারতে আসুক বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের এক বেসরকারী সংস্থা কয়েকবছর ধরে সরকারের কাছে প্রস্তাব রেখেছে। পেট্রোবাংলাকে জড়িয়ে এ কাজে সামিল হতে চায় তারা। কিছু আশার সঞ্চার হলেও তা বাংলাদেশ সরকার অনুমোদন দেয়নি। জাতীয় নিরাপত্তা আর দুদেশের সম্পর্কের উপর এই গ্যাস পাইপলাইনের কী প্রভাব পড়বে, তা ঠিক না বুঝে সরকার এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে অস্বীকার করে। তৎকালীন ভারতের পেট্রোলিয়াম দপ্তরের মন্ত্রী মনিশঙ্কর আয়ার আশা করেছিলেন বাংলাদেশ এই প্রস্তাবে সম্মতি দেবে। ফলে ২০০৪ সালে বাংলাদেশ থেকে গ্যাস আমদানির আশা মেটার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। বাংলাদেশ এ ব্যাপারে দুটি যুক্তি উপস্থাপিত করে— এক, তাদের গ্যাসের ভান্ডার তাদের প্রয়োজনেই লাগবে, এক্ষেত্রে ভারতকে দেওয়ার মত উদ্বৃত্ত নেই। দুই, জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত। আবার বাংলাদেশেই অনেক অর্থনীতিক বা শক্তি বিশেষজ্ঞের ভিন্নমত— তাঁরা মনে করেন, গ্যাস যেহেতু সে দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ, একে বাণিজ্যিক রূপ দিয়েই হতে পারে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন। এছাড়া, পাশের দেশ ভারতে এতবড় বাজার হাতছাড়া করলে আখেরে পস্তাতে হবে— কেননা ভারতের এই বাজার অন্য কোন দেশ দখল করতেই পারে। তবে একথা সত্য যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অনেকগুলি দেশের মধ্যে

নতুন করে শক্তিক্ষেত্রে সহযোগীতার চিন্তা অনেকটাই বেড়েছে।

অন্যদিকে ২০০৪ সালে দীর্ঘ চারবছর পর উভয় দেশের স্বরাষ্ট্র সচীব পর্যায়ের বৈঠক ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সীমান্ত নির্ধারণ, জাতীয় নিরাপত্তা ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও উভয় দেশের নাগরিকদের জন্য ভিসার সরলীকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলাপ আলোচনা হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতীয়দের দুবার প্রবেশ ও বাহিরের মাধ্যমে যে কোন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর বা স্থল বন্দরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করে।

এছাড়াও ২০০৩ সালে 'যৌথ অর্থ কমিশনের' ষষ্ঠ বৈঠক অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশকে অনুদান প্রকল্পে ২৫০ জন শিক্ষককে ভারতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। ২০০৪সালে এই প্রকল্প রূপায়নের দায়িত্বভার নেয় টাটা ইনফোটেক এবং বাংলাদেশ কর্তৃক প্রেরিত শিক্ষকদের ছয় সপ্তাহের একটি কম্পিউটার ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে নয়াদিল্লী। এই বৈঠকে এক্সিম ব্যাঙ্ককে ১৫০ মিলিয়ন ডলার ভারত অনুদান দেয় এবং তার শর্তাবলী উভয় রাষ্ট্র নির্ধারণ করে। উপরিউক্ত অর্থে বাংলাদেশের সড়ক ও রেলপথ পরিকাঠামোর উন্নয়নের কথাও বলা হয়।[৬] ২০০৪ সালে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাংলাদেশের বন্যাতে ভারত ১০০ কোটি টাকা অনুদান দেয় এবং উক্ত অর্থে বাংলাদেশকে খাদ্যশস্য, চিকিৎসা সামগ্রী, পরিকাঠামো সামগ্রী ক্রয় করার কথা বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই অর্থ খরচের ক্ষেত্রে উভয় দেশ বোঝাপড়া করে বা মউ (MOU) স্বাক্ষর করে।

এইভাবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে একদিকে আধিপত্যবাদ, অন্যদিকে ইসলামি উগ্রপন্থার বিকাশ ও বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ক্ষমতাসীন শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের অবক্ষয়কে সূচিত করে।

২০০৫ সালের ৭-৯ই এপ্রিল বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী খন্দকার মোসারফ হোসেন ভারতে আসেন ভারত সরকারও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা আয়োজিত 'মাতৃত্ব, শিশুপ্রসব ও শিশুর স্বাস্থ্য' বিষয়ক এক কর্মশালায় যোগদান করার জন্য। ঐ বছর ১২-১৭ই এপ্রিল BDR ও BSFএর ডিজি পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং উভয় দেশ সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও উভয়ের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার উদ্দেশ্যে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে বোঝাপড়া আবশ্যক বলে মনে করে।[৭] অন্যদিকে এই এপ্রিল মাসেই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে খানিকটা তিক্ততা শুরু হয়। BSF দাবী করে যে ত্রিপুরার ধোলাই জেলার নিকট বাংলাদেশের BDR সৈন্য বাঙ্কার খনন ও অস্ত্রসজ্জা করছে এবং ত্রিপুরার সাবরুম

উপ জেলায় BDR ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে হেলিকপ্টার মহড়া শুরু করেছে। এবং এই বিষয়ে BSF ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে একটি রিপোর্ট পেশ করে উক্ত সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) পক্ষ থেকে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের কাছে একটি প্রতিনিধিদল যায় যারা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সচেতনবার্তা দিয়ে বলেন যে ত্রিপুরা সীমান্তে বাংলাদেশ সৈন্য বাঙ্কার খনন করছে এবং অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করছে। এছাড়া তারা আরও অভিযোগ করেন যে বাংলাদেশে প্রায় ৫০টি ATTF ও NLFT জঙ্গী শিবির রয়েছে যেগুলি সরাসরি BDR-এর আর্থিক সাহায্য ও অনুদান এবং মদতে পরিচালিত হচ্ছে।[৮] এরপরও ২২শে এপ্রিল ত্রিপুরার সাবরুম মহকুমার ছোটখিল এবং মাগরুম ও বেলতোলি আন্তর্জাতিক সীমান্তে BDRএর হেলিকপ্টার আকাশসীমা লঙ্ঘন করে। সমস্যার সূত্রপাত আরো জটিল আকার ধারণ করে লঙ্কাপুরা বর্ডার আউটপোস্টে BSF এর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডার জীনবকুমারকে BDR সৈন্যরা নৃশংস অত্যাচার ও হত্যা করাকে কেন্দ্র করে। ভারত এর তীব্র নিন্দা করলে বাংলাদেশ ভারতের এই অভিযোগ অস্বীকার করে। এক্ষেত্রে চোরাচালানকারী ও BDRএর সমন্বয়ে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। বাংলাদেশ ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলকে টেলিফোন করে এই ঘটনার তদন্তের আশ্বাস দেয়।[৯] পরবর্তী সময়ে ভারত অতিরিক্ত সৈন্য ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন করে এবং সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেয়।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে বলতে হয়— যে দেশের জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভারতের একাত্তরের যুদ্ধে অবতরণ ও পাকিস্তানের দ্বিখণ্ডীকরণের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম— সেই বাংলাদেশ আজ ভারতের রাষ্ট্রবিরোধী উগ্রপন্থীদের বিচরণভূমি! উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু আত্মগোপনকারী নেতা, কর্মী, অনুপ চেটিয়াসহ, বাংলাদেশের নানাস্থানে ডেরা বেঁধে আছেন— এমনটাই ভারতের অভিযোগ। অনুপ চেটিয়াকে প্রত্যপর্ণের বা জঙ্গিদের ডেরা নির্মূল করার অনুরোধ, নয়াদিল্লী বহুবার ঢাকাকে জানিয়েছে, ফল হয়নি কিছুই। এই অবস্থায় ঢাকায় সার্ক সম্মেলনে যোগ দেওয়া নিয়ে, ভারত অন্তত কিছুটা টালবাহানার রাজনীতিও করতে পারত- কিন্তু তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী নটবর সিং সে সবের ধারণা মাড়িয়ে, দুম করে সম্মেলনে যোগ দেবার কথা ঘোষণা করেন।

২০০5 সালের ২০-২৩শে জুন নিউদিল্লীতে ভারত-বাংলাদেশ দূতাবাস পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উভয় দেশের বিদেশ সচিব বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সেগুলি হল জাতীয় নিরাপত্তা, সীমান্তে শান্তি ও মৈত্রী বজায় রাখা, সীমান্তে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ; জলসম্পদ, অর্থনৈতিক

ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে সহযোগীতা; কৃষি, প্রতিরক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিনিময়— প্রভৃতি বিষয়ে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয়দেশের স্বার্থ সুরক্ষিত করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।[১০]

এই বছর ১লা এবং ২রা আগস্ট ভারত-বাংলাদেশ 'যৌথ কর্মী গোষ্ঠীর' তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকাতে। উক্ত বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আরোপিত শুল্ক, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ২০০৫ সালের ৬-৮ই আগস্ট ভারতের বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহের তিনদিনের বাংলাদেশ সফরকে ঘিরে প্রাথমিকভাবে সীমান্তের দুই পারেই কিঞ্চিৎ উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এর আগে একাধিকবার ভারত সফরে এলেও, সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা সরকার দিল্লীর মসনদে আসীন হওয়ার পরে এই প্রথম ভারতের বিদেশমন্ত্রী বাংলাদেশে গেলেন। এই সফরের পূর্বে বিগত কয়েক মাসে বাংলাদেশে ভারত বিরোধী জঙ্গি কার্যকলাপ বৃদ্ধি বা দুই দেশের সীমানা বরাবর বে-আইনী অনুপ্রবেশের ব্যাপারে ভারতের অভিযোগ এবং বাংলাদেশ সরকারের তরফে তা পুরোপুরি অস্বীকার করবার ফলে যে পারস্পরিক চাপান উতোর চলছিল, তার প্রেক্ষিতে নটবরের সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

এই সফরে তাই অনুপ্রবেশ, জঙ্গি তৎপরতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, নদীর জল বন্টন বা গ্যাস পাইপলাইন (মায়ানমার-বাংলাদেশ-ভারত) পাতবার মতো দুই দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচিত হবে, এমনটাই আশা করা হয়েছিল। সেই আশা অনুযায়ী উপরোক্ত বিষয়গুলি কমবেশী দুপক্ষের আলোচনায় ঠাঁই পেলেও আলোচনার পরিণতিতে কিন্তু আদৌ আশানুরূপ বলা চলে না। এই সফরে নটবর সিংহ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পাঠানো আমন্ত্রণপত্র বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে প্রদান করেন। এছাড়া ১০০ বাংলাদেশী ছাত্রের জন্য অতিরিক্ত বৃত্তি প্রদান, ৬০০ জন বাংলাদেশী শিক্ষককে তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৬২০টি কম্পিউটার প্রদানের বিষয় ঘোষণা করেন।

এই সফরের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলাদেশে উত্তরপূর্ব ভারতে তৎপর জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি এবং ইসলামী মৌলবাদীরা যথেষ্ট জামাই আদরে রয়েছে— ভারতের এই অভিযোগকে বাংলাদেশ সরকার পুনরায় খন্ডন করেছে। একইভাবে ভারতে একজন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর উপস্থিতিও ঢাকা মানতে নারাজ। তাই তিক্ততা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলি এই সফরে অমীমাংসীতই রইল।

তাই নটবরের সফরের দিন দশেকের মধ্যেই বাংলাদেশের মোট চৌষট্টিটি জেলার মধ্যে তেষট্টিটিতেই প্রায় একযোগে শ'চারেক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা আবারও প্রমাণ করে দিয়েছে যে, জামাত উল মুজাহিদিন এর মতো সংগঠন সমগ্র বাংলাদেশেই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। পাশাপাশি আলোচিত হয় হরকত উল জেহাদই-ইসলামি বা জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ এর মতো সংগঠনের ভূমিকাও।[১১] আর বাংলাদেশে এদের ক্রমবর্ধমান তৎপরতা শেষ অবধি কিন্তু সেই দেশেরও রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতিকে সুদুরপ্রসারীভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। তাই ভারতের অভিযোগকে বারবার নস্যাৎ করে দিলেও এদের প্রভাবে বাংলাদেশের অধিবাসীদের নিরাপত্তাই আজ এক প্রশ্নচিহ্নের সন্মুখীন।

অন্যদিকে দেশভাগের অনেক আগে থেকেই অর্থাৎ র‍্যাডিক্লিফ সাহেব অতিদ্রুততার সঙ্গে দুই বাংলাকে আলাদা করবার নকশা গড়ে তোলবার পূর্বেই পেটের দায়ে, চাষের কাজে ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের স্বার্থেই দুই পারের মানুষের মধ্যে যাতায়াত ও যোগাযোগ ছিল, নতুনভাবে চিহ্নিত সীমানা তার বিশেষ রদবদল করতে পারেনি। আর এই কারণে পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে সম্প্রতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক। শুধু অর্থনীতিগতভাবেই নয়। পশ্চিমবাংলায় এর রাজনৈতিক প্রভাবও আজ অবশ্যম্ভাবী। ভারতের নির্বাচন কমিশন ভোটকেন্দ্রের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করতে উদ্যোগী হওয়ায় এই সম্ভাব্য প্রভাবের বিষয়টি স্পষ্টতর। তাই ইসলামী মৌলবাদী বা জঙ্গীরা সীমানা পার করে এপারের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করতে সচেষ্ট, এমন প্রসঙ্গকে আপাতত সরিয়ে রাখলেও অনুপ্রবেশের অন্যতর প্রভাবকে উপেক্ষা করবার তেমন অবকাশ নেই।

তাই স্বাভাবিকভাবে অনুপ্রবেশের কারণ যাই হোক না কেন, অনুপ্রবেশের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে ভারত ও বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের দীর্ঘমেয়াদি উন্নতি কার্যত অসম্ভব। অথচ নটবরের সফরে এ ব্যাপারে সামান্যতম অগ্রগতির লক্ষণও নেই। তাই নটবরের সফরকালে শুধুমাত্র বাংলাদেশ সরকার ভারতের যাবতীয় অভিযোগ খতিয়ে দেখবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাই বিদেশমন্ত্রীর এই সফর দুদেশের সম্পর্কের শীতলতাকে সামান্য কমাতে পারলেও বা নভেম্বরে সার্ক শীর্ষ বৈঠকের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর করলেও আপাতত এই সফর থেকে ভারতের প্রাপ্তি নৈরাশ্যময়।

এই বছর ২২-২৩ শে আগস্ট নয়াদিল্লিতে উভয়দেশের মধ্যে একটি বৈঠক হয় সেখানে ভারত

বাংলাদেশের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১৫০ মিলিয়ন ডলার ঋণ প্রদান করে এবং উক্ত অর্থ কিভাবে খরচ হবে তার শর্তাবলী নির্ধারিত করা হয়। এর ঠিক পরের মাসে ৪-৬ই সেপ্টেম্বর ভারতের পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী মনিশংকর আইয়ার ঢাকা সফরে যান মায়ানমার থেকে বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে ভারতে গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের উদ্দেশ্যে। এবং তিনি উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন।

আবার ভারতের প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করেছে। একদিকে, ভারতের উত্তরপূর্বে অবস্থিত সাতটি রাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্ত ভাগ করে নিচ্ছে। অন্যদিকে, নেপাল এবং ভূটানের সঙ্গে ভারতের এযাবৎকালের সুসম্পর্কের জেরে ভীত চিন আবার বাংলাদেশকে একটি ‘বাফার স্টেট’ হিসেবে ব্যবহার করতে যারপরনাই উৎসাহী। বাংলাদেশ নিজেও তার এই কৌশলগত অবস্থানটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। পূর্ববর্তী এনডিএ সরকারের সঙ্গে খালেদা জিয়া সরকারের মোটামুটি সুসম্পর্ক ছিল বলা যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে ইউপিএ সরকারের সঙ্গে খালেদা সরকারের হৃদ্যতা কতটা ছিল, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। এইসময় শেখ হাসিনার উপর হামলাকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ এর সুপারিকল্পিত চাল বলা থেকে শুরু করে—ফারাক্কা বাঁধের জল ছাড়া নিয়ে ভারতের সদিচ্ছা বা অসমের আলফা নেতা অনুপ চেটিয়াকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া নিয়ে টালবাহানা, অনুপ্রবেশ সমস্যার সমাধানে অনীহা, উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলির নেতাদের বাংলাদেশে আশ্রয়দান এবং ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ শিবির চালানো— সবকটি ব্যাপারই ইঙ্গিত করছে যে, বর্তমানে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের তার বেশ উঁচু সুরেই বাঁধা। অবশ্য আগুনে ঘৃতাহুতি এপার থেকেও কিছু কম দেওয়া হয়নি। ‘সার্ক’ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ভারতের আচরণ অনেকটা বড় দাদার মতো। অবশ্য নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই ভারতকে এই অবস্থান নিতে হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই আচরণের পুনরাবৃত্তি বারবার। শেখ হাসিনার প্রতি পক্ষপাতিত্ব তো ছিলই, বাংলাদেশ সরকারের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও তসলিমা নাসরিনের এদেশে বারংবার যাওয়া আসা, প্রতিবেশীকে উপেক্ষা করারই নামান্তর।

২০০৫ সালের শেষভাগে এই অবস্থার যেন একটু পরিবর্তন হয়েছে। কারণটি আর কিছুই নয় প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে, মায়ানমারের ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক গ্যাস সম্ভার থেকে কিছুটা এদেশে আনতে উঠেপড়ে লাগে ভারত সরকার। দক্ষিণ কোরিয়ার দেয়ু ইন্টারন্যাশনাল, ভারতের ওএনজিসি এবং বাংলাদেশের মোহনা হোল্ডিংস—মূলত এই তিনটি কোম্পানী মিলে এই

গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারতে গ্যাস নিয়ে আসার পরিকল্পনা করে।[১২] দীর্ঘ টালবাহানা, বৈদেশিক স্তরে জটিল বোঝাপড়া এবং অর্থনৈতিক হিসেব নিকেশের পর এই ব্যবস্থায় রাজি হয়েছে তিনপক্ষ— মায়ানমার, বাংলাদেশ এবং ভারত। কিন্তু এই সুযোগে নিজের অবস্থান আরও খানিকটা মজবুত করে নিয়েছিল বাংলাদেশ। তারা গোটা ব্যবস্থাটিকে একটি 'প্যাকেজ ডিল' হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে। তাই পাইপলাইন যাওয়ার নিশ্চয়তা দানের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা একগুচ্ছ সুযোগ-সুবিধা দাবী করে বসে। যেমন, নেপালের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য ফ্রি করিডর, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের পথে অন্তরায় স্বরূপ নিয়মগুলির অপসারণ, সীমান্ত রক্তপাত, গঙ্গা-তিস্তা-ব্রহ্মপুত্রের জলবন্টন নিয়ে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলির তাড়াতাড়ি এবং সুষ্ঠু সমাধানের আশ্বাস। তাই তসলিমাকে নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে ভারত চরমপন্থী মনোভাব প্রদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতি নিজের ভূমিকাকে স্পষ্ট করে তোলে। এইভাবে Exchange Policy become a Burgaining Policyতে রূপান্তরিত হয়।

এরপর ২০০৫ সালের ১৮-২১শে সেপ্টেম্বর ভারতের জলসম্পদ মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী 'যৌথ নদী কমিশনের' ৩৬ তম বৈঠকে ঢাকা সফরে যান। এই সফরে বিভিন্ন যৌথনদীগুলির জলবন্টন সম্পর্কে আলোচনা হয়। এছাড়া বাংলাদেশে বন্যা, ভূগর্ভস্থ পানীয় জল আর্সেনিকগ্রস্ত হয়ে পড়া, ভারতের নদী সংযুক্তি প্রকল্পও টিপাইমুখ জলাধার নির্মাণ প্রকল্প প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে উভয় দেশ। এছাড়া ঐ বছর ২৭ এবং ২৮শে অক্টোবর নয়াদিল্লীতে ষষ্ঠ যৌথ স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে উভয় দেশের নিরাপত্তা, সীমান্ত সহযোগীতা, অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ, অপেক্ষামান চুক্তিসমূহ এবং দূতাবাস সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধা নিয়ে আলোচনা হয়।[১৩]

২০০৫ সালের ১২-১৩ই নভেম্বর 'সার্ক'এর ত্রয়োদশ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ঢাকা সফর করেন। এই সম্মেলন ছিল বহু প্রতিক্ষিত। এই সম্মেলনে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ভারতের জঙ্গী যে গোষ্ঠীগুলি বাংলাদেশে শিবির তৈরি করেছে তার ধ্বংসসাধন, ট্রানজিট এবং জলসম্পদ ও শক্তিক্ষেত্রে সহযোগীতা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। তবে এই সম্মেলনের গুরুত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে---- প্রথমত, সোভিয়েত উত্তর দুনিয়াতে যেভাবে বিশ্ব-রাজনীতির গতিপ্রকৃতি পাল্টাচ্ছে, তার জেরে পৃথিবীর নানা জায়গাতেই আঞ্চলিক সহযোগিতা (যেমন ইউরোপে বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে) অন্য মাত্রা অর্জন করেছে এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যিক জোট তৈরি হয়েছে। অতএব সার্ক ও ওই পথের পথিক হবে এটাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিককালে দুই পরস্পর বৈরী প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেই বোঝাপড়া আগের তুলনায় অনেকটাই

বেড়েছে। বেড়েছে নানা কারণে দ্বিপাক্ষিক স্তরে আলাপ আলোচনাও। এমনকী অক্টোবরের ভূমিকম্পের পরিপ্রেক্ষিতে পাক নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের দুর্গম এলাকাগুলিতে আটক দূর্গত মানুষদের ত্রাণের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে ভারত ও পাকিস্তান সম্প্রতি স্পর্শকাতর নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর কয়েকটি পথ আংশিক খোলবার মতো সাহসিকতা ও দেখাতে পেরেছে। এমত অবস্থায় ভারত-পাক তিক্ত সম্পর্ক সার্ক এর ওপরে এতকাল যে কালো ছায়া ফেলেছিল, তাও কিছুটা সরে যাওয়ায় আঞ্চলিক সহযোগীতার পরিবেশ আরও অনুকূল হওয়ার সম্ভাবনাই উজ্জ্বলতর হয়। তৃতীয়ত, এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক মহলও বহু প্রত্যাশিত দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী ছিল। সঙ্গে এই আশাও কিছুটা জেগেছিল যে, সাতটি সদস্য দেশের নাগরিকদের, প্রতিবেশী অন্য দেশগুলিতে যাতায়াতের পথ সুগম হবে। পারস্পরিক যোগাযোগের সুযোগও বাড়বে। সব মিলিয়ে তাই তৃতীয় দশকের সার্ক বিগত দশকগুলির জড়তা কাটিয়ে কিছুটা সচল হয়ে উঠেছে, এমন আশা সঞ্চার হয়েছিল কিছুটা।

কিন্তু শেষ অবধি সম্মেলনের শেষে নৈরাশ্যের পাল্লা যথেষ্টই ভারী। ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক আগের চাইতে ভাল হলেও পাকিস্তানের মদতে ভারতে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের ধারা কিন্তু অব্যাহত। তাছাড়া সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে চাইলে যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন, এই অঞ্চলে এখনও তার অভাব যথেষ্ট। অন্যদিকে ২০০৭ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত সার্ক সম্মেলনে সংগঠনের অষ্টম সদস্য হিসাবে আফগানিস্তান স্বাগত। আলোচনার সঙ্গী হিসাবে স্বাগত চীন এবং জাপানও। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র্য দূরীকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে সার্ককে সফল হতে গেলে প্রতিবেশীদের মধ্যে অবিশ্বাসের দেওয়াল ভাঙতে হবে। না হলে সার্কের এই সম্প্রসারণও শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক বিকাশের কারণ না হয়ে, সার্কভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অধিকতর চাপান উতোরের পথ সুগম করতে পারে। অবিশ্বাসের বেড়া ভাঙবার আরও কয়েকটি পদক্ষেপও ইতিমধ্যে ঢাকায় নেওয়া হয়েছে। তা হল, এক আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা এবং পর্যটনের সুযোগ বাড়ানো। বস্তুত রাষ্ট্রিক স্তরের পাশাপাশি এভাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির নানা ধরনের মানুষজন পারস্পরিক আরও বেশি মেলামেশার সুযোগ পেলেই কিন্তু বিশ্বাসের ভিত গড়ে তোলা সম্ভব। আর সেই ভিতের ওপরেই কেবল গড়ে উঠতে পারে এক সফল আঞ্চলিক সংগঠনের ইমারত। এ প্রসঙ্গে বলা যায়— The 13th SAARC summit in Dacca in April 2006 renewed the commitment to fight terrorism and accepted the Indian position that there could be no double standards in combating terrorism.[১৪]

এই 'সার্ক' সম্মেলনের পর ১৭-২০ শে ডিসেম্বর ভারতের নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল

অরুণ প্রকাশ বাংলাদেশ সফরে যান এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

২০০৬ সালের ৫-৮ই ফেব্রুয়ারী গঙ্গার জলবন্টন সংক্রান্ত যৌথ কমিটির ৩২তম বৈঠক কলকাতাতে অনুষ্ঠিত হয়। এবং ৩৩তম বৈঠক ৩রা মে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠক থেকে ২০০৬এর জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত গঙ্গা থেকে পরিমিত জলবন্টন সম্পর্কিত তথ্য উভয় দেশ যোগাড় করতে সম্মত হয়। যদিও বাংলাদেশ ১৯৯৬এর জলবন্টন চুক্তি মোতাবেক জল ছাড়ার দাবী জানায়। উক্ত সময়ে ৩৬তম যৌথ নদী কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উভয় দেশের জলসম্পদ মন্ত্রীগণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর নজর রাখতে শুরু করেন। যেমন যৌথ দেশের মধ্যে প্রবাহিত নদীর জলপ্রবাহ, নদীর নাব্যতা দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ, পানীয় জল সরবরাহের জন্য জলপ্রকল্প গ্রহণ প্রভৃতির উপর জোর দেন।

২০০৬ সালের ২০-২২ শে মার্চ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ভারত সফরে আসেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর সঙ্গে বৈঠক করেন। উভয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উভয় দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সফরে দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল উভয়দেশের মধ্যে— প্রথমত, নতুন করে বাণিজ্য চুক্তি; এবং দ্বিতীয়ত, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবৈধ পাচার ও মাদক ও উত্তেজনাপূর্ণ দ্রব্যের চোরাচালন বন্ধের জন্য যৌথ সহযোগীতার চুক্তি।[১৫] এছাড়াও উভয়দেশ যৌথ নদী কমিশন, যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন, যৌথ সীমান্ত ব্যবস্থাপনা গোষ্ঠী সম্পর্কে রুটিন বা নিয়মিত কার্যক্রমের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং উভয়দেশ সদর্থকভাবে ধারাবাহিক কার্যক্রমের উপর জোর দেয়। এই সফরকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন—Some important Agreements have been signed and these will provide the right framework for guiding and expanding economic and commercial cooperation between our two Countries.[১৬]

এই বছর ৩-৪ই মে যৌথ শুল্ক গোষ্ঠীর ৩য় বৈঠক হয় ঢাকাতে এবং ৫-৬ ই জুলাই যৌথ বাণিজ্য গোষ্ঠীর ৪র্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আগরতলায়। ২৪-২৭ শে আগস্ট ৭ম স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকাতে। এছাড়া ১৭-২১শে সেপ্টেম্বর উভয়দেশের জলসম্পদ মন্ত্রীগণ সীমান্ত নদীগুলি পর্যবেক্ষণ করে এবং ২৭-২৮শে সেপ্টেম্বর জলপথ বাণিজ্য পরিবহন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির ৭ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে ২০০৬ সালের ৫-ই জুলাই বণিজ্য বিষয়ক যৌথ কর্মীগোষ্ঠীর যে

বৈঠক আগরতলাতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে শুল্কহীন পণ্য ও শুল্কযুক্ত পণ্যের আমদানী ও রপ্তানী বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি যার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৯৩ সালে, কিন্তু ২০০৪ সালের ইসলামাবাদ সার্ক সম্মেলনে তা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। এই SAFTA র মূল উদ্দেশ্য হল সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগীতা বৃদ্ধি করে ভবিষ্যতে দক্ষিণ এশিয়া অর্থনৈতিক গোষ্ঠী তৈরি করা। এই সহযোগীতা স্থাপনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলি— ১) আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্যের ওপর থেকে বিভিন্ন বিধিনিষেধ অপসারণ করে পণ্যের মুক্ত যাতায়াতের ব্যবস্থা করবে, ২) মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলে ন্যায়সঙ্গত (fair) প্রতিযোগীতার অবস্থা সৃষ্টি করবে ও প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমান লাভ নিশ্চিত করবে; (৩) SAFTA কার্যকর করার জন্য বিবাদ মীমাংসা ও মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল পরিচালনার জন্য কার্যকরী সাংগঠনিক অঙ্গ গঠন করবে, ভবিষ্যৎ আঞ্চলিক সহযোগীতা ও পারস্পরিক লাভ বৃদ্ধির জন্য একটা কার্যকরী একটি কাঠামো তৈরি করবে। সার্কের চেষ্টায় আন্তঃসার্ক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শুল্ক এবং অন্যান্য বিধিনিষেধ অনেকাংশে কমে আঞ্চলিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে।[১৭] এক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশ মুক্ত বাণিজ্য অনুশীলনে আলোচনা শুরু করে এবং সহমত পোষণ করে। এবং The Cotton Textile export Promotion Council of India (TEXPROCIL) ঢাকাতে ৯-১১ জুলাই প্রথম ভারতীয় সূতীবস্ত্র ও ফেব্রিক শো এর আয়োজন করে।[১৮] আবার ১৬-১৭ই জুলাই যৌথ সীমান্ত কর্মী গোষ্ঠীর তৃতীয় বৈঠক ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠককে উভয়পক্ষ চিহ্নিত ও অচিহ্নিত সীমানা নির্ধারণ, ছিটমহলগুলির হস্তান্তর, স্থায়ী সীমানা খুঁটি স্থাপন ও ১৯৭৪ সালের স্থল সীমান্ত চুক্তির প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে গভীর আলোচনা হয়। এবং উভয়পক্ষ বার্ষিক বৈঠককে স্থগিত রেখে যৌথভাবে সীমান্ত সমস্যা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের জন্য সম্মত হয়।

২০০৬ সালের ২৪-২৭ শে আগস্ট উভয় দেশের স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের সপ্তম গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকাতে। ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব ঢাকায় গিয়ে বাংলাদেশে অবস্থিত সক্রিয় ভারতবিরোধী জঙ্গি ঘাঁটিগুলি যেগুলি আই এস আই এর মদতে পরিচালিত হচ্ছে তার মানচিত্র সহ তালিকা পেশ করেন। আর প্রত্যুত্তরে বাংলাদেশ সরকার ভারতের মাটি থেকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জঙ্গী তৎপরতা চালানোর পাল্টা অভিযোগ করে। ঘটনাক্রমে এই সফরের কয়েকদিন আগে, দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীদের সভায়, এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন যে বাংলাদেশে ভারতবিরোধী জঙ্গী ঘাঁটি নির্মূল করতে ''ভূটান লাইন' অনুসরণ করা প্রয়োজন। 'ভূটান লাইন' হল প্রতিবেশী কোনও দেশে ভারতবিরোধী জঙ্গি তৎপরতা গুঁড়িয়ে দিতে ভারত সরকারের নেওয়া এ

পর্যন্ত সবচেয়ে সফল হার্ডলাইন। এই পন্থা অনুযায়ী নতুন দিল্লি ভূটানরাজকে দিয়েই সেদেশের সৈন্য ব্যবহার করে, ভূটানের মাটিতে ভারতের বিভিন্ন জঙ্গী গোষ্ঠী বিশেষত অসমের 'আলফা' ও উত্তরবঙ্গে কামতাপুরী সংগঠন 'কেএলও'র দূর্গম ও গোপন ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করেছিল। কিন্তু ভূটান আর বাংলাদেশ এক নয়— আয়তন, জনসংখ্যা, ভৌগোলিক অবস্থান-— সব দিক থেকেই তার গুরুত্ব অনেকবেশী। তাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা পূরণ হওয়া সম্ভব হয়নি।

কিন্তু বাংলাদেশ সরকার মানুন বা নাই মানুন, ভারতের অভিযোগ কিন্তু অত্যন্ত গুরুতর এবং স্পষ্ট। ভারত সরকারের মতে, পাক মদতপুষ্ট যেসব সন্ত্রাসী আগে পশ্চিম সীমান্ত (মূলতঃ কাশ্মীর) দিয়ে ভারতে প্রবেশ করত,তারা এখন নাশকতা চালাবার জন্য কৌশলগতভাবে বেছে নিয়েছে নতুন ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ 'রুট' বা পথ— বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের পূর্ব সীমান্তের চারহাজার কিলোমিটার দীর্ঘ ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্যে ভরা সীমান্ত। সমসাময়িক সময়ে মুম্বাইয়ের ভয়াবহ ট্রেন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, তিন কুখ্যাত জঙ্গী ও যে এই পথেই বাংলাদেশের 'নিরাপদ আশ্রয়ে' ফিরে গেছে, সে ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা একশো শতাংশ নিশ্চিত।

এছাড়া রয়েছে আলফা সহ উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যের নানা গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠী। বাংলাদেশের শিবিরগুলিতে, এইসব গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের আদান প্রদানের সমন্বয় চলেছে। অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ ও সম্পন্ন গোষ্ঠীগুলি, অপেক্ষাকৃত নবীন ও অনভিজ্ঞ গোষ্ঠীদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং তারা এইসব কার্যকলাপ অক্লেশে চালিয়ে যাচ্ছে সীমান্তবর্তী এমন দুর্গম অঞ্চলে, যার ওপর সরকারের প্রায় কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। একদিকে সুদূর পশ্চিম এশিয়ার আলকায়দার মদতপুষ্ট সংগঠন থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গ ও উত্তরপূর্বে সক্রিয় বিভিন্ন মত ও উদ্দেশ্যের, নানা ভাষা ও সম্প্রদায়ের জঙ্গীরা আজ "এক দেহে লীন" হতে চলেছে বাংলাদেশের নিশ্চিত আশ্রয়ে। ভারত চায়, বাংলাদেশ সরকার যেন এইসব ঘাঁটিগুলি অতিদ্রুত বন্ধ করে, সে দেশের অবস্থানরত বিভিন্ন উগ্রপন্থী নেতাদের ভারতের হাতে প্রত্যর্পণ করে। সেইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী চান, সীমান্তে কাঁটাতার লাগিয়ে যতদূর সম্ভব অনুপ্রবেশ রুখতে। পূর্ব পাকিস্তানের সময়ে সীমান্ত সুরক্ষায় যে কড়াকড়ি ছিল, বাংলাদেশ জন্মাবার পর, তা যে অনেকাংশে শিথিল হয়ে একটি সচ্ছিদ্র ও শিথিল সীমান্ত তৈরি হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। সমগ্র সীমান্তটি হয়ে উঠেছে অপরাধ ও সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্য— নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষ ও প্রশাসনের।

একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ভারত, প্রতিবেশী সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের কাছ থেকে জঙ্গীদমনে সহযোগীতা চাইতেই পারে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় যুক্তির ওপরও থাকে বন্ধুত্বের দাবি। আসলে এই বিশ্বায়িত সন্ত্রাসবাদের যুগে একটি কথা বোঝার সময় এসেছে— অপরের ঘরে আগুন লাগলে আহ্লাদিত হওয়ার সুখী সময় এটা নয়, বরং প্রয়োজন আগুন নেভানোর আয়োজন করার। কারণ যে দেশেই জন্মাক, সন্ত্রাসবাদ হল সেই ফ্রাঙ্কেস্টাইন, যা শেষমেষ স্রষ্টাকেও গিলে খায়। ভারতসহ দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাস কবলিত সকল দেশ এই সত্য যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করে, ততই মঙ্গল।

এইসময় খালেদা জিয়ার বৈঠকে উভয়দেশের নিরাপত্তা, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, অবৈধ অনুপ্রবেশ, যৌথ সীমানা এবং যেসমস্ত চুক্তি বাকী রয়েছে ও দূতাবাস সম্পর্কিত সুযোগসুবিধার বিষয়েও আলোচনা হয়। ২০০৫-০৬ সালে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ২১০৬.৭০ মার্কিন মিলিয়ান ডলার। অন্যদিকে ২০০৬ সালে বাংলাদেশে বেগম খালেদা জিয়া সরকারের পতন ঘটে। যার দরুন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক খানিকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু বাংলাদেশে ফকরুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ‘‘তদারকী সরকার’’ গঠিত হওয়ার পর পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হয়। এই সময়ে ভারতের বিদেশনীতি সম্পর্কে বলতে গেলে দেখা যায় যে— Foreign Policy has traditionally as a core ‘national’ function, successful diplomacy towards neighbours, especially in the subcontinent, need a vibrant ‘federal’ component.[১৯] তাছাড়া খালেদা জিয়ার সময়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিশ্লেষণে অধ্যাপক ত্রিদিব চক্রবর্তী বলেছেন— ‘Under the leadership of Khaleda Zia (2001-2006) during this tenure, India-Bangladesh Relations reached its low ebb.”[২০]

কিন্তু ২০০৭ সালে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সঙ্কট ও অস্থিরতা ভারতকে ভাবিয়ে তুলেছিল। কারণ ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির শাসন মেয়াদ শেষ হলে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই ক্ষমতা হাতে তুলে নেয় ইয়াজউদ্দিন আহমেদ পরিচালিত তদারকী সরকার। নির্ঘন্ট অনুযায়ী ২২শে জানুয়ারী ২০০৭ সালের মধ্যে গঠিত হবে পরবর্তী সরকার। কিন্তু নভেম্বর মাসে আওয়ামী লীগ জানায় যে, বর্তমান তদারকী সরকারের উপর তাদের আস্থা নেই; প্রেসিডেন্ট ইয়াজুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে কখনই অন্তবর্তী সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনী প্রচার বা ভোট প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে পারবে না। ইয়াজুদ্দিন বিএনপির প্রতি পক্ষাপতদুষ্ট; এর মনোনয়নেই ২০০২ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি হন। এরপর দু দলের সংঘর্ষে কিছু মানুষ নিহত ও আহত হওয়ার পর ১১ জানুয়ারী ২০০৭ সালে ইয়াজুদ্দিন সরে দাঁড়ান। আর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে অনিবার্য হয়ে ওঠে জরুরী অবস্থা,

নাকচ হয় ২২শে জানুয়ারীর ডেড লাইন। সমস্যার সমাধানে, ইয়াজুদ্দিন তদারকী সরকারের প্রধান মনোনীত করেন বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক এর গর্ভণর ফকরুদ্দিন আহমদকে। এই ব্যবস্থা আওয়ামী লীগও মেনে নেয়। তবে রাজনৈতিক দলগুলির অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও নির্বাচনী বিধির পুনগর্ঠনের দাবী জানিয়ে তদারকী সরকার সামরিক বাহিনীর মদতে দেশের প্রথম সারির প্রায় সকল নেতৃবৃন্দকেই মামলায় জড়িয়ে ইতিমধ্যে জেলে বন্দী করে ফেলে। এবং মজার ব্যাপার এর তত্ত্বাবধানে খুনের মামলায় জড়িয়ে স্বদেশে ব্রাত্য হলেন হাসিনা। প্রবল জনবিক্ষোভ এবং গণমাধ্যমকে চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও করে এই সরকার।

যদিও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ অন্তবর্তী সরকারের এই সমস্ত কাজে অখুশি ছিল না। কয়েকদশক ধরে পালা করে ক্ষমতায় থাকা হাসিনা ও খালেদার দুর্নীতির জেরে অতিষ্ঠ বাংলাদেশবাসীর ইচ্ছাকেই যেন পক্ষান্তরে কার্যে রূপান্তরিত করল ক্ষমতাসীন সরকার। দুরাচার ও দুর্নীতির প্রশ্নে এঁরা কেউ কম নয়। তাই দেশবাসীর কাছে এরা কেউই ‘বেটার অলটারনেটিভ’ নয়। এপ্রসঙ্গে বলতে হয়— However, the reality turned out to be different than Promised. Rampant Corruption, lack of effective governance, Prolonged pitched battled between political opponents and rise in Islamic militancy culminated in military intervention in January 2007.[২১] খালেদার দুই ছেলের বিরুদ্ধে ছিল তোলাবাজি বা বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পে কমিশন নেওয়ার অভিযোগ। তিনি নানাভাবে সবসময়েই দুই ছেলেকে আঁচল চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। এপ্রসঙ্গে বলতে গেলে দেখা যায় যে— Tarique Rehman had been convicted by the united states government as well for taking bribe of $3 miilion from various international companies to award contracts in Bangladesh. Eventually, the US government called for assistance from the law ministry, finance ministry, attorney generals office and Bangladesh Bank to retrieve the bribe money.[২২] অন্যদিকে হাসিনার বিরুদ্ধেও বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের জন্য রাশিয়ার কাছ থেকে ৮টি মিগ-২৯ ফাইটার জেট কেনার সূত্রে ৭০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। হাসিনাসহ লীগ এর নানা শীর্ষস্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে ১২টি আলাদা আলাদা দুর্নীতির মামলা রুজু হয়। জনগণের তরফে ‘পলিটিক্যাল ক্লেনসিং’ এর দাবী তাই অন্যায্য নয়। অতএব, তদারকী সরকারের কার্যক্রমে সেনাবাহিনীর শাসনের অন্ধকারে দিনের স্মৃতির হাতছানি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরও একবার সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের যথেষ্ট সম্ভবনা থাকলেও তাইই স্বাভাবিক। কারণ বাংলাদেশে সামরিক ধাঁচের শাসন পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সুদীর্ঘ

ধারার সাথে অনেকাংশেই সাদৃশ্যপূর্ণ। মধ্যপ্রাচ্যের প্রত্যক্ষ মদতে বাংলাদেশ ঝুঁকেছে ধর্মীয় মৌলবাদের দিকে আর মায়ানমারের সামরিক শাসন এর পরোক্ষ মদতে ও পাকিস্তানের সহায়তায় এগিয়েছে সামরিক শাসনের দিকে। তৃতীয় বিশ্বের সামরিক রাজনীতির প্রভাব বাংলাদেশের মত দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর পড়বে এটা স্বাভাবিক, কিন্তু ভারতের উদ্বেগ এত বেড়ে গেছে এই কারণেই যে, প্রতিবেশী মায়ানামার, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সামরিক অভ্যুত্থান ভারতের সামরিক বাহিনীকে নাড়া না দেয়। এছাড়া অস্থির প্রতিবেশীর দূর্বলতার সুযোগে শক্তিশালী আগ্রাসী রাষ্ট্র যদি এতে হস্তক্ষেপ করে তাহলে ভারতের উদ্বেগ আরও বাড়তে পারে।

অন্যদিকে এইসময় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে তেমন কোনও নীতিগত পার্থক্য না থাকলেও, পরস্পর দুই নেত্রীর ব্যক্তিগত বিদ্বেষই যেন এদের মধ্যে একের পর এক সংঘর্ষের জন্ম দিয়েছে। হাসিনাকে দেশের বাইরে রাখার সিদ্ধান্ত শান্তিরক্ষার স্বার্থে কারণ, হাসিনা দেশে ফিরেই স্বভাববশত উস্কানিমূলক মন্তব্যে জনমনে বিদ্বেষ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবেন। অন্যদিকে খালেদা ও যথেষ্ট ভয়ের কারণ— বিভিন্ন সময়ে বিষাক্ত মন্তব্যে দেশে আগুন জ্বালাতে ও তিনি পিছপা হননি। এহেন পরিস্থিতিতে শান্তিতে নির্বাচনের দিকে এগোনোর জন্যই দুই নেত্রীকে আপাতত দেশের বাইরে রাখার প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় ভারত অস্থিতিশীল প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক দায়িত্বশীলতার পরিচয়ভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে তৎপর হয়।

এবার আসা যাক ২০০৭ সালে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নিখুঁত বিশ্লেষণে। এই বছর ১৯শে ফেব্রুয়ারী ভারতের বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশ সফরে যান এপ্রিল মাসে দিল্লীতে সার্কের সম্মেলন বার্তা দিতে, অন্যদিকে বাংলাদেশের তাদরকী সরকারের প্রধান ফকরুদ্দিন আহমদ কে পরোক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে। এই সফরে ভারত বহু পণ্যের উপর থেকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। এরফলে ২ মিলিয়ান পণ্য 'duty free access' বা বিনা শুল্কে বাংলাদেশ আমদানী করতে পারবে তার অনুমোদন দেয়।[২৩] ২-৪ই এপ্রিল চতুর্দশ সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে বাংলাদেশের তদারকী সরকারের প্রধান ফখরুদ্দিন আহমদ ভারতে আসেন এবং ভারতে সার্ক সম্পর্কিত বিষয়ে মন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক করেন। এইসময় ৩০ এপ্রিল-১লা মে দিল্লীতে দ্বিপাক্ষিক জলপথ পরিবহন ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২৯-৩০ শে মে যৌথ প্রতিনিধিদল ছিটমহলগুলির অবস্থান খতিয়ে দেখে এবং ১৯৭৪ সালের স্থলসীমান্ত চুক্তির বর্তমান যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা করে।[২৪] ২০০৭ সালের ২৬শে জুন উভয়দেশের পণ্যের গুণগত মান নির্ধারণের বিষয়ে BIS ও টেস্টিং

ইনস্টিটিউটের মধ্যে মউ স্বাক্ষরিত হয় ঢাকায়। এবং ২৫-২৬শে জুন বিদেশী দূতাবাস সংক্রান্ত একটি বোঝাপড়া ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়। জুন মাসে ভারতের টাটা গ্রুপ বাংলাদেশে ইস্পাতশিল্পে বিনিয়োগ এবং শক্তিক্ষেত্রে ও পেট্রোরসায়ন শিল্পে বিনিয়োগের প্রস্তাব বিষয়ে মউ স্বাক্ষর করে। এক্ষেত্রে ২.৮বিলিয়ান মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এরমধ্যে ৩০০ মিলিয়ান ডলার খনি উন্নয়নে, ১০০ মিলিয়ন ডলার তৈল উৎপাদন ও উত্তোলন, ৫০০ মি.ড. বিদ্যুৎ প্রকল্প, ১.৫ বি.ড. পেট্রোরসায়ন শিল্প, ৫০০ মি.ড. প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন এর প্রকল্পে ব্যয় হবে।[২৫] ১৬-১৭ই জুলাই যৌথ সীমান্ত কর্মী গোষ্ঠীর তৃতীয় বৈঠক ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হয়। ২১-২২শে জুলাই ভারতের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জয়রাম রমেশ ঢাকাতে ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অফ কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র উদ্বোধন করেন। এই সময় শুল্ক সম্পর্কিত যৌথ কর্মী গোষ্ঠীর বৈঠক নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় ২৫-২৬শে জুলাই। এ সম্পর্কে বলা যায় In July 2007 after prolonged internal discussion, India relaxed the norms of FDI from Bangladesh.[২৬] এই মাসে সার্ক অঞ্চলের যোগাযোগ উন্নয়নের জন্য পরিবহন ও বাণিজ্য পরিকাঠামো নির্মাণে উভয় দেশ তৎপর হয় এবং কলকাতা-ঢাকা যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের নিয়মিত ব্যবস্থা করার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চলাচল শুরু করে।

২০০৭ সালের ২-৩ই আগস্ট নয়াদিল্লীতে দ্বিপাক্ষিক স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মূলত বাংলাদেশে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গীগোষ্ঠীর প্রভাব বৃদ্ধি এবং হুজি ও জামাতই ইসলামীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ভারতের জাতীয় নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে চলেছিল। ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে উক্ত জঙ্গী সংগঠনগুলির যোগ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তাই উভয়দেশ দ্বিপাক্ষিক তথ্য আদানপ্রদান ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে আলাপ আলোচনা করে। এছাড়া ৭-৮ই আগস্ট উভয় দেশের জলসম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক নয়াদিল্লীতে হয় মূলত জলসম্পদের বন্টনকে কেন্দ্র করে। তাছাড়া ২০০৭ এর জুনে বাংলাদেশে ব্যাপক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বন্যা ও সাইক্লোনে বিপর্যস্ত হওয়ার পর ভারত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ১০ মার্কিন মিলিয়ান ডলার ভারত বাংলাদেশকে সাহায্য করে। এছাড়া চাল, গম, গুড়ো দুধ, যার মূল্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা এগুলিও পাঠানোর ব্যবস্থা করে।[২৭] ১৬ই সেপ্টেম্বর উভয় দেশ মউ স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ থেকে ভারত শুল্কহীনভাবে আট মিলিয়ান পিস রেডিমেড পোশাক আমদানী করবে। এই মাসের ২৫-২৭ তারিখ ঢাকাতে তিস্তার জলবন্টনকে কেন্দ্র করে যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে ২৪-২৯শে অক্টোবর ঢাকাতে সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে ভারত ৫০,০০০ টন চাল পাঠায়

এবং নভেম্বরে সাইক্লোন হওয়ার পর ভারত 'অপারেশন সহায়তা' নামে সাইক্লোনে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্য ২০০০০ প্যাকেট তৈরি খাওয়ার, ১০০০০ কম্বল, ৪০০ তাঁবু, ২৪০০০ কেজি ঔষধ পাঠায় এছাড়াও ১০০০০ মেট্রিক টন গম ৬১০০০ মেট্রিকটন পাউডার দুধ পাঠায় ভারত।[২৮] এরপর ১লা ডিসেম্বর ২০০৭ সালে ভারতের বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশ সফর করেন ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার তদারকীর উদ্দেশ্যে। পরিষেবা বৃদ্ধির জন্য নয়া দিল্লি ২০০৮ সালের ১১-১৩ ফেব্রুয়ারী উভয় দেশের মধ্যে বিমান পরিষেবা বৃদ্ধির জন্য নয়া দিল্লিতে চুক্তি হয়।

আবার ভারত বাংলাদেশের তদারকী সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেই অস্থিতীশীল প্রতিবেশীর গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ সালের ১৪ই এপ্রিল দীর্ঘ ৪৩ বৎসর পর পুনরায় 'মৈত্রী' সাফল্য সূচীত হয় কলকাতা-ঢাকা-ট্রেন চলাচলের বাস্তবায়নে। এই মাসে সীমান্ত সমস্যা সমাধানে নয়াদিল্লিতে ডিজি পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ২০০৭এর চতুর্দশ সার্ক সম্মেলনের শুল্কহীন আমদানী রপ্তানী সিদ্ধান্ত ২০০৮ এর এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয়। এছাড়া সার্ক অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার ও জনগণের বিচরণের জন্য উভয়দেশ পরিবহন ব্যবস্থা ও বাণিজ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপ্রদান করে। তাই ২৬-২৭শে মে ঢাকাতে জলপথ পরিবহন ও বাণিজ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির দশম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২৯-৩০ শে মে নয়াদিল্লিতে যৌথ কর্মীগোষ্ঠী যৌথ নিরাপত্তার বিষয়ে আলাপ আলোচনা চালায়।[২৯]

২০০৮ সালের ১৭ই জুলাই বাংলাদেশের বিদেশ সচিব ভারত সফরে আসেন এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। ২০০৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রধান মঈন-উ-আহমেদ ভারতে আসেন পরবর্তীকালে ২৮শে জুলাই-১লা আগস্ট ভারতের সেনানায়ক দীপক কাপুর সামরিক সহযোগীতা বৃদ্ধি ও বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সফর করেন। ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে উভয় দেশের স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক হয় নয়াদিল্লিতে সেখানে ভারত ২০০৭এর হায়দ্রাবাদ বিস্ফোরণের জন্য বাংলাদেশের হুজি জঙ্গীগোষ্ঠীকে দায়ী করে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় Reflecting the stand common during the Khaleda phase the CG rebuffed the allegations saying 'India always looks for a scapegoat whenever such incidents happen there. We will lodge a protest (against the allegation)...the banned organisation (Harkatul Jihad) has no activities for long... It has ceased to operate.'[৩০] ২০০৮ সালের ১৫-২৭শে সেপ্টেম্বর ঢাকাতে দীর্ঘ ২৫ বৎসর পর দ্বিপাক্ষিক জলসীমান্ত নিয়ে

কৌশলগত আলোচনা হয়। অক্টোবরের ৩১ থেকে ২রা নভেম্বর ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জয়রাম রমেশ ঢাকা সফর করেন ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সুবর্ণজয়ন্তী উৎযাপনের উদ্দেশ্যে। এই সফরে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ে আলোচনা হয়। এই সমসাময়িক সময়ে ভারত বাংলাদেশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়ে ওঠে কিছু কারণে। ভারত বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রতিরোধকল্পে ১০০০ মেট্রিকটন গুড়ো দুধ এবং ৪০,০০০ মেট্রিক টন চাল পাঠায় এছাড়া ২৮০০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয় ঘরবাড়ী, শৌচাগার নির্মাণ, ২২ টি টিউবওয়েল বসানো হয় ১১টি সাইক্লোন সিডারে বিধ্বস্ত গ্রামে, এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত ও নাট্যকলা বিভাগের জন্য কলাভবন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করে ভারত।[৩১] যা সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় করে তুলবে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের তদারকী সরকারের কার্যক্রম ও সামরিক শাসনাধীন গণতন্ত্র অস্থির হয়ে ওঠে। জনগণ নির্বাচনের মাধ্যমে পরিত্রাণ চায়। এ প্রসঙ্গে ইমাজউদ্দিন আহমদ এর বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক— তাহল— ...For the democratic use of military power in a state two conditions are absolutely necessary: (a) if the military exists, as they surely will, then they must be subject to civilion control; and (b) the civilians who control the military must temselves be subject to the democratic process. If the two are synthesised, there is no room for alarm, but it is indeed a very, very difficult process.[৩২] এই সময়ের অস্থিতীশীল বাংলাদেশের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্কারের প্রশ্ন জোরদার হয় এ প্রসঙ্গে এলিন লিপসনের মতামত খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তাহলো— Security sector reform cannot close all the profound gaps in political legitimacy that lead to security deficits and violence, but it can make an important contribution to changing behaviours and attitudes concerning the relationship between power and people'. People working in the security sector can develop new skills in understanding the rule of law and in respecting and protecting the rights and poperty of citizens. There need to be confidence building and goodwill among participants in the security sector, and empowerment of parliament and civil society, a process which could be accelarated by international assistance.[৩৩]

যাইহোক অবশেষে বাংলাদেশের তদারকী সরকার পার্লামেন্ট ও উপজেলার জন্য সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ২০০৮ এর ২৯শে ডিসেম্বর ও ২০০৯ এর ২২শে জানুয়ারী নির্বাচনের নির্ঘন্ট স্থির করে। সেই অনুযায়ী নির্বাচনে পার্লামেন্টে ২৯৯ টি আসনের মধ্যে

আওয়ামী লীগ ২৬২টি আসনে এবং বিএনপি ৩২টি আসনে জয়লাভ করে। যাকে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার বলে আখ্যায়িত করা যায়। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় Nowhere, however, is it observed that elections are a sufficient condition of consolidation; yet, as O'Donell argues 'fair elections are the main, if not the only characteristic that certifies countries as democratic before other government and international opinion. This certification has important advantages for countries and for those who govern them'. The institutionalisation of elections is thus an important condition of consolidation. Consolidation also involves behavioural and institutional changes that normalise democratic politics and narrow its uncertainty.[৩৪] এইভাবে শেখ হাসিনার জয়লাভ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সদর্থক বার্তা বহন করে এবং দীর্ঘ সেনাশাসনের পর গণতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব ভারতকে আশ্বস্ত করেছিল। এপ্রসঙ্গে বলতে হয়— The international community also accepted the results and expressed satisfaction on the impartiality of the caretaker goverment and election commission in conducting the polls. The elections were smooth and peaceful.[৩৫] স্বাভাবিকভাবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে নতুন দিক সূচিত হয়।

কারণ নজিরবিহীন ব্যবধানে ভোটে জিতে বাংলাদেশে ক্ষমতায় এলেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ। অবশ্যই এই জয় অপ্রত্যাশিত নয়। অন্তত বাংলাদেশের শেষ বারো বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, সেখানকার মানুষ পরিবর্তনকামী এবং পরিবর্তনের প্রধান অস্ত্র হিসাবে তাঁরা সবসময়ই বেছে নিয়েছেন নির্বাচনকে। তবে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির ফলাফলের ব্যবধানটা হয়তো সত্যিই খানিকটা আশাতীত। কিন্তু তারপর? বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাস বলছে, পরাজিত দল কখনওই হার স্বীকার করতে চায়না। সে দেশে গণতন্ত্র অনেকসময়ই মর্যাদা পায় না। নির্বাচনের ফলাফলকে সরাসরি অগ্রাহ্য করার প্রবণতাও বহুবার দেখা গিয়েছে বাংলাদেশে। এই প্রণবতা ও ঐতিহ্য সদর্থক নয়। উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক বাতাবরণের আঙ্গিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বাংলাদেশের এই নির্বাচন, অন্তত ভারতের দিক থেকে তো বটেই। মুম্বাইয়ে জঙ্গীহানার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-পাক সম্পর্কে যে টালমাটাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের জয়ে অনেকটাই স্বস্তিলাভ করে নয়াদিল্লী। অন্যদিকে এইসময় প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার আগেই শেখ হাসিনা ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশের মাটিকে কোনওভাবেই ভারতবিরোধী সন্ত্রাসের ঘাঁটি হতে দেবেন না তিনি। তবে বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন ও বিপুল ভোটে শেখ হাসিনার মসনদ ফিরে পাওয়ার পরেও

কিন্তু ভাবী সরকারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নয়াদিল্লী। স্বভূমিতে 'প্রো ইন্ডিয়ান' বলে দুর্নাম রয়েছে মুজিব কন্যার, তার উপর এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অন্যতম দোসর ছিল এরশাদের জাতীয় পার্টি। জামাত-ই-ইসলামীর মতোই জাতীয় পার্টির দলীয় ইস্তেহারেও কিছু ধর্মীয় অবমাননা আইন চালু করার কথা বলা আছে। সে কারণে ভারতবন্ধু হয়ে ঘরোয়া রাজনীতি একেবারেই সুবিধে করতে পারবেন না হাসিনা। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের ইস্তেহারে যে 'ভিশন ২০২১' অথবা 'ডিজিট্যাল বাংলাদেশ'এর কথা বলেছিলেন মুজিব কন্যা- তার বাস্তবায়ন কতটা হয়েছে তা বাংলাদেশের জনগণই নির্ণয় করবে।

২০০৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী ভারতের বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ঢাকা সফর করেন। বাংলাদেশে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রথম ভারতের পক্ষ থেকে উচ্চপর্যায়ের সাক্ষাত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। এছাড়া এই সফরে ভারতের বিদেশমন্ত্রী বাংলাদেশের নব নির্বাচিত নেতৃত্বের সঙ্গে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এছাড়া বিদেশমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী প্রভৃতিদের সঙ্গে নিরাপত্তা, যোগাযোগ, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ ও বন্ধন বাড়ানোর বিষয়ে পৃথক পৃথক বৈঠক করেন। মূলত দুটি বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (১) বাণিজ্য চুক্তি, (২) দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ অগ্রগতি ও নিরাপত্তা চুক্তি। এরপর ২১-২৩ শে ফেব্রুয়ারি ভারতের লোকসভার স্পীকার সোমানাথ চ্যাটার্জি ঢাকা সফর করেন বাংলাদেশে 'নবম জাতীয় সংসদ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের' উদ্বোধন করতে। এবং তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাত করেন ও সৌহার্দ্যের বার্তা দেন।

কিন্তু সমস্যার সূত্রপাত হয় ২৫-২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিডিআর-এর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে। সরকার দেশ চালাবে এবং সেনাবাহিনী প্রশাসনের অধীনে থেকে তার নির্দেশমতো দায়িত্ব পালন করবে— এমনটাই স্বাভাবিক। অন্তত গণতন্ত্রের নীতি সেকথাই বলে। কিন্তু বাংলাদেশের বি ডি আর (বাংলাদেশ রাইফেলস্)-এর বিদ্রোহ সেদেশের গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার প্রতি একটি বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছিল। যদিও দেশের নব নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বি ডি আর রক্ষীদের ক্ষোভ প্রশমনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বাংলাদেশের গণতন্ত্র যে আবার সামরিক বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হবে না— তা বলা যায়নি। বি ডি আর-এর সদর দফতর পিলখানায় বি ডি আর ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে যে নৃসংশ হত্যালীলা চলেছিল এবং তা থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে সৃষ্ট ক্ষোভকে প্রশমিত করা দুঃসাধ্য হয়ে

দাঁড়ায়। সেনাবাহিনীর তরফে প্রত্যাঘাতের আশঙ্কা ও গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দৃঢ়তর হওয়ার উপক্রম হয়।

বাংলাদেশে সেই মুহূর্তে শেখ হাসিনার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় গণতন্ত্রকে রক্ষা করা। যথার্থ গণতন্ত্র মানে শুধুমাত্র নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করা নয়, সেখানে আরও কয়েকটি মৌলিক শর্ত যুক্ত থাকে। তার মধ্যে অন্যতম, সামরিক বাহিনীকে অসামরিক প্রশাসনের কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে দলীয় রাজনীতি কোনওরকম প্রভাব পড়তে না দেওয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশে এই শর্তটি বারবার লঙ্ঘিত হয়েছে। এখনও শৈশবকালে আটকে থাকা এই গণতন্ত্রে সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রশাসন তথা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির অস্বচ্ছ সম্পর্কের কথা কারও অজানা নয়। ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উপর সামরিক প্রভাব পড়েছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ রাষ্ট্রকাঠামোর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সে দেশে একাধিকবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সামরিক শাসনের অভ্যুত্থান ঘটেছে। এবারের বি ডি আর বিদ্রোহের নেপথ্যেও রয়েছে সরকার, দল ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর এই 'অশুভ আঁতাত'।

আসলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নয়, বাংলাদেশে সামরিক স্বৈরতন্ত্র বজায় রাখতেই সচেষ্ট কয়েকটি রাজনৈতিক দল, ইসলামী মৌলবাদী সংগঠন এবং সেনাবাহিনীর একটি শ্রেণী। সুষ্ঠু গণতন্ত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তারাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ২০০১ সালে যখন খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসে জামাত-এ-ইসলামির সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গড়েন, তখন থেকেই বাংলাদেশে কট্টরপন্থী ইসলামী মৌলবাদীদের প্রভাব বাড়তে শুরু করে। হুজি, জামাত-উল-মুজাহিদিন, হিজিব-উত-তাহরির-উগ্রবাদী এই জঙ্গী সংগঠনগুলি জাল ছড়ায় গোটা দেশে। কিন্তু সাম্প্রতিক নির্বাচনে শেখ হাসিনার জয় সমস্ত হিসেবনিকেশ উল্টে দিয়েছিল। কারণ তিনি ক্ষমতায় এসে ঘোষণা করেছিলেন— ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা শুরু হবে। তাই কার্যতই বিপদে পড়ে জামাত ও তার দোসর মৌলবাদী সংগঠনগুলি। এই বিপদ থেকেই তারা গণতান্ত্রিক সরকারকে সরাতে তৎপর হয়ে ওঠে।

বি ডি আর বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা স্পষ্ট, অতিমাত্রায় সক্রিয় সামরিক প্রতিষ্ঠান, তা সশস্ত্র পুলিশই হোক বা সেনাবাহিনী, গণতন্ত্রের পক্ষে অনেকসময়ই বিপজ্জনক হতে পারে। ভারতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর আমল থেকেই সেনাকে দাবিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। দেশ প্রতিরক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত হলেও, সেনাবাহিনী সবসময়ই সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকেছে। ফলে

এদেশে সেনাবাহিনীর হাতে প্রভুত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সরকারের বিরুদ্ধে কোনও ধরনের বিদ্রোহ আজ পর্যন্ত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি। তাতে গণতন্ত্রের ভিতও অটুট আছে।

ভারতের পড়শি পাকিস্তানে কখনওই তা সম্ভব হয়নি। সেদেশে প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাবে গণতন্ত্রের সঙ্গে স্বৈরতন্ত্রের লড়াই জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। এরই সাথে যুক্ত হয়েছে সেনাবাহিনী বা গোয়েন্দা দফতরের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সমীকরণ। ফলে রাওয়ালপিণ্ডির সেনা ছাউনি থেকে ক্রমশই ঘন মেঘ এসে জমেছে ইসলামাবাদের আকাশে। দেশশাসন থেকে শুরু করে অর্থনীতি, সব বিষয়েই আজ শেষ কথা বলছে সেনা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আসিফ আলি জারদারিকে সেনাপ্রধান আসফাক পারভেজ কিয়ানির হুমকী!

আবার একথা সত্য যে বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সেনাবাহিনীর মধ্যেও পাকিস্তানের বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর প্রভাব অব্যাহত। পিলখানা বিদ্রোহে পাকিস্তানের ভূমিকা সন্দেহের উর্দ্ধে নয়। কারণ ভারতের মতো বাংলাদেশেও অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারলে আখেরে ওই স্বার্থগোষ্ঠীরই সুবিধা। তবে হাসিনা তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। এবং শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ২০০৮-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ইস্তাহারে যে কথা বলেছিলেন তার বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়এভাবে যে— “Need for good relations with India” as well as to “end the mutual distrust’ এর মাধ্যমে।[৩৬]

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ২০০৯ সালে পুনরায় স্বাভাবিকগতিতে এগিয়ে চলে। ২০০৯ সালের ১২-১৩ই এপ্রিল ভারতের বিদেশ সচিব শিবশঙ্কর মেনন ঢাকা সফর করেন এবং একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত হন। মে মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ রেলওয়ে নিয়ে নয়াদিল্লিতে একটি বৈঠক হয়। জুন মাসে ভারতের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি পরিণিত কাউর নিউইয়র্কে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দীপু মনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই বছর ১৫ই জুলাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং NAM সম্মেলনে ইজিপ্টে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ৯ই জুলাই দীপু মনি কলম্বো যাওয়ার পথে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন নয়া দিল্লীতে। আগস্ট মাসে বাণিজ্য বিষয়ক যৌথ কর্মীগোষ্ঠীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যার উদ্দেশ্য ছিল BIS এর উন্নীত করণ। ২০০৯সালের ৭-১০ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের

বিদেশমন্ত্রী দীপু মনি ভারত সফরে আসেন এবং ভারতের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। এই সফরে সহযোগীতার ক্ষেত্র নির্ধারণ, যোগাযোগ, ট্রানজিট, বিদ্যুৎ, জলসম্পদ ও সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এছাড়া উভয়দেশ সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এছাড়া এই সফরে দীপু মনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম এবং জলসম্পদ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী পবন বনশল এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করে তোলার জন্য।[৩৭] এই সময় অক্টোবর মাসে বাংলাদেশী পণ্য ভারতে আসার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ভারত এমনকী নির্মাণকার্যের জন্য যে ইট ত্রিপুরা থেকে বাংলদেশে সরবরাহ করা হয়েছিল তাতে ২৮ মিলিয়ান মার্কিন ডলার ছাড় দেয় ভারত। এছাড়া এই মাসে বেলোনিয়া সেক্টেরে ফেনী নদীকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসাবে বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এছাড়া এই মাসে যৌথ জলপথ পরিবহন ও বাণিজ্য সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির ১১তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৪-১৫ই নভেম্বর ভারতের বিদেশ সচিব নিরুপমা রাও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ঢাকা সফর করেন এবং বিগত দিনের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্পের পর্যবেক্ষণ ও পুনর্বীক্ষণ করেন। ৩০শে নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর নয়া দিল্লীতে উভয়দেশের স্বরাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় উক্ত বৈঠকের উদ্দেশ ছিল বাংলাদেশে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গী গোষ্ঠীর বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ। ৫-৬ই ডিসেম্বর জলবন্টনকে কেন্দ্র করে কৌশলগত আলোচনা হয় ঢাকাতে।

এই ২০০৯ সালের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ‘টিপাইমুখ’ জলাধারকে কেন্দ্র করে একটি বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। এবং ঢাকাতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের কাছে বাংলাদেশের তরফ থেকে ‘টিপাইমুখ’ জলাধার নির্মাণ সম্পর্কে অভিযোগ আসে। এর পরিপ্রেক্ষিতে The Indian foreign secretary also assured that the proposed project would not harm Bangladesh. The Prime Minister of Bangladesh told the National Parliament on 29th June 2009. That her government was hopeful of solving the controversial Tipaimukh Dam problem through bilateral talks. This has been reciprocated by the Indian Prime Minster when he assured the Bangladesh prime Minsiter “That New Delhi would not take any step regarding their planned Tipaimukh Dam that might effect the bilateral relations between Bangladesh and India. This is, indeed a positive development which would greatly dispel the apprehensions raised by the Bangladeshi side. This is likely to have a colling effect on the recent heated Political relations of the countries.[৩৮]

এইভাবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক খানিকটা শ্লথগতি লাভ করে।

২০১০ সালের ১০-১৩ জানুয়ারী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তিনদিনের জন্য দিল্লী আসেন। বাংলাদেশ পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে নতুনমাত্রা দিতে সক্ষম হয়। ২০০৮ সালে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তাহারে জোর দেওয়া হয়েছিল যে "need for good relations with India, as well as end the mutual distrust".[৩৯] তার প্রতিফলন ঘটে হাসিনার সফরকালে। ১২ই জানুয়ারী দিল্লীর রাষ্ট্রপতিভবনে শেখ হাসিনার হাতে 'ইন্দিরাগান্ধী শান্তি পুরস্কার' তুলে দেন ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতিভা দেবী সিং পাতিল। এই পুরস্কারের কারণ ২০০৯ সালের শান্তি নিরস্ত্রীকরণ ও উন্নয়নে শেখ হাসিনার অবদান। এই সফরকালে শেখ হাসিনার সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এর যেসব বিষয়গুলিতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেগুলি হল— মূলতঃ পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল— (১) অপরাধমূলক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিক আইনগত সহযোগীতা চুক্তি; (২) দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রত্যার্পণ চুক্তি; (৩) আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা সংক্রান্ত চুক্তি; (৪) সংগঠিত অপরাধ ও চোরাচালান রোধ সংক্রান্ত চুক্তি ; (৫) MOU স্বাক্ষরিত হয়েছিল বিদ্যুৎশক্তি ও সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রকল্পে সহযোগীতার। এক্ষেত্রে শেখ হাসিনা কথা দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশের মাটিতে ভারত বিরোধী জঙ্গীদের বিচরণ করতে দেবেন না।

এছাড়াও এই সফরে ভারত বাংলাদেশের রেল পরিকাঠামো উন্নয়ন, বাস পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, ৫০টি নদীর নাব্যতা বাড়ানোর জন্য ড্রেজিং প্রকল্প প্রভৃতিখাতে ১ মিলিয়ান মার্কিন ডলার অনুদান ঘোষণা করে এবং ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। শেখ হাসিনা যখন তিস্তার জল সরবরাহ ও মণিপুরে টিপাইমুখ জলাধার নির্মাণের বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এই দুটি বিষয়ে খতিয়ে দেখার জন্য জলসম্পদ কমিশনের নিরীক্ষণের উপর ছেড়ে দেবার কথা বলেন। এছাড়াও উভয় দেশ বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়, শুল্ক ও উপশুল্ক হ্রাস, টাকার বিনিময়ে রুপির ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিষয়েও আলাপ আলোচনা করে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়—

Both the countries have expressed reservations regarding granting these facilities, not just due to economic considerations but also due to certain Political and security compulsions.[৪০]

এরপর ২৯শে এপ্রিল ভূটানের থিম্পুতে ষোড়শ সার্ক সম্মেলনে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রীর

সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে যৌথ কমিউনিখ প্রয়োগ ও বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন। উভয় দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময় কেন্দ্র হিসাবে ১১ই মার্চ ঢাকাতে ইন্দিরাগান্ধী সাংস্কৃতিককেন্দ্র (IGCC) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কেন্দ্রে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম, নতুন পুস্তকের প্রকাশ, নৃত্য ও কলা ও সঙ্গীত প্রদর্শনী ও প্রতিযোগীতা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী সম্মিলিতভাবে পালনের প্রস্তুতি শুরু হয়। ২০১০ সালে ভারতের CII বাণিজ্য দল ঢাকা সফর করে ১০-১৩ই এপ্রিল এবং উভয় দেশের মধ্যে বোঝাপড়া হয় ভারতের বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি বিপনন প্রভৃতি বিষয়ে। ঐ বছর মে মাসের ২৮-৩১ তারিখ ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নবীন বি চাওলা ঢাকা সফরে যান "Cooperation between Election Commissions of the South Asia Region" এর মিটিংএ যোগ দিতে। এই সময় ২৮-২৯ শে মে বাংলাদেশের জলসম্পদ সচীব মি শেখ মহম্মদ ওয়াজিদ উজ-জামানের আমন্ত্রণে ভারতের মহাগণনা নিয়ন্ত্রক ও পরীক্ষক (CAG) সি আর সুন্দরমূর্ত্তি ঢাকা সফর করেন অ্যাকাউন্টিং অ্যাসোসিয়েশন অফ এশিয়ার সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য।[৪১]

২০১০ সালের ২২-২৪শে জুন কলকাতার ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্টস অরর্গানাইজেশন (FIEO) এর ৩২ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল ঢাকা সফর করে। এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা সংক্রান্ত একটি মিটিং হয়। পরবর্তীসময়ে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি' ঢাকা যায় ও বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র, পোলট্রি ও কারিগরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নয়ন, রসায়ন শিল্প, ঔষধ, প্লাস্টিক ও বস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগ করার ইচ্ছাপ্রকাশ করে। এরপর ১০-১৪ ই জুলাই ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য দলকে নিয়ে মনিশঙ্কর আইয়ার বাংলাদেশ সফরে যান এবং Merchants' Chambers of Commerce & Industry (MCCI) এবং India-Bangladesh Chamber of Commerce and Industries (IBCCI) যৌথভাবে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সহযোগীতার বিষয়ে কাজ করবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

২০১০ সালের ২৬শে জুলাই Power Grid Corporation of India Ltd (PGCIL) এবং Bengaldesh Power Development Board (BPDB) মধ্যে ৩৫ বছরের বিদ্যুৎ সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আগস্ট মাসের ৭ তারিখ ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ঢাকা সফর করেন এবং ১ বিলিয়ন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বাক্ষর প্রদান করেন। এছাড়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, অর্থমন্ত্রী এ.এম.এ মুহিত ও বিদেশমন্ত্রী ডা. দীপু মনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলি অলোচনা ও যৌথ কমিউনিখ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। এই আগস্ট মাসেই চিটাগাং ও খুলনাতে

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শিল্প গড়ে তোলার জন্য ভারতের NTPC ও বাংলাদেশের BPDB চুক্তি স্বাক্ষর করে।

পরবর্তীকালে ২২-২৭শে সেপ্টেম্বর ঢাকাতে বি ডি আর ও বি এস এফ এর ৩২তম "সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়। ১৮-১৯শে অক্টোবর নয়াদিল্লীতে উভয় দেশ নারী ও শিশুপাচার রোধের জন্য প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক করে টাস্কফোর্স গঠন করে। এই অক্টোবর মাসেই বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী কর্ণেল ফারুক খান ভারতে আসেন FICCIর বৈঠকে যোগ দিতে এবং মেঘালয় সীমান্তে ২০০ মিটারের মধ্যে সীমান্ত হাট চালু করার ব্যাপারে উভয়দেশ চুক্তি স্বাক্ষর করে। এছাড়া এই সফরে ভারতের টাটা মোটরস্ এর সঙ্গে বাংলাদেশের আলট্রা মোটরস-এর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত (MOU) হয় গাড়ী তৈরি করার জন্য।[৪২]

ঐ বছরই ১০-১১ই নভেম্বর ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি ত্রিপুরার ছোটখোলাতে— 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান' উদ্বোধন করার জন্য আসেন। এইসময় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সীমান্ত কর্মী গোষ্ঠীর (JBWG) চতুর্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নয়াদিল্লীতে। উভয়দেশ ছিটমহলের প্রকৃত অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। ঐ নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ভারতের ONGCএর একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল আশুগঞ্জের মাধ্যমে ত্রিপুরার পালাটানা বিদ্যুৎপ্রকল্পে জ্বালানী সরবরাহ। ২০১০ সালের ২২-২৫শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান এবং ড. গউহর রিজভী ভারতে আসেন শেখ হাসিনার সঙ্গে এবং ২০১০ এর জানুয়ারীতে ভারতের সঙ্গে যে চুক্তিগুলি হয়েছিল তার প্রয়োগ ও বাস্তবতা খতিয়ে দেখতে। এই সময় বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুকখান ১২ জন বাণিজ্য প্রতিনিধিদল নিয়ে কলকাতা ২৪ তম শিল্প মেলায় যোগদান করেন।

স্বাভাবিকভাবেই দুদেশের মধ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা যখন তুঙ্গে। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পদক্ষেপ ছাড়াও নানা ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার পথে হাঁটার চেষ্টা করে নয়াদিল্লী ও ঢাকা। দীর্ঘদিন পর ২০১১ সালে দুদেশের নদী কমিশনের বৈঠক শুরু হয়। ২০১১ সালের জুন মাসে ভারত ও বাংলাদেশের জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের সচীব পর্যায়ের বৈঠকে তিস্তার জলবন্টন নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি ফেনি, মানু, মুহুরি, খোয়াই, ধরলার মত নদীগুলির ড্রেজিং নিয়েও কথা হয়েছে। তাই জুলাই মাসে সনিয়ার বাংলাদেশ সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ইন্দিরা গান্ধীও শেখ মুজিবর

রহমানের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ দু-দেশের পুরনো রাজনৈতিক যোগাযোগকে ঝালিয়ে নেওয়াই ছিল এই সফরের উদ্দেশ্য। পাশাপাশি কংগ্রেস নেত্রীর মাধ্যমে নয়াদিল্লী এই বার্তা দিতে চেয়েছিল যে— "এই মুহূর্তে এক অগ্নিগর্ভ প্রতিবেশী বলয়ের মধ্যে রয়েছে ভারত। বাংলাদেশের গুরুত্ব ভারতের কাছে সব সময়েই বিরাট। দু দেশের মধ্যে রয়েছে ৪০০০ কিলোমিটারের বেশী সীমান্ত। উত্তর পূর্বাঞ্চলে জঙ্গী নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নেও ঢাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে।"[৪৩]

পাকিস্তান বা চিনের মতো দেশ যাতে বাংলাদেশকে ব্যবহার করতে না পারে, তার জন্য দুদেশের রাজনৈতিক ঐক্যকে স্থায়ী রূপ দেওয়াটা মনমোহন সরকারের লক্ষ্যে পরিণত হয়। হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বাংলাদেশের মাটিকে কাজে লাগিয়েছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই। সেই জমানায় বাংলাদেশের মাটিতে শক্ত ঘাঁটি তৈরি করেছিল, আমাদের আলফা, নাগাল্যান্ডের এন এস সি এন সহ উত্তরপূর্বের একাধিক জঙ্গী গোষ্ঠী। পাশাপাশি আই এস আই এর হাতে তৈরি বাংলাদেশের ইসলামী জঙ্গী গোষ্ঠী হুজি ও যথেষ্ট মাথাব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছিল দিল্লীর।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন আসে এই পরিস্থিতির। একাধিক আলফা জঙ্গীকে গ্রেপ্তার করা ও নয়াদিল্লীকে নানা গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সাহায্য করার মতো বিষয়গুলি তো রয়েছেই, বাংলাদেশের জঙ্গী ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে অভিযান ও শুরু হয়। আই এস আই-এর সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যও এই প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে দরাজভাবে এগিয়ে গিয়েছে নয়াদিল্লীও। সম্পর্ককে সতেজ রাখতে ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন। আর তাই একশো কোটি ডলার ঋণের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রতি আরও নানা সহায়তার হাত বাড়ানোর কথা ভাবা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ থেকে ভারতের মধ্য দিয়ে নেপালে যাতায়াতের জন্য ছাড়পত্রের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে শেখ হাসিনার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মশিউর রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেন।

মনমোহন ঢাকা যাওয়ার আগে আস্থাবর্ধক পদক্ষেপ হিসাবে অন্তত দুটি দ্বিপাক্ষিক সমস্যা স্থায়ীভাবে মিটিয়ে ফেলতে চেয়েছিল নয়াদিল্লী। এক, তিস্তাসহ ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বয়ে যাওয়া নদীগুলির জলবন্টন চুক্তি চূড়ান্ত করা। দুই, ছিটমহলসহ দুদেশের সীমান্তে বসবাসকারী মানুষ ও উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধান করা। সনিয়া গান্ধীর সফর এমনই একটি দিক নির্দেশ করে।

২০১১ সালের প্রাথমিকপর্বে দিল্লী-ঢাকা সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ৭ই

এপ্রিল নয়া দিল্লীতে দুই দেশের সংস্কৃতি সচিব পর্যায়ের বৈঠকে দুটি বিষয় স্থিরিকৃত হয়। এক দিকে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষে যৌথ উৎসবের চূড়ান্ত পরিকল্পনা। আর অন্যদিকে দু দেশের সাংস্কৃতিক চুক্তিকে নতুন মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা। এক্ষেত্রে ভারতের কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি সচিব জহর সরকার এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি সচিব সুরাইয়া বেগম একসুরে বলেন যে দুই দেশই রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার বহন করছে। সুরাইয়া বেগম বলেছিলেন,— "৩০ থেকে ৪০— জীবনের মূল্যবান এই দশটি বছর রবীন্দ্রনাথ কাটিয়েছেন পদ্মার পারের গ্রামগুলিতে। বাউল গানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। মিশেছেন বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে। তার পর যে কাজ করেছেন, আজও তার প্রভাব আমরা অনুভব করি।" জহর সরকারের কথায়, "ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রবীন্দ্রনাথকে আরোও বেশী করে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বাংলার সীমান্তের বাইরেও। বিজ্ঞান, পরিবেশ, সমবায়, ব্যাঙ্কিং বহুক্ষেত্রে তার অবদান রয়েছে। এইসব দিকগুলিকে তুলে ধরা হবে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে।"[৪৪]

যৌথ বিবৃতিতে বলা হয় আগামী ৬ই মে বাংলাদেশে এবং ৭ই মে ভারতে শুরু হবে রবীন্দ্র উৎসব। পর্যটন বিভাগের সহায়তায় ভারত ও বাংলাদেশের একটি 'টেগোর সার্কিট' তৈরি করা হবে, যার মূল নাম হবে 'রবি তীর্থ'। গীতাঞ্জলীর মূল সংস্করণটির অবিকল সংস্করণ প্রকাশ করবে সংস্কৃতিমন্ত্রক। বিভিন্ন রাজ্যের রবীন্দ্রভবনের মানোন্নয়ন, শ্যাম বেনেগাল কমিটির প্রস্তাবিত ছটি রবীন্দ্র-চলচ্চিত্রের ডিভিডি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২০১১ সালের ২২-২৩ এপ্রিল ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী আনন্দ শর্মা ঢাকা সফর করেন এবং ফারুক খানের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতে ৮ মিলিয়ান থেকে ১০ মিলিয়ান পোশাক শুল্কমুক্তভাবে রপ্তানি করার কথা ঘোষণা করেন। এরপরের মাসে ৫-৬ই মে ভারতের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী পরিনীতা কাউর ভারতের উপরাষ্ট্রপতি এম হামিদ আনসারিকে নিয়ে বাংলাদেশ সফর করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশতবর্ষ জন্মোৎসব পালনের জন্য। ৭ই মে ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশী সাংবাদিকদের সাক্ষাৎ করার পর নয়াদিল্লীতে বলেন যে---- কিছু সন্ত্রাসবাদী ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক নষ্ট করবে, এ আমরা কখনই হতে দেব না। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশের কাছ থেকে যতটা সাড়া পাওয়া গেছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তিনবিঘা করিডর ২৪ ঘন্টাই বাংলাদেশী নাগরিকদের ব্যবহার করতে দেওয়ার বিষয়টি নীতিগতভাবে আমরা মেনে নিয়েছি। এর পদ্ধতি ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ভারতের প্রস্তাবগুলি ঘরোয়াভাবেই বাংলাদেশকে জানানো হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর কথায়, ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রী সম্পর্ক সুসংহত করার রাজনৈতিক ইচ্ছা ভারতের আছে এবং ভারত তা কার্যকর করতে সক্ষম। যা গোটা অঞ্চলের পক্ষেই সুখকর হবে।[৪৫] জুন মাসের

মধ্যে উভয়দেশের 'যৌথ সীমান্ত গোষ্ঠী' সীমান্ত সমস্যাকে পুনরায় খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেয় ঢাকাতে। এছাড়া উভয়দেশের সামরিক বাহিনীর প্রধান আধিকারিকগণ যৌথ সামরিক সহযোগীতার বিষয়েও বৈঠক করেন।

২০১১ সালের ৬-৭ই জুলাই ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণ ঢাকা সফর করেন। আবার অন্যদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ হাসিনাকে ফোন করে বলেছেন যে ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি ঢাকা যাচ্ছেন। তাই কৃষ্ণের এই সফরকে বলা যায় আরম্ভের আগের আরম্ভ। সেই সফরে তাই তুলে রাখা হয় তিস্তা চুক্তি থেকে ছিটমহল হস্তান্তর। বাণিজ্য ছাড় থেকে আর্থিক সাহায্য। কিন্তু এসব নিয়ে ঐতিহাসিক ও নাটকীয় ঘোষণাগুলি তুলেরাখা হয় মনমোহন সিংহের সফরের জন্য।

ভারতের তুলনায় বাংলাদেশ আয়তনে অনেক ছোট। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক কৌশলগত ভারসাম্য রক্ষায় ঢাকাকে দিল্লীর প্রয়োজন ষোল আনার উপর আঠারো আনা। তাই মনমোহন দেং জিয়াও পিং এর নীতি অনুসরণ করেছেন। ১৯৭৯ সালে চীনে দেং জিয়াও পিং ক্ষমতায় এসেই দুটি নীতি ঘোষণা করেছিলেন। রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব, আর প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তির সম্পর্ক। এরপর দেং একের পর এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার কাজটি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে শুরু করেন। অবশ্য ভারতের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘদিনের শৈত্য কাটানোর মূল কারিগর ছিলেন রাজীব গান্ধী। ১৯৮৮ সালে রাজীব গান্ধী চিনে গিয়ে সম্পর্কের বরফ গলান। ১৯৮৯ এর মে মাসে দুদেশের মধ্যে তিক্ততা কমাতে গর্বাচেভের সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সমঝোতা (দাঁতাত) করেন দেং। ১৯৯০ সালে ভিয়েতনামের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সারেন। ১৯৭৯-১৯৯০ এগারো বছর ধরে একাধিক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ফিরিয়ে ক্রমে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয় চীন। মনমোহন ও এই নীতি অনুসরণ করতে উদ্যোগী হন। ভারতীয় কূটনীতিকদের বক্তব্য, আমরা এক শান্তিপূর্ণ এলাকা গড়ে তুলতে চাই। এই 'শান্তিপূর্ণ এলাকা' শব্দবন্ধটিও দেং এরই ব্যবহৃত কূটনীতির ভাষা। মনমোহন এখন সব শত্রুতা ভুলে পাকিস্তানের সঙ্গে দ্রুত মৈত্রীর পথে যেতে চাইছেন। শ্রীলঙ্কা থেকে নেপাল সর্বত্র জট ছাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। এবং ভারত বুঝেছিল, বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তি মজুবত না হলে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব আসা কঠিন। দীর্ঘতম সীমান্ত যে রাষ্ট্রের সঙ্গে, তাদের নড়বড়ে অবস্থা মোটেই কাম্য নয় দিল্লীর। তাই আপাত লক্ষ্য ছিল, তাদের মনে ঢুকে থাকা সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অসহিষ্ণুতা দূর করা।

একদিকে চীন, অন্যদিকে পাকিস্তান এমনিতেই ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছিল। এবং ঐসময় হাসিনার চীন সফরে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, চীন অতিসক্রিয় হয়ে বাংলাদেশকে কাছে টানতে চাইছে। ঠিক যেমনটি করেছিল মায়ানমার। এই পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক ভারসাম্য ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে প্রতিমুহূর্তে প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশের।

সেই মতো কৃষ্ণের ঢাকা সফর আলাদা বার্তা বহন করে। এস এম কৃষ্ণ বলেন— ‘‘দুদেশের সম্পর্ক এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমাদের প্রগতিশীল ও বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের সময় এসেছে। ভারত-দুই দেশ ও এই অঞ্চলের স্বার্থে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল ও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে দেখতে চায়।’’[৪৬] কৃষ্ণের এই সফরের তাৎপর্য ছিল মনমোহনের প্রাক-সফর পর্বে চুক্তির খসড়া ও নির্ঘন্ট নির্ধারণ করা। সেই মতো ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণ এবং বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দীপু মনি দুদেশের মধ্যে সম্ভাব্য চুক্তিগুলি চূড়ান্ত করে ফেলেন। শুধু তিস্তা চুক্তি নয়, তিন বিঘার ব্যবহার এবং ছিটমহল হস্তান্তরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। বাংলাদেশ থেকে ভারতের মধ্য দিয়ে নেপাল এবং ভূটান সংযোগকারী বাণিজ্যিক সড়ক তৈরি করা, একশো কোটি ডলার অর্থ সাহায্যের ভিত্তিতে নানা ধরনের প্রকল্প, বাংলাদেশ থেকে বহু পণ্য আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রে ভারত যে নিষেধাজ্ঞা জারী রেখেছিল, তা প্রত্যাহার— এসবই দুদেশের বিদেশমন্ত্রীর আলোচনায় উঠে এসেছিল। বলা যেতে পারে, প্রধানমন্ত্রী সফরে যে চুক্তি হবে, তা কার্যত চূড়ান্ত হয়েছিল এই সফরে। দীপু মনির সঙ্গে বৈঠকের পর কৃষ্ণ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেন। তারপর দেখা করেন রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের সঙ্গে। বৈঠকের পর হাসিনা বলেন— ‘‘আমরা এখন অধীর আগ্রহে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সফরের জন্য অপেক্ষা করছি। দুদেশের মধ্যে আলোচনা ইতিবাচক জায়গায় পৌঁছেছে। আশা করা যায়, প্রধানমন্ত্রীর সফরে তা পূর্ণতা পাবে।’’[৪৭]

এই সফরে দুদেশের মধ্যে দুটি চুক্তি পূর্ববর্তী নথি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। একটি হল, বাংলাদেশ থেকে ভূটান ও নেপালগামী গাড়ি ভারতের মধ্য দিয়ে যেতে পারবে। দ্বিতীয়টি, দ্বি পাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুপক্ষই পরস্পরকে ‘বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ’ বা ‘মোস্ট ফেভার্ড নেশন’ এর মর্যাদা দেবে। তবে তিস্তার জল কে কতটা পাবে তা চূড়ান্ত হয়নি। ফেনি নদীকেও সেই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমন প্রস্তাবও রয়েছে যে, সুখা মরসুমে মোট জলের আশি ভাগ নিজেদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেবে দুই দেশ। বাকি কুড়ি ভাগে কোনও ভাবেই হাত দেওয়া চলবে না। ফেনির জলবন্টন

নিয়েও কথা হয়েছে। আলোচনায় এসেছে মনু, মুহারি, খোয়াই, গুমতি, ধারলা, দুধকুমার নদীগুলির জলবন্টনও। পানীয় জল প্রকল্পের জন্য ফেনির কিছুটা জল নিতে চায় ভারত। এই নিয়ে প্রস্তাবে আপত্তি জানায়নি বাংলাদেশ।

সড়ক ও রেলের মাধ্যমে চট্টগ্রাম থেকে মুঙ্গিয়া পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছে ভারত। বাংলাদেশের আশুগঞ্জ থেকে আগরতলা এবং রামগড় থেকে ত্রিপুরার সাব্রুম পর্যন্ত যোগাযোগ আরও উন্নত করতে চাইছে ভারত। রেলপথে যোগাযোগ চেয়েছিল আখাউড়া থেকে আগরতলা পর্যন্ত। এগুলি নিয়ে বাংলাদেশ নীতিগতভাবে আপত্তি জানায়নি। তবে বাংলাদেশ 'ট্যারিফ কমিশন' তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে, এইসব পথে পরিষেবার জন্য ৪ থেকে ৫০ ডলার পর্যন্ত প্রবেশমূল্য নেবে বাংলাদেশ।[৪৮]

এই সফরে প্রথম দিন থেকে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের জামাত সম্পর্কিত মন্তব্য নিয়ে জবাবদিহি করতে ব্যস্ত ছিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে মনমোহনসিংহ যাই বলুন, তিনি বাংলাদেশের প্রকৃত বন্ধু। তিনি সাংবাদিকদের উত্তরে বলেন— "বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আস্থার কোন ঘাটতি নেই, ঘাটতি নেই এবং কোনও ঘাটতি নেই।" আবার হাসিনা সরকারও প্রধানমন্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্যটি নিয়ে আলোচনা না করে এগিয়েছিল। দীপু মনি বলেন "এগুলো তুচ্ছ বিষয় আমাদেরও একবার এমন হয়েছিল। আমাদের ওয়েবসাইটে এমন কিছু নোট গিয়েছিল, যেগুলো নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনাই হয়নি।এই তুচ্ছ বিষয়গুলো ধরে রাখলে কূটনীতির বৃহৎ প্রেক্ষাপটটাই আমরা হারিয়ে ফেলব।"

এদিকে এই তিনদিনের বাংলাদেশ সফরের শেষে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণ জোর দিয়েছেন নিরাপত্তার উপর। তিনি বলেছেন, ভারত ও বাংলাদেশের উচিত ধর্মীয় মৌলবাদ কট্টরপন্থী কার্যকলাপ ও উগ্রপন্থী আক্রমণ থেকে সতর্ক থাকা। নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়টি জোরদার করা।[৪৯]

এই সফরের তাৎপর্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বাংলাদেশের বিরোধী দলের হরতাল, খালেদা জিয়ার বিদ্বেষ ঘোষণা সত্ত্বেও ভারতের সদর্থক দিক হল। প্রথমতঃ বাংলাদেশ ভারতকে মিত্র হিসাবে দেখতে শিখবে ফলে ভারত-বিদ্বেষের রাজনীতির পালে হাওয়া খানিকটা হলেও কমবে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে কিছু বিশ্বস্ত বন্ধু ভারতের প্রয়োজন এবং সেই বন্ধু প্রতিবেশী হলেই ভালো। দ্বিতীয়তঃ, ভারত-বিদ্বেষ কমলে বাংলাদেশ ভারত-বিরোধী সন্ত্রাসবাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয় নাও থাকতে পারে।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের জলপথ বিনা বাধায় ব্যবহারযোগ্য হলে ভারতের উত্তর-পূর্বের চির অবহেলিত রাজ্যগুলিতে পৌঁছবার কাজটি সহজ হবে। শেষতঃ সঙ্কটে বাংলাদেশকে বরাভয় দেন কৃষ্ণ।

২০১১ সালের ২৪ সে জুলাই ভারতের সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা সরকারের সভানেত্রী সনিয়া গান্ধী ঢাকা সফর করেন। এই সফরের উদ্দেশ্য হল— ৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা সম্পর্কিত সম্মান প্রদান করে বাংলাদেশ যাকে 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা পদক' বলে। এছাড়াও তিনি একটি প্রতিবন্ধী সম্মেলনে যোগ দেন ২৫ শে জুলাই। এই বিষয়ে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দীপু মনি বলেন— ''সনিয়া গান্ধীকে বাংলাদেশের মানুষ সম্মান করেন। তাঁর শাশুড়ী প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী '৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাংলাদেশের মানুষের কাছে তিনি এক শ্রদ্ধেয় চরিত্র। সেই গান্ধী পরিবারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতেই তিনি এসেছেন।''[৫০]

এই সময়কালে আলফা নেতা পরেশ বরুয়ার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার চার্জশিট পেশ ও নিষেধাজ্ঞা জারী, অনুপ চেটিয়াকে প্রত্যর্পণের ব্যাপারে ঢাকার সদর্থক পদক্ষেপ, ইলিশ আমদানীকে কেন্দ্র করে ভারতের দাবী, বন্ধুত্বের সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দিতে বে-আইনী ভাবে দখল করা ২৬১ একর জমি ভারতকে ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে বাংলাদেশ। এসব কারণে সম্পর্কের সবুজ দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

এরপর ২০১১ সালের ২৯-৩০ শে জুলাই ভারতেরস্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম ঢাকা সফর করেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষা ও অপরাধ দমনে সহযোগীতা নিশ্চিত করতে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে দু দেশের সরকার।[৫১] ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম ও বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনের উপস্থিতিতে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন দুদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধানরা। চিদাম্বরম বলেন, এই চুক্তিতে ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষার কাজ অনেক সহজ হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা যায় যে, এই চুক্তিতে মানুষ পাচার ও অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান বন্ধে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কয়েকটি জায়গায় যৌথ টহলের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

চিদাম্বরমের সফরে শেখ হাসিনা সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের সম্পর্ক আরো একধাপ এগিয়ে যায়। সেই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সীমান্ত সমস্যা দ্রুত মেটানোর চেষ্টা চালায় দুদেশের সরকার। ছিটমহলগুলির জনগণনা শেষ করে জানা যায় যে ৫১ হাজার মানুষ বসবাস করে। এক্ষেত্রে

ছিটমহলের বাসিন্দারাই স্থির করবেন তাঁরা কোন দেশের নাগরিক হতে চান। এই সফরে চিদাম্বরম বলেন যে সীমান্তে নিরস্ত্র বাংলাদেশীদের প্রাণহানি রুখতে বি এস এফ কে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাহারা খাতুন ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিদেশমন্ত্রী দীপুমনির সঙ্গে দেখা করেন চিদাম্বরম। যাত্রীদের হয়রানি বন্ধে ঢাকা-কলকাতা ট্রেনের মধ্যেই যাত্রীদের নথিপত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে চিদাম্বরমকে অনুরোধ করেন হাসিনা। চিদাম্বরম জানান বিষয়টি খতিয়ে দেখবে ভারত। বাংলাদেশের জেল থেকে ৫৯ জন ভারতীয় বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে জানায় বিদেশমন্ত্রক।

২০১১ সালের ২৭শে আগস্ট পেট্রাপোল বেনাপোল 'সুসংহত চেকপোস্ট' এর শিলান্যাস হয়। চিদাম্বরম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— ''আমরা চাই বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করতে। আমরা বাংলাদেশকে ভীষণ ভালবাসি। ইনসাল্লাহ্ রোজার মাসে এই প্রকল্প একটা ভাল কাজ। আমি এখানে আমরা হৃদয়টা ইন্দো-বাংলাদেশের জন্য বাজি রেখে গেলাম। আমি দেখতে চাই, বাংলাদেশ হাসছে। পশ্চিমবঙ্গও হাসছে। জয় হোক ইন্দো-বাংলাদেশ মৈত্রীর।''[৫২]

২০১১ সালের ৬-৭ই সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ঢাকা সফরে যান। সঙ্গে ছিলেন আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীরা, বারো বছর পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক সফরে ঢাকায় পদার্পণ করেন। তার অভ্যর্থনায় উনিশটি তোপ ধ্বনি হয়। হজরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গার্ড অফ অনার দিয়েছিল তিন সেনাবাহিনী। প্রোটোকল ভেঙে দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাগত জানিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ও তার স্ত্রী গুরুশরন কৌরকে। বিমানবন্দরের চারদিকে শোভা পাচ্ছিল মনমোহন আর হাসিনার বিশাল বিশাল রঙিন ছবি। কিন্তু ঘটনা হল, যে সফরে কথা ছিল, মনমোহন আসবেন, দেখবেন এবং জয় করবেন তিস্তা তার সুর কেটে দিয়েছিল।

এতদিনের আলাপ আলোচনার পরও তিস্তা চুক্তি কেন হলনা, সেটা জানতে ভারতের হাইকমিশনারকে ডেকে পাঠান বাংলাদেশের বিদেশসচিব। চুক্তি না হওয়ায় অসন্তোষও প্রকাশ করেন তিনি। এমনকী মনমোহন ঢাকায় পৌঁছানোর আগেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিদেশ সংক্রান্ত উপদেষ্টা গওহর রিজভি বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যে এলেন না, তাতে আমরা হতাশ। প্রধানমন্ত্রীর কাছ

থেকে জানতে চাইব, কেন এমন হল।"[৫৩] তিস্তা চুক্তি না হওয়াটা বাংলাদেশের মননে ভারত বিরোধী অনুভূতি উস্কে দিয়েছে। তিস্তার জলের দাবীতে ৬ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের সব নদীতে নৌকা মিছিল হয়েছিল। সেই মিছিলে ফেস্টুন উঠেছে, 'তিস্তার ন্যায্য পানির দাবী, ভারতের কাছে ন্যায্য দাবী।'

পশ্চিমে আফগানিস্তান-পাকিস্তানে যেটা করতে পারেননি, পূর্বে নেপাল-ভূটান-বাংলাদেশকে নিয়ে আঞ্চলিক অক্ষ তৈরির কাজ এই সফরে করতে পারবেন বলে ভেবেছিলেন মনমোহন। সেটা যে পুরোপুরি ভেস্তে গিয়েছে তা নয়। আগামীদিনে তিস্তাচুক্তি হবে না এমনটাও নয়। কিন্তু এই সফরে হলে ঢাকায় বিজয় উৎসব সূচিত হতো। তবে তিস্তা চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত দুদেশের সম্পর্কের সেই উষ্ণতা যে ফিরবে না, সেটা বিলক্ষণ বুঝতে পারছিলেন ভারতের কূটনৈতিক মহল। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনুকূলে আনার জন্য দিনভর প্রয়াস চালিয়েছিলেন ভারতের কূটনীতিকরা। মনমোহন প্রকাশ্যেই বলেন তিস্তা চুক্তি করতে ভারত বদ্ধপরিকর। তবে বিদেশ সচীব রঞ্জন মাথাই বলেন— এই চুক্তি হবে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সম্মতিতেই।

তিস্তা জলবন্টন চুক্তি আপাতত স্বাক্ষরিত না হলেও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের দুই দিনের বাংলাদেশ সফর ব্যর্থ হয়নি। দ্বি-পাক্ষিক অন্য বিষয়গুলি নিয়েও বাংলাদেশের সঙ্গে সে সব বোঝাপড়া প্রস্তাবিত ছিল, সেগুলি সম্পাদিত হয়েছিল। যেমন— (১) ছিটমহলগুলি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে যে দীর্ঘদিনের বিরোধ তা এবার স্থায়ীভাবে মীমাংসিত হয়। চুক্তি হল ১৬২টি ছিটমহল হস্তান্তর নিয়ে। বাংলাদেশীদের যাতায়াতের জন্য তিনবিঘা করিডোর ২৪ ঘন্টা খুলে রাখতে সম্মত হল ভারত। স্বাক্ষরিত হল সীমান্ত চুক্তিও। দেশভাগ তথা স্বাধীনোত্তর পর্ব থেকে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ২৯৭৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তে এই বিরোধগুলি অমীমাংসিত ছিল। কখনও কখনও এইসব দ্বন্দ্ব বড় আকার ধারণ করেছে তারফলে দ্বিপাক্ষিক কূটনীতিতে শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত থেকেছে। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবর রহমানের আমলে এই বিরোধ মিটিয়ে ফেলার চুক্তি প্রস্তাবিত হয়। কিন্তু আততায়ীদের গুলিতে মুজিবের হত্যার পর মীমাংসার প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায়। মনমোহন সিং এবং শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বরাবরের জন্য এই বিরোধের কাঁটা উপড়ে ফেলতে সচেষ্ট হয়েছেন। সেই হিসেবে এই চুক্তির তাৎপর্য কম নয়।

২) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে পণ্য চলাচল বিষয়ে ঢাকার সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। তবে পরিকাঠামো নির্মাণের কাজটি সম্পূর্ণ হলে ভারত উপকৃত হবে।

৩) একইভাবে বাংলাদেশ ও নেপাল ভূটানের মধ্যে পণ্য আমদানি-রফতানির জন্য ভারতের সড়ক পথ খুলে দেওয়ার চুক্তি হয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশ লাভবান হয়।

৪) বস্ত্রশিল্পের জন্য খ্যাত বাংলাদেশের ৪৬ রকম বস্ত্র ভারতে বিক্রয় করতে এখন থেকে আর কোন আমদানি শুল্ক লাগবে না। ঢাকা এই মর্মে যে অনুরোধ করেছিল, নয়াদিল্লী তা রক্ষা করেছে।

৫) বিদ্যুৎ সঙ্কটে দীর্ণ বাংলাদেশকে সাহায্য করতে সে দেশের জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রীডকে ভারতীয় গ্রীডের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পাশাপাশি খুলনায় ১৩০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রও ভারতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নির্মিত হওয়ার চুক্তি হয়।

৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগীতা ক্ষেত্রে মউ স্বাক্ষরিত হয়।

৭) ভারতের দূরদর্শনের সঙ্গে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সহযোগিতার বিষয়ে মউ স্বাক্ষরিত হয়।

৮) দুইদেশের মৎস উৎপাদন, অরণ্য সংরক্ষণ ও ব্যাঘ্র সংরক্ষণ (সুন্দরবন অঞ্চলে) এবং জাতীয় ফ্যাশন ইনস্টিটিউটগুলির মধ্যে সহযোগিতা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।[৫৪]

প্রকৃতপক্ষে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগীতা বহুমুখী ও বহুমাত্রিক গুরুত্ব লাভ করে। দুইদেশের সহযোগিতা নিবিড় করে তোলার সচেতন প্রয়াস অভূতপূর্ব বললে অত্যুক্তি হয় না।

জলের প্রশ্নেও অগ্রগতি হয়েছে। মোট ৫৪টি নদী দুই দেশের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত। ১৯৯৬ সালে গঙ্গার জলবন্টন নিয়ে বিরোধের মীমাংসা হয়েছে। তিস্তার জলবন্টন নিয়ে শেষপর্যন্ত বিরোধ উপস্থিত হলে ফেনীর জল ভাগাভাগি নিয়েও ঢাকা বেঁকে বসে, বাকি একান্নটি নদীর জল ভাগাভাগি নিয়ে চুক্তির কোন অসুবিধা হয়নি। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া জঙ্গীদের নয়াদিল্লীর হাতে তুলে দিয়ে ঢাকা বোঝাতে চেয়েছিল যে, বাংলাদেশের মাটিতে ভারত-বিরোধী তৎপরতার নিরাপদ ঘাঁটি করে তুলতে সে আগ্রহী নয়। সেই শুভেচ্ছার অভিব্যক্তি হিসাবে নয়াদিল্লীর পক্ষ থেকে সম্পর্ক আরো বন্ধুত্বপূর্ণ করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তিস্তা চুক্তি ভুন্ডুল হয়ে গেলেও সেই উদ্যোগ অব্যাহত। নয়াদিল্লী হয়তো চুক্তি করতে গিয়ে প্রতিবেশীর প্রতি একটু বেশী উদার হয়েছিল। বাংলাদেশকে একটু বেশি ছাড় দেওয়া হচ্ছে— এমন অভিযোগ উত্তরপূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে উঠে আসছিল। কোন কোন রাজ্যে চুক্তির প্রতিবাদে বন্ধ পালিত হয়েছে। কিন্তু যে বড় তাকে সর্বদা ছোটর দাবী হাসিমুখে মেনে নিতে হয়, তবেই বড়ত্ব প্রতিপন্ন করার অবকাশ থাকে।

এতদ্‌সত্ত্বেও চুক্তি হল না তিনটি বিষয়ে— তিস্তা জলবন্টন চুক্তি, ফেনী নদীর জলবন্টন চুক্তি ও ট্রানজিট চুক্তি। প্রকৃতপক্ষে তিস্তা জলবন্টন চুক্তিতে আপত্তির কারণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে তাঁর বাংলাদেশ সফর আগেই বাতিল করেন। তার স্বাভাবিক পরিণতি তিস্তা জলবন্টন চুক্তির বাতিল হওয়ার ঘটনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে চুক্তির যথার্থতা ও সত্যতা নিয়ে আগাম আলোচনা না করার জন্যই এই চুক্তির পরিণাম দাঁড়ায় খুবই মর্মান্তিক। মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি ছিল ন্যায়সঙ্গত। শুখা মরসুমে তিস্তা ব্যারেজ থেকে বাংলাদেশের জন্য যে পরিমাণ জল ছাড়ার প্রস্তাব চুক্তিতে ছিল, তা উত্তরবঙ্গের সমগ্র কৃষিকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করে দিত। রাজ্যের ও রাজ্যবাসীর স্বার্থে তাই এই চুক্তির বিরোধীতা করা খুব একটা অস্বাভাবিক বা অপ্রাসঙ্গিক কিছু নয়। অন্যদিকে কেন্দ্রের ইউ পি এ-২ সরকার রাজ্যের সঙ্গে পরামর্শ না করে যেভাবে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে চুক্তি করতে উদ্যত হয় তা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

রাজ্যের স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে বিদেশনীতির অগ্রাধিকারকে শিরোধার্য করার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাবনার সঙ্গে সর্বদা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই রাজ্যেই যখন বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন ছিল, তখন গঙ্গার জলবন্টন চুক্তির বয়ান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে স্থিরীকৃত হয়েছিল। অথচ ইউ পিএর দ্বিতীয় বৃহত্তর শরিক দল হয়েও তৃণমূল কংগ্রেস বা তার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিস্তার জলবন্টন নিয়ে কোনো পর্যায়ে আলোচনা না করার পিছনে রাজ্যকে উপেক্ষা ও বঞ্চনার চিরাচরিত কেন্দ্রীয় উদ্ব্যত্যই অনুসৃত হয়েছিল।

বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি আগে শুখা মরশুমে জলের প্রবাহ বাড়ানো এবং বর্ষায় যে বিপুল পরিমাণ জলের অপচয় হয়, তার সংরক্ষণের দাবী জানিয়েছিলেন কেন্দ্রের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Foreign Policy Studies এর অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার রায় বলেন— বাংলাদেশের বিদেশসচিব সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, তিস্তা চুক্তি যে আকারে সই হওয়ার কথা ছিল, ভবিষ্যতে তার কোনও পরিবর্তন করা যাবে না। প্রশ্ন হল, যদি অসার তথ্যের ভিত্তিতে ওই চুক্তি তৈরি হয়ে থাকে, তাহলে ও কি তার পরিবর্তন করা যাবেনা? তাই ভারত সরকারের উচিত, আগে প্রাতব্য জলের পরিমাণ সম্পর্কে সত্য উদ্ঘাটিত করা এবং বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সমাজকে জানানো। সেটা না করা হলে দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক স্তরে চরম মনোমালিন্য হতে বাধ্য।”[৫৫]

বাংলাদেশের সঙ্গে বহু কাঙ্ক্ষিত ফেনী নদীর জলবন্টন এবং ট্রানজিট সংক্রান্ত চুক্তি না হওয়ার ফলে ভারতের গোটা উত্তরপূর্বাঞ্চলের সঙ্গে ত্রিপুরার বাসিন্দারাও খানিকটা ধাক্কা খেয়েছেন। অধিকাংশ দলেরই আশা অচিরেই তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে যাবে। তার ফলশ্রুতিতে ফেনী ও ট্রানজিট চুক্তি

স্বাক্ষরিত হয়ে যাবে। কারণ মনমোহনের সফরসঙ্গী হিসাবে ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারও। ত্রিপুরার সি পি আই (এম) এর রাজ্য সম্পাদক বিজন ধর এ প্রসঙ্গে বলেন—দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত না হওয়ায় রাজ্যবাসীর আশায় জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে। সি পি আই এর রাজ্য সম্পাদক প্রশান্ত কপালি বলেন— ''জাতীয় স্বার্থের চেয়ে অন্য একটি রাজ্যের স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দেওয়ায় এ যাত্রায় তিস্তা চুক্তি হল না। মিটল না ত্রিপুরার সমস্যাও।''[৫৬] ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেসের মুখপাত্র রতন চক্রবর্তীর কথায়— প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরে যে চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তাতে উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ ত্রিপুরার প্রাপ্তি একেবারে শূন্য। বিশেষ করে ট্রানজিট চুক্তি না হওয়াটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আশা করা যায়, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আলোচনা করে কেন্দ্র খুব শীঘ্রই তিস্তা জলবন্টন সংক্রান্ত সমস্যাগুলি মিটিয়ে ফেলতে পারবে।

অথচ নরসিংহ রাওয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বের কাল থেকে 'পূবে তাকাও নীতি' আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশ মন্ত্রকের অগ্রাধিকারের বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই 'পূবে' বলতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শিল্পোন্নত দেশগুলিকে বোঝায়, এশিয়ার নবোদিত শার্দুল হিসাবে যারা পাশ্চাত্য অর্থনীতির নজর কেড়েছিল। ওই দূরপ্রাচ্যে পৌঁছাতে যে আগে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মতো নিকট প্রাচ্যের কাছে দরজা উন্মুক্ত করতে হবে, তা রাওয়ের উত্তসূরীরা উপলব্ধি করেছিলেন. কিন্তু সেই উপলব্ধি বিদেশনীতির অভিমুখ পরিবর্তনে সফল হয়নি। পাকিস্তান বা আফগানিস্তান নিয়ে নয়াদিল্লী যতটা বিড়ম্বিত হয়েছে, ঢাকা-থিম্পু-ইয়াঙ্গনকে কাছে টানার কিংবা ওইসব রাজধানী শহরগুলি পরিক্রমা করার আগ্রহ তত দেখায়নি। আজ অনেক বিলম্বে মনমোহন সিং পূবের দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করেছিলেন ঠিকই কিন্তু ইতিমধ্যে বেজিং তার জয়পাতাকা নিয়ে অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে। কলম্বো এবং কাঠমান্ডুতে সেই পতাকা ইতিমধ্যেই উড্ডীন, মায়ানমার, ঢাকা ও থিম্পু তার পরবর্তী স্টেশন।

অন্যদিকে তিস্তা চুক্তি স্থাপিত হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের একদিকে যেমন ভারত বিরোধী মানসিকতা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে তেমনই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে পাকিস্তান ও চীন। ইসলামাবাদ ও বেজিংয়ের পক্ষ থেকে ঢাকাকে বার্তা পাঠানো হয়েছিল যে, ভারতকে বিশ্বাস করলে এই ভাবেই ঠকতে হবে। তার চেয়ে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে লাভ বেশি। বাংলাদেশের জনমানসেও এই ধারণা শক্তিশালী হচ্ছে। হাসিনা সরকারের পক্ষ থেকে দিল্লীকে বলা হয়েছে, এখন তিস্তা চুক্তি করেও ভারতের প্রতি বিশ্বাসে এই চিড় মেরামত করা কঠিন। সেজন্য মমতার

সাহায্য চাই। তিনি বাংলাদেশে এলে পরিস্থিতি ফের অন্যদিকে মোড় নিতে পারে। কিন্তু সেজন্য দিল্লিকেই উদ্যোগী হতে হবে।[৫৭]

তবে একথা সত্য যে হাসিনা সরকারের বয়স ঐ সময় আড়াই বছর পেরিয়ে গিয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই আওয়ামী লীগের তরফে তাদের উপরে ভোটের রাজনীতি করার চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে। হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বিরোধী দল বিএনপির বরাবরের অভিযোগ, তিনি ভারতের স্বার্থরক্ষায় কাজ করেন। এখন ভারত যদি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিগুলি সম্পর্কে কড়া মনোভাব নিত, তাহলে বিএনপির পক্ষে ভারত-বিরোধীতার তাস খেলা আরো সহজ হয়ে যেত। তারা আরও জোর গলায় বলতে পারবে যে, হাসিনা বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষা করতে ব্যর্থ। আর হাসিনা সরকার ব্যর্থ হয়ে পড়লে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গঠনের প্রক্রিয়া ব্যর্থ হবে বলে মনে করেন ভারতীয় কূটনীতিকরা। যা এই উপমহাদেশে ভারতের স্বার্থেরই পরিপন্থী। তাই এবারের সফর ছিল সতর্কতার কৌশলগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে জমি হস্তান্তর বিতর্ক সামলাতে ১৭ই অক্টোবর অসম বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন চলে সারাদিন। বিরোধীদের আপত্তির জবাবে অসমের মুখ্যমন্ত্রী তরুন গগৈ সাফ জানান, বাংলাদেশের সঙ্গে জমি হস্তান্তর চুক্তি বাতিল করা সম্ভব নয়। চুক্তি বাতিল হলে তা অসমের স্বার্থের পরিপন্থী হবে। গগৈয়ের দাবী, জমি হস্তান্তরে পরোক্ষে লাভবানই হয়েছে অসম। একধাপ এগিয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বর্বমা অভিযোগ তোলেন— আলফা সেনাধ্যক্ষ পরেশ বরুয়ার উস্কানিতেই জমি হস্তান্তর চুক্তি নিয়ে হইচই করছে বিরোধী দলগুলি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্ত বলেন— ‘‘জনগণকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে অসমের জমি বাংলাদেশকে দিয়ে ঠিক করেননি গগৈ। এবিষয়ে বিধায়কদের মতামত নেওয়া আবশ্যক ছিল। অসমের জনগণকেও নানারকম পরস্পর বিরোধী তথ্য দিয়ে ঠকানো হচ্ছে।’’[৫৮] হিমন্ত বিরোধীদেরই কাঠগড়ায় দাঁড় করান। তিনি বলেন; ‘‘মহন্ত মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে তাঁর আমলেই অসমের দুই কিলোমিটার সীমানা বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া বসানো হয়। ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি বা র‍্যাডক্লিফ সীমানা অনুযায়ী অসম আজ অবধি কিছুই পায়নি। এই প্রথম, অসম জমি লাভ করল।’’ হিমন্তের হিসেব, ‘‘মাত্র ১৯৩ একর জমি অসমকে দেওয়ার বিনিময়ে অসম ১২৯৫ একর জমি পেয়েছে। অথচ বিরোধী দলগুলি এই চুক্তি বাতিল করে অসমের ক্ষতি করতে চান।’’[৫৯]

গগৈয়ের মতে, ‘‘কূটনীতি বা বিদেশনীতি, কখনওই প্রকাশ্যে আলোচনা করে, বা জনগণকে জানিয়ে করা যায় না। সেটি রুদ্ধদ্বার বিষয়। বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি নিয়ে জানাজানি হলে, চিন বা

পাকিস্তান বাংলাদেশকে চুক্তি বাতিল করার জন্য চাপ দিতে পারত। তিনি আরো বলেন, পড়শি দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা অর্থনৈতিক উন্নতি, যোগাযোগ, সন্ত্রাস দমনের পক্ষে আবশ্যক। চুক্তি করার আগে আলোচনার নিয়ম নেই। নিজের দখলে থাকা কোনও জমি আমি বাংলাদেশকে দিইনি। কেউ তা প্রমাণ করতে পারলে পদত্যাগ করব।"[৬০]

এ প্রসঙ্গে ২০শে অক্টোবর ভারতের বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা লালকৃষ্ণ আদবাণী গুয়াহাটিতে বলেন, জমি হস্তান্তর চুক্তি অসংসদীয়। সংসদে এ নিয়ে ইউপিএ সরকারের কাছে জবাব চাইব।[৬১]

২০১১ সালের ১৯শে অক্টোবর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'তিনবিঘা করিডোর'এ একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন। 'তিনবিঘা করিডর' ২৪ ঘন্টা খোলা রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ, ইউপিএ চেয়ারপার্সন সনিয়া গান্ধীর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকেও ধন্যবাদ জানান শেখ হাসিনা। তিনি বাংলাদেশের ছিটমহল দহগ্রাম আংরাপোতায় একটি সরকারী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ফেরার পথে 'তিনবিঘা করিডর' পরিদর্শন করেন। সেখানে দুদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় প্রক্রিয়া নিয়ে সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে বলে আশাপ্রকাশ করেন। হাসিনার কথায়, — "ইতিমধ্যে সমঝোতাপত্র হয়েছে। তবে গত ৬৪ বছরে যা হয়নি, তা ৬৪ দিনে মিটবে আশা করা যায়না। জটিল কাজ হলেও সিদ্ধান্ত হয়েছে। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে কোনও কাজেই সমস্যা হবে না।"[৬২] তিনি দহগ্রাম আংরাপোতায় একটি বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র, ১০ শয্যার হাসপাতাল, দহগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ ভবন ও ঐদিন উদ্বোধন করেন। তার সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশের কয়েকজন মন্ত্রী ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মহম্মদ এরশাদ।

এই সফরকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে ভারতের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী গুলাম নবি আজাদ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র প্রসাদ সিংহ। সেখানে হাসিনাকে তাঁরা চা চক্রে আপ্যায়িত করেন। হাসিনার এ দিনের তিনবিঘা সফর সহ গত এক বছরে ভারত ও বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতিকে 'নতুন যুগের সূচনা' বলে দাবি করেন আজাদ। হাসিনা স্থানীয় নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনাদের আর বন্দী জীবন কাটাতে হবে না। আজ থেকে আপনারা স্বাধীনতার স্বাদ নিতে পারবেন।"[৬৩] ভারতের তরফে এদিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে এক হাঁড়ি রসগোল্লা চাদর সহ নানা উপহার দেওয়া হয়। বৈঠকের পর সংবাদ মাধ্যমের সামনে হাসিনা বলেন, "আমরা সকলে মিলে মিষ্টি খেলাম। পাশে দাঁড়িয়ে গুলাম নবি আজাদ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে

সুর মিলিয়ে বলেন, ‘‘বলতে পারেন, আমরা দুদেশের সম্পর্ককে ‘সেলিব্রেট’ করলাম।”

এবার বাংলাদেশের সঙ্গে তৈরি হওয়া ‘জটিলতা’ কাটাতে উদ্যোগী হলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। তিস্তা জলবন্টন চুক্তি এবং তিনবিঘায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, তা নিরসনে মনমোহন ২২শে অক্টোবর বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বৈঠকের পর মমতা বলেন, ‘‘বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে আমরা সর্বদাই উৎসাহী। এ ব্যাপারে আমাদের কোন সমস্যা নেই।” পাশাপাশি বিদেশমন্ত্রকের তরফ থেকে বলা হয়— ‘‘বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান ও ভালোবাস রয়েছে। তিনি তিন বিঘা পরিদর্শন করতে আসায় ভারত গর্বিত’।[৬৪]

হাসিনার ছিটমহল সফরের সময় মমতাকে কেন্দ্র আমন্ত্রণ জানায়নি— তাই মনমোহন দুঃখ প্রকাশ করেন। তবে তিনবিঘার পাশাপাশি তিস্তা চুক্তি নিয়েও উভয়ের কথা হয়। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, দু দেশের মধ্যে তিস্তা চুক্তি হোক এটাই তিনি চান। তবে সমস্যা হল, তিস্তা নদীতে জলাভাব। এ বিষয়ে নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্রের রিপোর্ট খতিয়ে দেখতে হবে যে সুখা মরসুমে তিস্তায় কতটা জল থাকে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ীই মমতা কেন্দ্রকে তাঁর মতামত জানাবেন বলে কথা দেন।

তিস্তা জলবন্টন সমস্যার এখনও মীমাংসা না হলেও অন্যবহু ক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে বলে দাবী করেছেন ঢাকায় বিদায়ী ভারতীয় হাইকমিশনার রজিত মিটার। ২০১১ সালের ২৮শে অক্টোবর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে আনুষ্ঠানিক বিদায়পর্ব সেরেছেন মিটার।

মিটার বলেন, তাঁর আমলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেমন দিল্লী সফরে গিয়েছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীও তেমনি ঢাকায় এসেছেন। দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক এক নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়েছে। তিনি বলেন,— ‘‘আওয়ামি লীগ সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের ফলেই এই সম্পর্ক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।” তিস্তা চুক্তি না হওয়াটাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে মিটার বলেন,— ‘‘বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের হতাশ হওয়ার কারণ আছে। কিন্তু অন্যসব বিষয়কে সেটা ছাপিয়ে যেতে পারে না। সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আজ না হোক কাল তিস্তা চুক্তি হবেই। কিন্তু নিরাপত্তায় সহযোগীতা, সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণের মতো বহু ক্ষেত্রে দুদেশের বোঝাপড়া ইতিমধ্যেই দারুন কাজে লেগেছে। বাংলাদেশ থেকে

আলফার ডেরা কার্যত উচ্ছেদ হয়েছে। ইসলামী জঙ্গীদেরও কোণঠাসা করা গিয়েছে।” মিটার বলেন, ১৯৪৭ সাল থেকে চলা সীমান্ত সমস্যা অনেকটাই মিটিয়ে ফেলা গিয়েছে, সীমান্ত চিহ্নিতকরণ নিয়েও দুদেশ সহমতে পৌঁছেছে। তিনবিঘা করিডর দিয়ে বাংলাদেশের দুই ছিটমহলের বাসিন্দারা ২৪ ঘন্টা চলাচল করতে পারছে। তিস্তা চুক্তি না হওয়ায় বিষয়টিকে তুলে ধরে এই সাফল্যকে খাটো করে দেখানো যাবে না।[৬৫]

ভারত-নেপাল ও ভূটানকে ট্রানজিট দেওয়ার বিনিময়ে কি হারে মাসুল নেওয়া হবে, বাংলাদেশের সরকার ইতিমধ্যেই তা ঠিক করে ফেলেছে। তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিদায়ী হাইকমিশনার বলেন, — আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি মেনে মাসুল দেওয়ার কথা ভারত বরবারই বলে এসেছে। তবে মাসুল নির্ধারণের সময়ে সব পক্ষের লাভ ক্ষতির বিষয়টি বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের মনে রাখা উচিত। আদতে ভারতের ব্যবসায়ীরাই এই ‘ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্টের সুবিধা ব্যবহার করবেন। তিনি আরো বলেন, ‘‘ভবিষ্যতেও দুদেশের সহযোগীতা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশাবাদী।”[৬৬]

এই সময় ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব রাজকুমার সিংহ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। শুধু দিল্লী বিস্ফোরণের সঙ্গে যোগসূত্র নয়, পশ্চিমবঙ্গ, অসম সহ উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিতে যেভাবে বাংলাদেশী বে-আইনী অনুপ্রবেশকারী বাড়ছে, তাতে ভবিষ্যতে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে কেন্দ্র। কারণ সীমান্ত পেরিয়ে আসার পরে এই অনুপ্রবেশকারীরা সারা দেশেই ছড়িয়ে পড়ছেন। তাই নতুন করে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়ে রাজ্যগুলিকে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে কেন্দ্র। মুখ্যসচিবদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাদের দায়িত্ব কি? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুক্তি, দেশের নিরাপত্তার উপরে এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রয়েছে। তার জন্যই জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।[৬৭]

অন্যদিকে নভেম্বর মাসে তিস্তা সমস্যার সমাধানে রণকৌশল পরিবর্তন করে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। নয়াদিল্লী বুঝতে পেরেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাদ দিয়ে ঢাকার সঙ্গে এই চুক্তি রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। তাই কূটনৈতিক দৌত্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক বেশী করে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের এক কূটনীতিকের বক্তব্য, ‘‘দেরিতে হলেও নয়াদিল্লীর এই বোধোদয় দুদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।”[৬৮]

সাউথ ব্লক বলেছিল, মমতাকে রাজনৈতিক দূত হিসাবে ব্যবহার করার কৌশলটি আসলে চিনা

পদ্ধতি। সমাজতন্ত্রী এই দেশে ইদানীং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ফেডেরাল ডিপ্লোমেসি বা যুক্তরাষ্ট্রীয় কূটনীতি। এই কূটনীতি অনুসারে চিন তাদের দেশকে চারভাগে ভাগ করেছে। এবং চার প্রান্তে চারটি আঞ্চলিক কূটনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করেছে। যেমন কুনমিন প্রান্তে একটি আঞ্চলিক দফতর খোলা হয়েছে ভারতের পূর্বাঞ্চল এবং মায়ানমারের সঙ্গে কূটনৈতিক দৌত্য করার জন্য। কুনমিঙের আঞ্চলিক নেতারা পূর্ব ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখছেন। তাঁরা মমতার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। অন্যদিকে, ঝিয়াবাও প্রদেশ থেকে পশ্চিম ভারত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করা হচ্ছে। একইসঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয়ও দেখভাল করা হচ্ছে। ঝিয়াবাও এলাকার নেতারা সরাসরি গুজরাত সরকারের সঙ্গে কথা বলে সেখানে বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মার বসানোর বরাত নিয়েছেন। ওই প্রকল্পে গুজরাতের দুহাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। এইসব কার্যকলাপে চীনের শীর্ষ নেতৃত্বের কোনও আপত্তি নেই এবং তাঁরা সেভাবে নাকও গলান না। দেরীতে হলেও ভারত এখন ওই পদ্ধতি অনুসরণ করে মমতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের বাধা কাটানোর চেষ্টা করতে উদ্যোগী হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক শীর্ষ এক বক্তৃতায় বাংলাদেশের হাই কমিশনার তারির করিম বলেন, ‘‘স্থানীয় রাজনীতির হাতে বন্দী না থেকে বৃহৎ চিত্রের দিকে তাকানোর সাহস দেখালে তবেই তিস্তার জলবন্টন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেই সাহস দেখিয়েছেন। তবে সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের স্বার্থহানি হোক, সেটা আমরা চাইনা।’’ মনমোহন ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিবশংকর মেনন দুটি বিষয় মেনে নিয়েছেন। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করে কোনও চুক্তি হবে না। দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কোনও অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে মতপার্থক্য নিয়ে জাতীয় স্তরে চুক্তি করা যায় না। আপাতত এই বোধোদয়ের পর কেন্দ্রীভূত কূটনীতির মডেলে পরিবর্তন এনে চিনের অনুসরণে যুক্তরাষ্ট্রীয় মডেলের পথে হাঁটতে চাইছিল কেন্দ্র। ঢাকাও চাইছিল, মমতাকে গোটা প্রক্রিয়ায় সামিল করে বাস্তব পরিস্থিতির উপর দাঁড়িয়ে ধীরে সুস্থে একটা দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি হোক।[৬৯]

২০১১ সালের ১০ই নভেম্বর মালদ্বিপের আদু শহরে ১৭তম সার্ক সম্মেলনে সাক্ষাৎ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পড়শি মুলুকের মন জয়ের লক্ষ্যে সেই মুক্ত বাণিজ্য নীতিরই হাত ধরলেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। মালদ্বীপে ১৭তম সার্ক সম্মেলনের মঞ্চে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির জন্য ভারতের বাজারের দরজা আরও বেশি করে খুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন তিনি। একইসঙ্গে প্রস্তাব দিলেন সার্ক

গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগযোগ আরও নিবিড় করার। তিনি জানান দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (SAFTA) এর সব থেকে অনুন্নত দেশগুলির জন্য এই পণ্যের সংখ্যা এক ধাক্কায় ৪৫৫টি বাড়াচ্ছে ভারত। যে কারণে শুধু তাদের জন্য ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে সংবেদনশীল বলে চিহ্নিত পণ্যের সংখ্যা ৪৮০ থেকে কমিয়ে আনা হচ্ছে ২৫টিতে। সাধারণত নানা বিধিনিষেধ কিংবা চড়া শুল্কের কারণে এই সংবেদনশীল পণ্যগুলি ভারতের বাজারে রফতানি করা কঠিন হয়। কিন্তু এবার শূন্য শুল্ক পণ্য হিসেবেই তা রফতানি করতে পারবে বাংলাদেশ, ভূটান, নেপাল এবং মালদ্বীপ।[৭০]

দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের প্রধান আর্থিক শক্তি হিসেবে তার নেতৃত্বের 'ব্যাটন' যে ভারত নিজের হাতে রাখতে চায়, মনমোহন তা স্পষ্ট করে দেন। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, ইউরোপের আর্থিক সঙ্কট আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনীতির বেহাল দশার জেরে ফের ঘোরালো সমস্যায় বিশ্বের অর্থনীতি। যার আঁচ পড়ছে এশিয়ার উপর। তাই এই পরিস্থিতিতে আর্থিক বৃদ্ধির গতি অব্যাহত রাখার একমাত্র উপায় হলো বিশ্বায়নের শর্ত মেনে তীব্র প্রতিযোগীতায় যুঝতে থাকা। আরো বেশি করে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। সার্কভুক্ত দেশগুলির মানুষের মধ্যে যোগযোগ বৃদ্ধি। তাই তিনি স্থল, জল ও বিমান পরিষেবার মাধ্যমে সার্কভুক্ত দেশগুলির মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দেন। যেটা সামান্য হলেও রয়েছে ভারত, মলদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে।

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে ডাক ও টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর পক্ষপাতী প্রধানমন্ত্রী। তাঁর প্রস্তাব টেলিসংযোগ উন্নত করে কলরেট কমানো ও দক্ষিণ এশীয় ডাক ইউনিয়ন গঠন। যার জন্য অস্থায়ী দফতর তৈরি করতেও এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে প্রস্তুত ভারত। জোর দেন সিনেমা, রেডিও ও টিভির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান বাড়ানোর উপরও। ঘোষণা করেন সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধির কথা। মনমোহনের দাবী, ঐতিহ্যের কারণে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে বিপুল সম্ভাবনা পর্যটন শিল্পেও। যা তুলে ধরতে আলোচনাচক্র ও চলমান প্রদর্শনী আয়োজনে উদ্যোগী হবে ভারত।[৭১]

এরপর ১৫ই নভেম্বর বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দীপু মনি বেঙ্গালুরুতে 'ইন্ডিয়ান ওসান রিম অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশন' (IOR-ARC) এর বৈঠকে যোগ দিতে আসেন। পরের দিন ১৬ই নভেম্বর তিস্তার জলবন্টন সংক্রান্ত বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন

কলকাতায়। প্রায় ৪৫মিনিট উভয়ের আলোচনার পরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে দীপু মনি বলেন, ‘‘ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিস্তা জলবন্টন চুক্তি ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের বিষয়। তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা নিয়েও আমাদের মধ্যে কথা হয়েছে। কিন্তু ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে কি কথাবার্তা হবে, সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। তা নিয়ে আমি কোন মন্তব্য করব না। তবে পানি সহ সব ক্ষেত্রেই ভারত-বাংলাদেশ সহযোগীতা অব্যাহত থাকবে।”[৭২]

মুখ্যমন্ত্রীও বলেন, ‘‘বাংলাদেশকে জল দিতে পারলে আমি খুশি হব। কিন্তু আমাদেরও কিছু সমস্যা রয়েছে। তিস্তায় অনেকসময় জল একদম থাকে না। আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি। ও দিকে সিকিম রয়েছে। চার-পাঁচটা জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে। তিস্তা ব্যারেজের ও সম্প্রসারণ হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের মানুষ যাতে জল পান, আর বাংলাদেশের সমস্যা ও যতটা মেটানো যায়, সেজন্য যতদূর সম্ভব আমরা নিশ্চয়ই করব।”[৭৩]

বৈঠকে দুদেশের সম্পর্কের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে দুই বাংলার মধ্যে আরও বেশি সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের উপরেও জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিবিড় করে একটি টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথ নজরুল আমাদের উভয়েরই সম্পদ। চলচ্চিত্র, নাটক-প্রকাশনা ক্ষেত্রে এবং শিল্পীদের আদান প্রদান বজায় রাখার ক্ষেত্রে ওই টাস্কফোর্স কাজ করতে পারে।”

২০১১ সালের ১৯-২১ সে নভেম্বর ভারত-বাংলাদেশ যৌথ স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নয়াদিল্লীতে। বৈঠকের শেষে নয়া দিল্লী ও ঢাকার বক্তব্যের নির্যাস, শুধুমাত্র ‘বকেয়া দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলিকে’ মিটিয়ে ফেলা নয়, সহযোগীতার ‘নূতন ক্ষেত্রগুলি’ খুঁজে দেখাটাও উভয়ের লক্ষ্য। বৈঠকের পর প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘খুব শীঘ্রই’ দুদেশের মধ্যে বন্দি প্রত্যাপর্ণ চুক্তিটি চূড়ান্ত করা হবে।

নর্থব্লকে তিনদিন বৈঠক চলার পর ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব আর কে সিংহ বলেন, ‘‘গত দেড় বছরে বাংলাদেশের কাছ থেকে যে সহযোগীতা পেয়েছি, তাতে আমরা খুবই খুশি। বাংলাদেশকে আমরা ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশী মনে করি।” যার জবাবে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র সচিব মনজুর হুসেন বলেন, ‘‘গত দেড় বছরে যে বিশ্বাস এবং পারস্পরিক আস্থা তৈরি হয়েছে, তাকে অবলম্বন করেই এগিয়ে যেতে চাইছি আমরা। শুধুমাত্র বকেয়া বিষয়গুলি মেটানো নয়, দুদেশের স্বার্থ রক্ষিত হবে এমন নতুন

ক্ষেত্রও খুঁজে দেখা হবে।”[৭৪]

বাংলাদেশের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের এই বৈঠকের ফল ভারতের পক্ষে যথেষ্ট ইতিবাচক বলেই মনে করেছিলেন ভারতীয় কূটনীতিকরা। দক্ষিণ এশিয়ার সামগ্রিক নিরাপত্তার প্রশ্নটি যখন ভারতকে কাঁটার মতো বিঁধছে, তখন সন্ত্রাস মোকাবিলায় বাংলাদেশকে পাশে পাওয়া বড় প্রাপ্তি হিসাবেই দেখছে সাউথ ব্লক। আর কে সিংহের পাশে বসে মনজুর হুসেন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ঢাকার মাটিতে ভারত-বিরোধী জঙ্গী ঘাঁটি কোনও অবস্থাতেই সহ্য করা হবে না। তিনি এই আশ্বাসও দিয়েছেন যে, আইনি জটিলতা কাটলে আলফার সাধারণ সম্পাদক অনুপ চেটিয়াকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার কথা গুরুত্ব সহকারে ভাবা হবে। পাশপাশি বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের হত্যাকারীদের মধ্যে দুজন ভারতে আত্মগোপন করে রয়েছে, এই তথ্য নর্থব্লককে দিয়ে ঢাকার তরফে অনুরোধ করা হয়েছে যে, দ্রুত তাদের বের করে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়া হোক। নয়াদিল্লী জানায় বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়েদেখা হবে। যদি এমন কারও সন্ধান মেলে, তাহলে আনন্দের সঙ্গেই ব্যবস্থা নেবে নয়াদিল্লী।

আরো যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, ২০১০ সালে হাসিনার ভারত সফরের সময় হওয়া তিনটি চুক্তি— (পারস্পরিক আইনি সহায়তা, সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের বিনিময়, মাদক চোরাচালান দমন) এবং প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরে সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত চুক্তির দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তিটিও যাতে খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত করা যায়, সে ব্যাপারে দুটি দেশই একমত হয়েছিল। তবে কবে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে তা নির্দিষ্ট করে জানতে চায়নি কোন দেশই।

২০১১সালের শেষপর্বে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক টিপাইমুখ বাঁধকে কেন্দ্র করে বিস্তৃতি লাভ করে। বরাক নদীর উপর টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে বাংলাদেশে যখন বিতর্ক তুঙ্গে, তখন সে দেশের ‘সন্দেহ’ নিরসনের চেষ্টায় অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে ভারত। বাংলাদেশকে আবার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সে দেশের ক্ষতি হয় এমন কোনও কাজ ভারত করবে না। বরং এই প্রকল্পে উৎপন্ন বিপুল জলবিদ্যুতের ভাগ পাবে বাংলাদেশও।

১ লা ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দুই উপদেষ্টা মসিউর রহমান এবং গওহর রিজভি দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি মণিপুরে বরাক নদীর উপর প্রস্তাবিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি নিয়ে তারা ঢাকার উদ্বেগের বিষয়টি জানান।

প্রধানমন্ত্রী তাঁদের কাছে প্রকল্পটির বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে জানান, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। ঢাকার স্বার্থ বিপন্ন হবে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না ভারত। বৈঠকের পর বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বিষ্ণু প্রকাশ একটি বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, ''ভারত সরকার ইতিমধ্যেই বাংলাদেশকে জানিয়েছে, টিপাইমুখ প্রকল্প নিয়ে ঢাকার সঙ্গে সবরকম আলোচনা করতে কেন্দ্র প্রস্তুত। গত সেপ্টেম্বরে তাঁর বাংলাদেশ সফরের সময়ে প্রধানমন্ত্রী একই আশ্বাস দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের দুই উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনায় তার পুনরাবৃত্তি করে তিনি জানিয়েছেন; টিপাইমুখ নিয়ে এমন কোনও পদক্ষেপ করা হবে না, যাতে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।"[৭৫]

ভারতের বিদেশমন্ত্রক সূত্রের বক্তব্য যে তিস্তা আর বরাক দুই নদীর সমস্যা এক নয়। তিস্তায় যেমন জলের সঙ্কটই সমস্যা, বরাকে সমস্যা জলের প্রাচুর্য প্রতি বছর বরাকের বন্যায় যেমন ভারতের মণিপুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ভেসে যায় বাংলাদেশের বিস্তার্ণ অঞ্চলও। টিপাইমুখ প্রকল্পটি রূপায়িত হলে, ফি বছরের সেই বন্যা আটকানো যাবে। পাশাপাশি এই প্রকল্পে পাহাড়ি বরাকের জলের স্রোত কাজে লাগিয়ে যে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে, তা যেমন ভারত নেবে তেমনই পাবে বাংলাদেশও। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সমস্যার অনেকটা সুরাহার পথ দেখাতে পারে টিপাইমুখ।

বিদেশ মন্ত্রকের এক কর্তার মতে, ''২০০৯ সালে বাংলাদেশের একটি সংসদীয় দলকে আমরা টিপাইমুখের প্রস্তাবিত প্রকল্প দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলাম। প্রয়োজনে হাসিনা সরকারের প্রতিনিধিদের আবার সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। এই প্রকল্প নির্মাণের প্রতিটি ধাপেই আমরা বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। কোনও কিছুই গোপনে করা হবেনা।"[৭৬] ওই কর্তা ব্যাখ্যা দেন, মণিপুরে বাড়তি জলের কোনও প্রয়োজন নেই। ফলে জলের গতিপথ ঘুরিয়ে নিজেদের কাজে লাগানো নয়, বাঁধ দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়া। তা ছাড়া মণিপুরের ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে চাইলেও আমরা জলের গতিপথ বদলাতে পারি না।

২০১০ সালে শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময়েও প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে টিপাইমুখ নিয়ে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী কোনও কাজ ভারত করবে না। ঢাকার আশঙ্কা ছিল, ভারত এই প্রকল্প রূপায়ন করলে বাংলাদেশে জলের সঙ্কট দেখা দিতে পারে। বিরোধীরা আক্রমণ শানাতে থাকেন শেখ হানিসার বিরুদ্ধে। প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসের ফলে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে। কিন্তু কিছু সংবাদমাধ্যমের প্রচারে ইস্যুটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দুবছর আগে মউ স্বাক্ষরের পরে গত

অক্টোবরে এই প্রকল্পের জন্য একটি ‘প্রোমোটারস এগ্রিমেন্ট’ সই হয় মণিপুর সরকার, এন এইচ পি সি এবং শতদ্রু জলবিদ্যুৎ নিগমের মধ্যে। কিছু সংবাদমাধ্যম এই বিষয়টি তুলে ধরে প্রচার করে যে, ঢাকার আপত্তি সত্ত্বেও হইহই করে টিপাইমুখ প্রকল্প এগিয়ে যাচ্ছে নয়াদিল্লী।

তিস্তা জলবন্টন চুক্তি না হওয়াতে এমনিতেই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে জটিলতা তৈরি হয়েছে। তার উপর টিপাইমুখ ‘চুক্তি’ হাতিয়ার করে নতুন করে ভারত বিরোধী জিগির তুলেছে বাংলাদেশের একটি মহল। সক্রিয়তা দেখাতে মনমোহন সিংহকে চিঠি পাঠিয়ে টিপাইমুখ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়া। পত্রপাঠ মনমোহন সেই চিঠির জবাব পাঠিয়ে বাংলাদেশের বিরোধী নেত্রীকে আশ্বাস দেন, বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী কোনও কাজ ভারত করবে না। তিনি এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে ভারত সরকারের আশ্বাস সত্ত্বেও এই প্রকল্পের প্রবল বিরোধীতা দেখা দেয় বিএনপিসহ হাসিনার জোটসঙ্গী হুসেন মহম্মদ এরশাদ এর মধ্যে। বাঁধের বিরুদ্ধে তিনি পদযাত্রার ডাক দেন। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে বাংলাদেশে যুদ্ধপরাধীদের বিচার নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে বিপাকে পড়েছে বিএনপি। কারণ, যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছে কয়েকজন প্রথম সারির বিএনপি নেতা। আবার হাসিনার উপর হামলার ঘটনাতেও অভিযুক্ত খালেদার দুই ছেলে। টিপাইমুখ নিয়ে প্রচার চালিয়ে বিএনপি জাতীয় রাজনীতিতে আবার সুধিাজনক অবস্থাতে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। যা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৭৭]

এছাড়া ২০১১-১২ অর্থবর্ষে বাংলাদেশের ভারতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৫৬৯.৮ মিলিয়ান ডলার এবং আমদানীর পরিমাণ ছিল ৫১২.৫ মিলিয়ন ডলার। যা উভয় দেশের সম্পর্ককে অর্থবাহি করে তোলে।[৭৮]

২০১২ সালের ১১-১২ই জানুয়ারী ভারতের ত্রিপুরার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ত্রিপুরা সফর করেন বাংলাদেশের প্রাধনমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার এই সফরের পূর্বে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে আগরতলা থেকে আখাউড়া পর্যন্ত রেল প্রকল্পের জন্য ২৫০ কোটি টাকা খরচ করবে কেন্দ্রীয় সরকার।[৭৯] যা শেখ হাসিনা ও ত্রিপুরা রাজ্য নেতৃত্বের বৈঠককে ইচিবাচক করে তুলেছিল। এক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান স্বীকার করে কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলাদেশে হাসিনা বিরোধী শক্তিকে ঘরোয়া রাজনীতিতে সেই বিরোধীতা কমাতে আগরতলা থেকে আখাউড়া রেললাইনটি দ্রুত

তৈরি হওয়া বাংলাদেশ সরকারের জন্য খুবই জরুরী। এটি হয়ে গেলে বাংলাদেশ আগরতলার মাধ্যমে গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাজার ধরতে সক্ষম হবে। পণ্য রফতানির প্রশ্নে কলকাতার তুলনায় সামগ্রিকভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চল অনেকটাই বেশি আকর্ষণীয় ঢাকার। ব্রিটিশ শাসনের সময় অবিভক্ত ভারতে আখাউড়া ছিল রেলের অন্যতম মুখ্য দফতর। সে সময়ে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ত্রিপুরায় পণ্য পৌঁছতে ওই লাইনটি ব্যবহার করা হত। পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। তা ফের চালুর বিষয়টি ঘরোয়া রাজনীতিতে বাড়তি সুবিধা দেবে বলেই মনে করছেন কূটনৈতিক শিবির।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরার অবদান স্বীকৃতি দিতে আগরতলায় আসার ইচ্ছা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজবির রহমানের। কিন্তু ঘাতকের বুলেট সেই ইচ্ছাপূরণ করতে দেয়নি। তাই ১১জানুয়ারী শেখ হাসিনার আগরতলায় পদার্পণ পিতার ইচ্ছাকে মর্যাদাপূর্ণ করেছিল। হাসিনার দুদিনের সফরে সঙ্গী ছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি সহ ৮৭ জনের প্রতিনিধিদল। এদের মধ্যে কয়েকজন সাংসদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সরকারি আধিকারিক ও সাংবাদিক ছিলেন। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান ভারতের কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী কপিল সিব্বল ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। বিমান বন্দর থেকে তিনি সোজা চলে যান অতিথিশালায় সেখানে কিছুক্ষণ থেকে চলে যান প্রজ্ঞাভবনে। সেখানে ‘কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রীজ’ আয়োজিত ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য প্রতিনিধিদের বৈঠকে তিনি বক্তৃতা দেন। বৈঠকে ছিলেন বাংলাদেশ ফেডারেশন অফ কমার্সের প্রতিনিধিরা, ইন্দো-বাংলা চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি এবং CII-এর প্রতিনিধিরা। এছাড়াও ছিলেন ত্রিপুরা চেম্বার অফ কমার্স এবং ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য মহলের প্রতিনিধিরা। উপস্থিত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আশার বার্তা দিয়ে হাসিনা বলেছিলেন, ‘‘আমরা আপনাদের আহ্বান করছি, বাংলাদেশে আরো বেশী করে বিনিয়োগ করুন। আমরা ক্ষমতা আসার পর আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক সহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।’’[৮০]

১২ই জানুয়ারী ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্মানিক ডি লিট দেওয়া হয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। সাম্মানিক এই ডিগ্রী পাওয়ার পর তিনি আবেগরূদ্ধ হয়ে বলেন যে— ‘‘আমার প্রথম সন্তান যখন জন্ম নেয়, তখন আমি জেলখানায়। যে অমানবিক নির্যাতন আমাদের উপর হয়েছিল, তা আজ বিশ্ববাসী জানেন। কিন্তু সেই সময় আপনারা যে সহযোগীতা করেছিলেন, তার কথা কখনও ভুলতে পারিনা। যে সম্মান আজ বিশ্ববিদ্যালয় দিল, আমি তার যোগ্য কিনা, তাও জানি না। বহু চড়াই উতরাইয়ের মধ্যে জীবন কাটাতে হয়েছে, লেখাপড়া বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে

আমার গৌরবের শেষ নেই। কেন না এক সময় মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন এখানে।"[৮১] এছাড়া তিনি ঐ দুদিন ত্রিপুরার মানুষকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন হাসিনা। তিনি বলেন, চল্লিশ বছর পার হয়ে গেলেও তিনি ভুলতে পারেন না কিভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, আশ্রয়, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিল আগরতলা। রাস্তায় অথবা বিবিধ মঞ্চে অপেক্ষমান হাজারো মানুষকে বার্তা দিয়েছেন, 'আমি তোমাদেরই লোক"।

ত্রিপুরার দক্ষিণে পালটানা বিদ্যুৎ প্রকল্পে বিনিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ থেকে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ, আশুগঞ্জ বন্দর ব্যবহার, সীমান্ত হাটগুলি খোলা অথবা বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্য বিস্তার— সব ক্ষেত্রেই ত্রিপুরা সরকারের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন হাসিনা। বিদেশ মন্ত্রকের কর্তাদের মতে, তিস্তা বিতর্ককে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কে যে বরফ জমেছিল, এই সফরের উষ্ণতা তার অন্তত কিছুটা হলেও গলিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এই সফর দুদেশের ভবিষ্যৎ কূটনীতিতে তাই যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করেছিল বিদেশমন্ত্রক। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দীপু মনি তাই বলেন যে— ''আজ দুদেশের মধ্যে সম্পর্কে যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল, তাকে কাজে লাগাতে হবে। সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক।"

ত্রিপুরার দীর্ঘদিনের দাবী, বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার (ট্রানজিট) করে উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পণ্য পরিবহনের বিষয়টি চূড়ান্ত হোক। এ বিষয়ে হাসিনা বলেন, ''আমার এ নিয়ে সন্দেহ নেই যে, ত্রিপুরা সহ ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ বাড়ালে বিশাল অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত গড়ে উঠবে। সাধারণ মানুষের হাত শক্ত হবে, গোটা অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন এবং বিকাশ ঘটবে। দক্ষিণ এশিয়াকে শান্তিপূর্ণ রাখাও সম্ভব হবে।"[৮২]

২০১২ সালের জানুয়ারী মাসের ১৯ তারিখ বাংলাদেশ সেনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহম্মদ মাসুদ রজ্জাক সাংবাদিক বৈঠক করে বাংলাদেশের সেনা অভ্যুত্থানের চক্রান্ত ফাঁস করে দেন। যার পিছনে ছিল পাকিস্তানের মতদপুষ্ট জামাতের অদৃশ্য হাত। সাম্প্রতিক অতীতে ভারতের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক যত নিবিড় হয়েছে, ততই দেশের মধ্যে বিরোধীতায় সরব হয়েছেন জামাতেরা। সম্প্রতি আগরতলা সফরে গিয়ে হাসিনা প্রকাশ্যে সরব হয়ে বলেছিলেন, পালটানা প্রকল্পে ভারতকে সাহায্য করার জন্য তাঁর বিরোধীরা সমালোচনা করলেও তিনি 'পড়শির সমস্যা' দেখে হাত গুটিয়ে থাকবেন না। বাংলাদেশের ক্ষমতা থেকে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শেখ হাসিনাকে সরানোর চেষ্টা হলে, তাঁকে

সব রকম সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। বাংলাদেশ সরকারকে সেই বার্তাও পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।[৮৩]

শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেই ২০০৯ এর ফেব্রুয়ারী মাসে বি ডি আর বিদ্রোহ হয়। তারপরে এবার চক্রান্তে সেনাদেরই একটি অংশ। বার বার এই ঘটনায় চিন্তায় ছিল ভারত। কারণ সাধারণ নির্বাচনের এখনও অনেক দেরি। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক প্রকল্প প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। ঢাকাকে একশো কোটি ডলার ঋণ দিয়েছিল ভারত। তিস্তা জট ছাড়ানোর পাশাপাশি তেমনই বাংলাদেশের মধ্যে পণ্য পরিবহন চালু করার চেষ্টা চলছিল। হাসিনা সদ্য ত্রিপুরায় ঘুরে গিয়েছিলেন। তাই স্বাভাবিক কারণে এই পরিস্থিতিতে হাসিনা সরকারের কর্তৃত্ব যাতে কোনওভাবে দুর্বল না হয়ে যায়, তার জন্য কড়া অবস্থান ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রীর।

দিল্লীর চিন্তার কারণ ছিল এই যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশকে আঘাত করতে চায় পাকিস্তান। তাদের কট্টরবাদীরা নিজেদের দেশের মতোই বাংলাদেশেরও ইসলামী মৌলবাদী সভাকে উস্কে দিয়ে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের পথকে স্তব্ধ করতে চায়। সে জন্য তারা বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কট্টরপন্থী অংশটিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। ১৯৭৫ সালে মুজিবকে হত্যা করে যেভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিল সামরিক শাসকরা। এবারে অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ঠিকই। কিন্তু গণতন্ত্রের মধ্যেই আশঙ্কার কালো মেঘ দানা বেঁধেছিল।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মতে, যখন শেখ হাসিনা সংকীর্ণ মৌলবাদ পরিহার করে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনে সচেষ্ট হচ্ছেন, যখন তিনি উন্নয়নমুখী বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে চাইছেন, ঠিক তখন তারা সামরিক বাহিনীর ভিতর মৌলবাদের প্রভাব বাড়িয়ে হাসিনা সরকারকে আঘাত হানার চেষ্টা করছে। এই প্রচেষ্টাকে গণতন্ত্রের দুঃসময় মনে করে ভারত। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নয়, এমন জেনারেল এবং বিচারপতিরাও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তোয়াক্কা না করে যদি দন্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে উঠতে চান, তা হলে ভারত তা সমর্থন করবেনা। তা সে বাংলাদেশই হোক বা পাকিস্তান। দিল্লি আরও মনে করে, সেনাবাহিনী, বিশেষ করে সেনাপ্রধানের সঙ্গে এখন মধুর সম্পর্ক অটুট রাখা উচিত হাসিনার। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও সেই পথে হেঁটেই ঘটনার দিন সেনাবাহিনীকে দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করিয়েছিলেন। তিনি জানেন, ইসলামী ধর্মীয় সত্তার মোকাবিলা করতে হবে বাঙালি জাতিসত্তা দিয়েই। ভারত মনে করে, একইভাবে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনই হাসিনার কাছে এখন সব

থেকে বড় চ্যালেঞ্জ।[৮৪]

তিস্তা চুক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মমতার শর্ত মেনে তিস্তা জট খুলতে উদ্যোগী হন মনমোহন সিংহ। সেইমতো বিদেশ সচিব রঞ্জন মাথাইকে মমতার কাছে পাঠান জট ছাড়ানোর জন্য। এক্ষেত্রে চুক্তি স্বাক্ষরের আগে মমতাকে কয়েকটি বিষয়ে অবহিত করার সিদ্ধান্ত নেন মনমোহন। প্রথমতঃ রাজ্যকে বঞ্চিত করে কেন্দ্র এই চুক্তি করতে নারাজ। দ্বিতীয়তঃ গাজল ডোবা বাঁধ থেকে ২৫ ভাগ জল এবং দোমোহনি 'রিচার্জ সাইট থেকে ২৫ ভাগ জল মোট ৫০ শতাংশ জল বাংলাদেশকে দেওয়া সম্ভব নদী বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে। তৃতীয়তঃ রাজ্যের যে আশঙ্কা সিকিমে তিনটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হলে পশ্চিমবঙ্গের ভাগে জল কমে যাবে। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের বক্তব্য জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে জল ব্যবহারের পর সেই জল নদীতে ফিরে আসে। সুতরাং রাজ্যের আশঙ্কা অমূলক। চতুর্থতঃ রাজ্যের বক্তব্য তিস্তায় জল নেই। এক্ষেত্রে কেন্দ্র বলে যে জল নেই বলেই চুক্তি করতে হচ্ছে। জল থাকলে চুক্তির প্রয়োজন হতো না। পঞ্চমতঃ এখন যে চুক্তি হবে তা অন্তবর্তী চুক্তি। আগামী দশ বছর তিস্তার জলের প্রবাহ দেখে ওই অন্তবর্তী চুক্তি স্থায়ী করা হবে কিনা, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাই ১০ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বৈঠকে বরফ গলানোর চেষ্টা চলে। কিন্তু মমতাকে তিস্তা প্রশ্নে অনড় থাকতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে রঞ্জন মাথাই বলেন, ''এই অঞ্চলের ভূ-কৌশলগত সমস্যাটা বুঝতে হবে। প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর থেকে উপরে গিয়ে রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে মমতাকে। কারণ, ভারতের ক্ষেত্রে সামরিক ও কৌশলগত কারণে বাংলাদেশে সুস্থির সরকার প্রয়োজন।''[৮৫]

২০১২ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন এবং শেখ হাসিনার উপদেষ্টা গওহর রিজভীর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমের সঙ্গে বৈঠক হয়। তিস্তা চুক্তি থেকে সীমান্তে শান্তি প্রভৃতি বিষয়ে দুদেশের স্বরাষ্ট্র দপ্তর বিষয়ক আলোচনা হয় এই বৈঠকে।

সীমান্তে গুলি চালানো নিয়ে অস্বস্তি কাটাতে দিল্লী দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরমকে জানান যে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে মারধরের যে ঘটনা ঘটেছে, তা পুনরাবৃত্তি হবেনা। ওই ঘটনায় ১০৫নং ব্যাটলিয়ানের ৮ জওয়ানের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শালের প্রক্রিয়া শুরু করেছে BSF। তিনি আরও বলেন যে সীমান্তের ২৩টি BOP (বর্ডার

আউটপোস্ট) বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলিতে দুদেশই তাদের শক্তি বাড়াবে।[৮৬]

কূটনৈতিক শিবিরের মতে, ইতিহাসকে কাজে লাগাতেই হচ্ছে। কেননা যে সময়টিতে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত সফরে এলেন, তা সে দেশে ঘরোয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে তিন বছর হাসিনা ক্ষমতায় থাকার পর প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার হাওয়া; প্রকাশ্য ও গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র; ক্ষমতাচ্যুত করতে ইসলাম কট্টরপন্থীদের আন্দোলন তথা বিরোধী দল বিএনপির অতি সক্রিয় ভূমিকা প্রভৃতি কারণে ভারতের সঙ্গে বকেয়া চুক্তির নিষ্পত্তির মাধ্যমে কিছুটা ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছিল আওয়ামী লীগ।

বহু প্রতীক্ষিত তিস্তা চুক্তির বাস্তবায়ন হয়নি। ছিটমহল হস্তান্তর নিয়েও ভারতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনী বিল আনা প্রয়োজন, সে ব্যাপারে দিল্লির দীর্ঘসূত্রিতা। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে আপত্তিতে তিস্তা চুক্তির জল ঘোলা হওয়ার পাশাপাশি সীমান্তের অশান্তির জন্য অভিযোগের তির BSF এর দিকেও। সব মিলিয়ে যথেষ্ট বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় দুদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক। তা সত্ত্বেও এই বৈঠকে বন্দি প্রত্যার্পণ থেকে অনুপ চেটিয়ার হস্তান্তর-সব ব্যাপারেই ইতিবাচক আশ্বাস দেন সাহারা খাতুন।

২০১২ সালের ২৫-২৬শে মার্চ ভারতের প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী এম এম পালাম রাজু ঢাকা সফর করেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান সূচক সম্মান গ্রহণ করার জন্য।[৮৭] ২৯শে এপ্রিল বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দীপু মনি কলকাতা আসেন 'মাদার টেরিজা আন্তর্জাতিক সম্মান' গ্রহণের জন্য।

২০১২ সালের ৬ই মে রবীন্দ্রনাথকে সেতু করে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী এক নতুন গতি পেয়েছিল। কবির জন্মের সার্ধ শতবর্ষ উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকা এসেছিলেন ভারতের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক শেষে, ঢাকার জন্য ঘোষণা করেছিলেন একাধিক প্রকল্প। ভারতের ''বহুদলীয় বাধ্যবাধকতার' বিষয়টি ঢাকার গোচরে নিয়ে এসে তিস্তার ক্ষোভ খানিকটা প্রশমনের চেষ্টা করেন। এবং টিপাইমুখ নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের আশ্বাস দেন।

প্রধানমন্ত্রীর দূত হিসাবে প্রণব মুখোপাধ্যায় যে দিগদর্শন রচনা করেন তা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক

ও তাৎপর্যবাহী। তিনি ঐদিন যে সমস্ত বিষয়গুলি ঘোষণা করেন সেগুলি হলো—

১) ভারতের দেওয়া ১০০ কোটি ডলার ঋণের মধ্যে ২০ কোটি ডলার ফেরত দিতে হবে না ঢাকাকে। সেটিকে অনুদান হিসাবেই দেখছে দিল্লী। বাংলাদেশ যে সমস্ত প্রকল্প চিহ্নিত করবে, সেগুলিতেই ব্যায় হবে ওই অর্থ।

২) এই ঋণের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৬৩ মিলিয়ন ডলারের ৫টি প্রকল্প নিয়ে দুদেশের মধ্যে চুক্তি সই হয়ে গিয়েছে। ভারত থেকেই শ্রমিক ও যন্ত্র প্রযুক্তি নেওয়ার শর্তও এখন শিথিল করা হচ্ছে।

৩) ৮০ কোটি ডলারের ঋণের সুদের হার ও ১.৭৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১ শতাংশ করা হচ্ছে।

৪) যৌথ নদী কমিশনের অধীনে একটি সাব গ্রুপ তৈরি করা হবে, যারা টিপাইমুখের প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ প্রকল্পের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখবে। ওই প্রকল্পে বাংলাদেশ সরাসরি অংশও নিতে পারে।

৫) খুলনায় এন টি পি সি ১৩২০ মেগাওয়াটের একটি বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়তে চলেছে।

৬) ত্রিপুরায় পালটানায় যে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে আশুগঞ্জ বন্দর ব্যবহার করতে দিয়ে বাংলাদেশ সাহায্য করছে, তা থেকে তাদেরও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেওয়া হবে।

৭) শীঘ্রই বাংলাদেশকে রেলের কিছু কামরা ও লোকোমোটিভ ইঞ্জিন দেওয়া হবে।[৮৮]

প্রণব মুখোপাধ্যায় আরো বলেন যে, ''আমরা তিস্তা চুক্তির মতো বেশ কিছু বিষয়ের দ্রুত নিষ্পত্তি চাই। এটাও ঠিক যে আন্তর্জাতিক চুক্তি রূপায়নের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আবার বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকলকে সঙ্গে নিয়েই চলতে হয়। বিশেষত শরিকদের। তাই ঐকমত্য তৈরি করতে কিছু সময় হয়তো লাগতে পারে; কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা নিয়ে সন্দেহ রাখবেন না।''[৮৯] দিল্লী ফেরার আগে বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গেও বৈঠক করেন। এবং তিনি বলেন ''সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যাতে দুর্বল না হয় সেটা দেখতে হবে। পারস্পরিক আলোচনায় সমস্যা মেটানোর অভ্যাস অনেক জটিলতা এড়াতে পারে।''[৯০]

৭ই মে নয়াদিল্লীতে দুদেশের যৌথ উপদেষ্টা কমিশনের প্রথম বৈঠকে তিস্তার প্রসঙ্গটি জোরালো ভাবে উত্থাপন করেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দীপু মনি। সেই সঙ্গে ছিটমহল হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তিটিও যাতে ভারত দ্রুত অনুমোদন করিয়ে নেয়, সে ব্যাপারেও বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি। এই বৈঠকে বাণিজ্য থেকে নিরাপত্তা, শিক্ষা থেকে জলসম্পদ, সব বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়। বৈঠকের পর কৃষ্ণ জানান, ''আমরা শক্তিক্ষেত্রে পারস্পরিক সমন্বয়ের বিষয়টি খতিয়ে

দেখেছি। আশা করছি, ২০১৩ সালের গ্রীষ্মের মধ্যেই ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে পাঠাতে পারব। তাছাড়া ২০১৬ সালের মধ্যে যৌথ উদ্যোগে ১৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করার পথেও এগোচ্ছি আমরা।"[৯১] ৮ই মে ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম এবং জলসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী পবন বনশলের সঙ্গে বৈঠকে দীপু মনি সাফ জানান, জোট রাজনীতির বাধ্যবাধকতা অথবা সংসদে আইন পাশ করার নিয়মকানুন— এসমস্ত একান্তই ভারতের 'নিজস্ব ব্যাপার বা সমস্যা'। তা সামলে কীভাবে তারা বাংলাদেশকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করবে, সেটা তাদের বুঝতে হবে। এইভাবে ভারতকে একটি জোরালো বা তির্যক মন্তব্যে বিঁধেছে বাংলাদেশ। এইভাবে বাংলাদেশ একদিকে 'নির্ভরশীলতার তত্ত্ব'কে ব্যবহার করেছে অন্যদিকে দরকষাকষির তত্ত্বকেও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছিল।

৪-৬ই আগস্ট কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের দূত হিসাবে ঢাকা সফর করেন। এবং ৫ই আগস্ট তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেন। সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে বিদেশ মন্ত্রক পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। তাই রমেশ জানান, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্ত চুক্তিটি সই হয়ে যাওয়ার পরেও তা রূপায়িত হচ্ছেনা। এর ফলে দুদেশের মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে। শেখ হাসিনা বলেছিলেন যে, সন্ত্রাস দমন থেকে বাণিজ্য সব বিষয়েই দু-দেশের মধ্যে সম্পর্কের যথেষ্ট অগ্রগতি হচ্ছে। কিন্তু দুটি বিষয় নিয়ে দীর্ঘসূত্রিতাই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কিছুটা জটিলতা তৈরি করেছে।[৯২]

তিস্তার জলের দাবী এবং ছিটমহল হস্তান্তর- দুইটি বিষয়ই পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। এবং রাজ্যের সম্মতিছাড়া এই বন্টন বা হস্তান্তর অসম্ভব। আবার বাংলাদেশকে ক্ষুব্ধ রাখাও বুদ্ধিমানেরকাজ নয়। ইতিমধ্যে মায়ানমারের সঙ্গে সেতু গড়তে গিয়ে টালবাহানার মূল্য দিতে হয়েছে ভারতকে। কারণ সেই অঞ্চলের বৃহৎশক্তি চীন তার বিপুল আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনে বিনিয়োগ করা থেকে মৈত্রী ও শুভেচ্ছার বাতাবরণ তৈরি করেছে মায়ানমারের সঙ্গে। বাংলাদেশের সঙ্গেও চীনের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো। তবে নয়াদিল্লির দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে বাংলাদেশ চীনের দিকে ঝুঁকে পড়তেই পারে। সেক্ষেত্রে ইতিমধ্যে পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কার মতো চীনা মিত্রদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে ভারত বধ্যভূমিতে পরিণত হবে। বিশেষত ভূটানের মতো নয়াদিল্লির উপর নির্ভরশীল দেশ যখন বেজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে তৎপর। ছিটমহল ও তিস্তার জল নিয়ে জট খুলতে নয়াদিল্লির আগ্রহের তাই স্পর্শগ্রাহ্য প্রমাণ প্রয়োজন। কেবলমাত্র মৌখিক অঙ্গীকার তা নিমিত্তমাত্র। আর জোটধর্ম ও যুক্তরাষ্ট্রীয়তার কর্মনীতি অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েও কূটনৈতিক অভিযানে সফল

হওয়া দুষ্কর। তাই প্রয়োজন সদর্থক পদক্ষেপ।

২০১২র ১৩ই আগস্ট ভারতে আসেন বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মহম্মদ এরশাদ। তিস্তা এবং স্থলসীমান্ত চুক্তি নিয়ে দিল্লির 'টালবাহানার' ফলে উদ্বিগ্ন শেখ হাসিনার দূত মহম্মদ এরশাদ দুদিন তিনি দফায় দফায় বৈঠক করেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিবশঙ্কর মেনন, বিদেশ সচিব রঞ্জন মাথাই ও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং প্রভৃতির সঙ্গে। এই বৈঠক প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র সৈয়দ আকবরউদ্দিন বলেন, ''বাংলাদেশের গণতন্ত্র এবং বহুদলীয় ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের চলতি কূটনৈতিক বিনিময়েরই অঙ্গ এরশাদের এই সফর।''[৯৩] এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের উদ্বেগের বিষয়গুলি এরশাদ মনমোহনকে বলেন। সরকার তিস্তা চুক্তির ব্যাপারে যে আশাবাদী তা এরশাদকে বোঝান ভারতের প্রধানমন্ত্রী। মনমোহন আরো বলেন যে ভারত স্থল সীমান্তচুক্তির ব্যাপারে সংবিধান সংশোধন পথে এগোচ্ছে যার জন্য দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন ভারতের পার্লামেন্টে। তাই প্রয়োজনীয় ঐক্যমত গড়ে তোলার কাজ চালাচ্ছে সরকার।

এ প্রসঙ্গে এরশাদকে যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব দিয়েছিল নয়াদিল্লি। নিরাপত্তা এবং কৌশলগত ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন পরে ঢাকার পক্ষ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছিল। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট ভারত বিরোধী জঙ্গীদের মোকাবিলার প্রশ্নেও সহযোগীতা দিল্লির কাছে জরুরী। হাসিনার সঙ্গে এরশাদের সাম্প্রতিক মতবিরোধ নয়াদিল্লীর অজানা নয়। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সুস্থিতির স্বার্থে এরশাদের ক্ষোভ প্রশমিত করাটাও ভারতের পক্ষে আবশ্যক। এই বৈঠকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও কথা হয় মনমোহনের। ইসলামী কট্টরপন্থা যাতে, বাংলাদেশে মাথাচাড়া দিতে না পারে, বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে সে জন্য উদ্যোগী হতে অনুরোধ করেন মনমোহন।

অন্যদিকে ২৭শে আগস্ট ভারত বরাক নদীর উপর টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে বাংলাদেশের মনে যাতে 'সংশয় সন্দেহ' না থাকে, তা নিশ্চিত করতে ঐদিন একটি বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করে নয়াদিল্লি। দুদেশের মধ্যে যৌথ নদী কমিশনের অধীনে টিপাইমুখ সংক্রান্ত বৈঠকে এই প্রকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ঢাকার হাতে তুলে দেওয়া হয়। দেওয়া হয়েছিল ৬ খন্ডের বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট DPR। পাশাপাশি নয়াদিল্লির পক্ষ থেকে ঢাকাকে জানিয়ে দেওয়া হয়, চাইলে ভারতও এই প্রকল্পে লগ্নি করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে যৌথ অংশীদারীত্বে প্রকল্পটি তৈরি করা হবে।[৯৪]

২৯শে আগস্ট তেহরানে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহও

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ঐ দিন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়। যদিও ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য, অন্যদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো নয়াদিল্লির উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু বাংলাদেশে শান্তি ও স্থিতি বজায় থাকাটা ভারত তথা গোটা দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এদিনের বৈঠকে বিনিয়োগ সহ বিভিন্ন আর্থিক বিষয়েও সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ সরকারকে।

এক্ষেত্রে সমসাময়িক পরিস্থিতিতে মনমোহন-হাসিনা বৈঠককে খুবই গুরুত্ব দেয় ভারতের বিদেশমন্ত্রক। কারণ বাংলাদেশে নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছিল, সে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তত উত্তাল হচ্ছিল। তাই গোটা অঞ্চলের শান্তি, সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার প্রশ্নে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগ রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নিজে এবং বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণ নিয়মিত কূটনৈতিক যোগাযোগ রেখেছিলেন বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল ও আফগানিস্তানের সঙ্গে। যা ভারতের কাছে দক্ষিণ এশিয়ার দায়বদ্ধতার প্রশ্নে আবশ্যক করণীয়।

২০১২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ভারতে এসেছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তথা হাসিনা সরকারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা সৈয়দ আসরাফুল ইসলাম। তিনি ভারতে এসে বৈঠক করেন রাহুল গান্ধীর সঙ্গে। আসরাফুলের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন (NGO) গুলির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন রাহুল। ওই সংগঠনগুলি সরকারের কাজে বাধা দেয় কিনা তা জানতে চাওয়ার পাশাপাশি সেগুলির আড়ালে মৌলবাদী শক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে কিনা, তাও জানতে চেয়েছেন রাহুল। ঐ বৈঠকের পর আসরাফুল বলেন, ''রাহুল গান্ধীর সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের সামাজিক পরিস্থিতি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির কর্মসূচী নিয়ে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তবে এটা ঠিকই, কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ধর্মীয় মৌলবাদী হিসেবেই পরিচিত। পশ্চিম এশিয়া থেকে এদের অর্থের জোগান আসে। কিন্তু সেগুলির বেশীরভাগই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।''[৯৫] এই মাসের ১০ তারিখ বাংলাদেশের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ ভারতে আসেন বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে দুটি নৌকা 'পদ্মা' ও 'চপলা' উপহার দেওয়ার জন্য। যা দুই দেশের সংস্কৃতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম।

অক্টোবর মাসের ১১ তারিখ সত্যজিত রায়ের পূর্বপুরুষের বাড়িকে ঘিরে পর্যটন এলাকা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয় শেখ হাসিনা সরকার। এ কাজের প্রাথমিক খরচ হিসাবে ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দও

করা হয়। এ প্রসঙ্গে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রকের সচিব শফিক আলম মেহেদি বলেন, দুই বাংলার মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও আত্মিক মেলবন্ধন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

২৮শে অক্টোবর বাংলাদেশের বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়া ভারত সফরে আসেন। বাংলাদেশের বহু দলভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের নিবিড় যোগাযোগের অধ্যায় এই সফর। দ্বিপাক্ষিক সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হলেও এই সফর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে আরো গতি দিয়ে দিয়েছিল।[৯৬] প্রকৃতপক্ষে ভারতের বিদেশনীতি ভারসাম্য রক্ষার পক্ষপাতী। অর্থাৎ কোন দেশের সরকারের পাশাপাশি সেখানকার বিরোধীদলকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। পারভেজ মুশারফ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বিরোধী নেতা নওয়াজ শরিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাজপেয়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় বিল ক্লিন্টনের পাশাপাশি জর্জ বুশের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। মায়ানমারে জুন্টা সরকারের সঙ্গে তিক্ততা না বাড়িয়ে সু-চির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে ভারত।

শেখ হাসিনার সঙ্গে সু সম্পর্কের কারণে ভারতের প্রতি বিরুপ মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেছিলেন খালেদা জিয়া। বিভিন্ন সময় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশও ঘটেছে। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে ভারত বিরোধীতাকে লঘু করেছিলেন। বিদেশমন্ত্রকের মতে, বিশ্বায়ন ও আর্থিক সংস্কারের যুগে ভারতের বিরোধীতা না করে তাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক পোক্ত করলে বাংলাদেশের জনমতে প্রভাব বেশী পড়তো বলেই মনে করছেন খালেদা। তবে, ‘‘খালেদা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে ক্ষমতায় এলে নিরপত্তা নিয়ে ভারতের উদ্বেগকে তাঁরা গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন।’’[৯৭] নভেম্বর মাসের ৮ তারিখ বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী ভারতে আসেন কৃষিক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে বৈঠক করার জন্য।

২০১২ র ১লা ডিসেম্বর অনুপ্রবেশকারী বনাম ভূমিপুত্রদের বিবাদ নিয়ে যখন নামনি অসম উত্তপ্ত, তখন অসম সফরে আসা বাংলাদেশের সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জানিয়েছিলেন, অসম তথা ভারতীয় ভূখন্ডে বাংলাদেশীদের অবস্থান বা অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত পাঠানো নিয়ে আজ অবধি ভারত-বাংলাদেশ কোনও আলোচনাই হয়নি। বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা বলেন, ভারত সরকার যদি অনুপ্রবেশকারী প্রত্যপর্ণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় উদ্যোগী হয়, তবে প্রমাণ সাপেক্ষে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশী নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য। তারা আরো দাবী করেন যে ফেন্সিডিলের মতো

মাদক ঔষধ পাচার হয়ে বাংলাদেশের যুব সমাজের বিরাট ক্ষতি করছে।[৯৮]

২-৪ই ডিসেম্বর ঢাকাতে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তিস্তা চুক্তি অথৈ জলে। ছিটমহল হস্তান্তরও বিরোধীতার কাঁটা। বাংলাদেশের হাত ধরে এগিয়ে যেতে এখন তাই লক্ষ্মীই ভরসা ভারতে। দুদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক পোক্ত করতে একজোট হয়েছিলেন সীমান্তের দুপারের শিল্পপতি বিনিয়োগকারীরা, যাকে তাঁরা বলছেন,— অর্থনৈতিক কূটনীতি। এবিষয়ে সমস্যার জায়গাটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঢাকায় ভারতের হাই-কমিশনার পঙ্কজ সারণ বোঝালেন, ‘‘বাণিজ্যের মোট পরিমাণ বাড়াতে গেলে শুধু ভারত থেকে আমদানি বাড়ালেই চলবে না। ভারতকে বাংলাদেশী পণ্যের রফতানিও বাড়াতে হবে।” অথচ সেটা দশভাগের একভাগ। কারণ বাংলাদেশে যা তৈরি হয়’ তার প্রায় সবই ও দেশে পাওয়া যায়। সারণের ব্যাখ্যা, ‘‘সেই জন্যই আমরা বলছি, ভারতীয়রা এ দেশে বিনিয়োগ করুন। বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গড়ে উঠুক। এখানে যে পণ্য তৈরি হবে, তা ভারতে তো বটেই অন্য দেশেও রফতানি হতে পারে। তাতে দুদেশেরই লাভ।” ডেপুটি হাই কমিশনার সন্দীপ চক্রবর্তীর কথায়, ভারতের সঙ্গে চিনের বাণিজ্য ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব প্রায় পুরোটাই বেজিংয়ের। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ কাজ দিল্লিকেই করতে হবে।[৯৯] বাণিজ্য মেলাতে ভারত সোনার গহনা ও শাড়ি প্রভৃতি বাংলাদেশে রপ্তানির উদ্যোগ নেয়।

এরই সূত্রধরে ১৬ই ডিসেম্বর কলকাতায় বাংলাদেশের নতুন বাণিজ্যমন্ত্রী গোলাম মহম্মদ কাদের বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতকে বাদ দিয়ে উন্নয়নের কোন পরিকল্পনাই হতে পারে না। আর বাংলাদেশকে সহযোগিতার বিষয়ে মনমোহন সিংহ সরকারের সদিচ্ছা নিয়েও কোনও প্রশ্ন ওঠে না। প্রায় সব বাংলাদেশী পণ্যের প্রবেশ শুল্কমুক্ত করে দেওয়ার পর ভারতে, বিশেষত উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে এখন বাংলাদেশ থেকে নানা পণ্য আসছে। চেকপোস্ট ও পণ্য পরিবহনের মাধ্যমগুলিকে মসৃন করে আমদানি-রফতানি আরও বাড়ানো যায়। তার বন্দোবস্তও হচ্ছে। কিন্তু কাদেরের মতে ব্যবসার চেয়েও শিল্প এখন অনেকবেশী প্রয়োজন বাংলাদেশের। কারখানা হলে কাজ আসবে হাতে, বাড়বে জীবিকা। ‘মানুষের উন্নয়ন হলেই তবেই না দেশের উন্নয়ন’। তাঁর কথায়, ‘‘ভারতের সহযোগিতাতেই বিজয় অর্জন করেছি আমরা। আর আজকের বিজয় দিবসে ভারতীয় বিনিয়োগই হতে পারে সব চেয়ে বড় উপহার।”[১০০]

সমসাময়িক সময়ে দিল্লি বিরোধীতা কমিয়ে নতুন কৌশল অবলম্বন করেন বিরোধী নেত্রী খালেদা

জিয়া। মুখে ভারত বিরোধী কোনও বিবৃতি না দিলেও খালেদা জিয়া পেছন থেকে গোটা পরিস্থিতিকে কাজে লাগাচ্ছিলেন। আওয়ামি লীগের এম পি আব্দুর রহমানের কথায়, ‘‘পাকিস্তানের হাতে তামাক খেয়ে ভারতকে যতটা সম্ভব চাপে রাখতে জামাত প্রবলভাবে সক্রিয়। দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ভারতকে সবসময় অস্বস্তিতে রাখতে পারলে বেশকিছু গোষ্ঠীর স্বার্থ সিদ্ধি হয়। এই কাজে পশ্চিম এশিয়ার কিছু দেশও টাকা ঢালছে।”[১০১] হাসিনা শিবিরের বক্তব্য, বৃহত্তর ভূ-রাজনীতির কথা মাথায় রেখে বেগম জিয়া কৌশলগতভাবে প্রকাশ্য ভারত বিরোধীতা বন্ধ রেখেছেন ঠিকই। কিন্তু ক্ষমতায় এলেই তিনি ফের পুরনো অবস্থানে ফিরবেন। ভোট যত এগিয়ে আসবে, জামাতকে কাজে লাগিয়ে দেশে অস্থিরতা তৈরির কাজটিও এগোবে।

২০১৩ সালের ২৮-২৯শে জানুয়ারী ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্ধে ঢাকা সফরে যান। ঢাকাতে তিনি বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীরের সঙ্গে বন্দী প্রত্যর্পণ ও ভিসা আইন শিথিল সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে ভারতের ক্ষেত্রে যেমন উত্তরপূর্বের উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির নেতা কর্মীরা বাংলাদেশে ধরা পড়লে এবার ভারতেই নিয়ে গিয়ে বিচার করা যাবে। তেমনই বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা অপরাধ করে ভারতে আশ্রয় নিলে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী তাদের ধরতে পারলে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেবে। রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে অবশ্য এই বিধি কার্যকর হবে না। এবিষয়ে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই চুক্তিতে বাংলাদেশেরই লাভ বেশী। কেননা বাংলাদেশের অনেক দাগী দুষ্কৃতী ভারতে হয় জেলবন্দী নয় লুকিয়ে রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে যদিও ‘জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক’ মনে করা হয় তবে তাকে প্রত্যর্পন নাও করা হতে পারে।[১০২]

এছাড়াও দুদেশের মধ্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ভিসার নিয়মবিধিও শিথিল করা হয়। আগে চিকিৎসার জন্য ভিসার মেয়াদ ছিল তিন মাস তা একবছর করা হয়। শিক্ষার জন্য দুবছর থেকে পাঁচ বছর, পর্যটনের ক্ষেত্রে দুমাস থেকে একবছর; শিশু ও বৃদ্ধদের ভিসা হ্রাস; ব্যবসায়ীদের জন্য ভিসার নিয়ম শিথিল সম্পর্কিত চুক্তি হয়। যা থেকে উভয় দেশ উপকৃত হচ্ছে।

২৯শে জানুয়ারী বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী গোলাম মহম্মদ কাদের নয়াদিল্লি আসেন এবং ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী আনন্দ শর্মার সঙ্গে সীমান্তে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের (SEZ) জন্য বৈঠক করেন। কাদের বলেন রফতানি বাড়ানোর পাশাপাশি ভারতের বেসরকারী বিনিয়োগ টানার

ব্যাপারে জোর দিয়েছে শেখ হাসিনার সরকার। কারণ, ইউরোপ-আমেরিকায় বাংলাদেশের বিশেষ মর্যাদার কারণে সেখানে উৎপাদিত ভারতীয় পণ্য বিনাশুল্কে বা নামমাত্র শুল্কে এইসব উন্নতদেশের বাজারে যেতে পারবে। চিন, দক্ষিণ কোরিয়াসহ বেশ কিছু দেশ এই সুযোগে বাংলাদেশে কারখানা গড়তে আসছে। ঢাকা চায় ভারতও এর সদ্ব্যাবহার করুক। আর সে জন্য তিনটি SEZ করা হচ্ছে ভারতের গা ঘেঁষে। কাদের আরো বলেন, আর সমস্ত বিষয় নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও দেশের স্বার্থে যে বিদেশী লগ্নি চাই, এনিয়ে বাংলাদেশের শাসক ও বিরোধীদল একমত। এনিয়ে বিশেষ বিরোধীতা নেই। তিনি আরোও বলেন যে ‘‘আনন্দ শর্মাকে জানিয়েছি, এখানকার বিশেষ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করুক ভারতীয় সংস্থা, বিনিয়োগ করুক। বাংলাদেশে কারখানা গড়তে এগিয়ে আসুক তারা। ভারতীয় বাণিজ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবরকম সহযোগীতা করা হবে।”[১০৩]

২০১৩-র ৩রা ফেব্রুয়ারি ভারতের বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরশিদ নয়াদিল্লিতে বলেন, ‘‘দীর্ঘদিন ধরে স্থলসীমান্ত চুক্তিটি ঝুলে রয়েছে। আমাদের দুই বন্ধু দেশের কর্তব্য নিজেদের মধ্যে এর মীমাংসা করে নেওয়া। দুদেশের মধ্যে আস্থা বাড়ানো গেলে এর থেকেও জটিল বিষয় আমরা অনায়াসে সমাধান করে ফেলতে পারি।”[১০৪] অন্যদিকে এইসময় পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তা নিয়ে তাঁর গড়া কল্যাণ রুদ্র কমিটিকে এগোতে বারণ করেন। এই কমিটির রিপোর্ট কি? সরকারী সূত্রের বক্তব্য, রুদ্র কমিটি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছে, তিস্তার সেতুটি রয়েছে গাজলডোবাতে। এখান থেকে ভাটিতে আরো ৭২ কিলোমিটার এগিয়ে বুড়িগ্রামের কাছে বাংলাদেশে ঢুকেছে নদীটি। তিস্তার ভাটিতেই জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ীর মতো শহর রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের বসবাস সেখানে। ফলে বাংলাদেশকে জল না দিয়ে গাজলডোবা ব্যারাজ থেকেই যদি সব জল সেচের কাজে তুলে নেওয়া হয়, তাহলে এ দেশের ১৫ লক্ষ বাসিন্দার জীবন জীবিকা নষ্ট হবে। তাছাড়া বাস্তুতন্ত্রের নিয়মেই নদীর জীবন তার প্রবাহমানতা। নদীর জল আটকে সেচের জন্য তুলে নিলে নদীর অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে। কমিটির মতে, সেই কারণেই তিস্তার স্বাভাবিক জলপ্রবাহ আটকে দেওয়া উচিত হবে না। যার অর্থ, এপারে তিস্তার গতি অক্ষত রাখতেই বাংলাদেশকে জল দেওয়া ছাড়া গতি নেই। অন্যথায় তিস্তাই শুকিয়ে যাবে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক আইন বলছে, একাধিক দেশের মধ্যে বয়ে চলা কোনও নদীর জল সকলে মিলেই ভাগ করে নিতে হবে। এছাড়া তিস্তার উপর সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ মিলে প্রায় ২৩টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অবস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। তাই কেন্দ্রীয় জল কমিশন দোমহনি এবং

তিস্তাবাজারে নদীর জল প্রবাহ এবং জলের পরিমাণ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। ফলে রুদ্র কমিটির সুপারিশ চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে ভাবিয়ে তোলে।

সমসাময়িক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অস্থিরতা ভারতকে ভাবিয়ে তুলেছিল। একাত্তরের ঘাতক শিরোমনিদের ফাঁসি এবং মৌলবাদী জামাতে ইসলামীকে বয়কট ও নিষিদ্ধ করার দাবীতে ঢাকায় রাজপথে বাংলাদেশের আপামর জনগণ আন্দোলনে সামিল হয়। এই জনজোয়ার থেকেই দাবী ওঠে জামাতকে নিষিদ্ধ করার। সৈয়দ হাসান ইমাম বলেন, স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের ইতিহাস বারবার সেনাশাসনের বুটের নীচে চাপা পড়েছে। উন্নত গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। এখানে জামাতের মতো স্বাধীনতা বিরোধীদের জায়গা নেই। বিভিন্ন বক্তা বলেন, জামাতে ইসলামী সন্ত্রাসের আঁতুড় ঘর। জামাতে ইসলামী মৌলবাদের অন্ধকার। তাদের বয়কট করতে হবে।[১০৫]

২০১৩র ৮ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু কলকাতায় আসেন। তিনি বলেন বাংলাদেশের বিরাট বাজার খুলে যাচ্ছে এ রাজ্যের বাংলা সিনেমার কাছে। এ প্রসঙ্গে ইনু বলেন, ‘‘ভারতের সিনেমার অবাধ প্রদর্শনের জন্য আমরা যেমন উদ্যোগী হয়েছি, এদেশের উচিত বাংলাদেশের সিনেমা প্রদর্শনে বাধানিষেধ তুলে নেওয়া। তবে দু দেশের চলচিত্র শিল্পই লাভবান হবে। ভারতে বড় বড় মাল্টিপ্লেক্স তৈরির পরে হলে গিয়ে সিনেমা দেখার চলটা বেড়েছে। আমরা চাই ভারতের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে এ ধরনের বড় সিনেমা হল তৈরি করুক। যৌথ উদ্যোগে সিনেমার আধুনিক ল্যাবরেটরি ও স্টুডিও তৈরি হোক। হলিউড থেকে আধুনিক প্রযুক্তি আনা হোক বাংলা সিনেমায়। দু দেশের কলাকুশলীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও হোক।’’[১০৬] এপ্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমরা উদ্যোগী হয়েছি। শীঘ্রই বাংলাদেশের কিছু সিনেমা এদেশের হলে মুক্তি পাচ্ছে। বাংলাদেশেও অনেক ভালো সিনেমা হয়। সেগুলি যাতে এ বাংলার হলগুলিতে প্রদর্শন হয়, আমরা ও সে বিষয়ে চেষ্টা করছি। দুই বাংলার সিনেমাকে মেলানো গেলে কাউকে আর মুখ শুকিয়ে বসে থাকতে হবে না।’’[১০৭]

২০১৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী ভারতের বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরশিদ ঢাকা সফর করেন। ঢাকায় গিয়ে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দীপু মনির সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠকে ইতিমধ্যে জরিপ করে নতুন করে সীমান্ত নির্ধারণের যে কাজ শেষ হয়েছে— এ বিষয়ে ভারত ও বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক ১১৪৯ টি খণ্ড মানচিত্র বিনিময় করে। এছাড়া আর্থিক দুর্নীতি রোধ ও দ্বৈত কর আরোপ রুখতে একটি

চুক্তিতে সই করে দুই দেশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে সহযোগিতা বিনিময়ের বিষয়েও কিছু বোঝাপড়া হয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারি খুরশিদ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক করেন। ঐ সময়ে শাহবাগ আন্দোলনের জনজোয়ার এর পরিপ্রেক্ষিতে বলেন ''আধুনিক বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া বিকল্প পথ নেই।'' তাই এ প্রসঙ্গে বলা যায় পৃথিবী জুড়ে মধ্যবিত্ত নাগরিক সমাজ এক গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক পৃথিবী গড়তে লড়াই করে চলেছে। আন্দোলনের বিশ্বায়নে বাংলাদেশও আজ নিজেকে যুক্ত করে নিল। তবে বৈঠকে ভারত বাংলাদেশকে ২০কোটি ডলার ঋণ দেবে বলে স্থিরীকৃত হয় এবং পদ্মার ওপর সেতু নির্মাণ সহ পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ঐ অর্থ ব্যয় হবে বলে জানান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচীব আবুল কালাম আজাদ।[১০৮]

তিস্তা চুক্তি প্রসঙ্গে মমতার অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে খুরশিদ বলেন, ''নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়েও আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা চাই না, উগ্রপন্থী শক্তি বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করে ভারতের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করুক। পশ্চিমবঙ্গ এমন একটি রাজ্য, যার বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্ত সবথেকে বেশী। আমি জানি, মমতা বোঝেন যে, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঠিক রাখার জন্য বাংলাদেশের সাহায্য প্রয়োজন।''[১০৯]

২০১৩-র ৩-৫ই মার্চ ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রী নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের আমন্ত্রণে ঢাকা সফর করেন। এই সফর ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরির পর দ্বিতীয় কোন ভারতীয় রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশ সফর। শাহবাগের আন্দোলনের বিরুদ্ধে জামাতের সঙ্গী বিএনপি। তাই প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে বিরত থাকেন বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়া। এতদসত্ত্বেও ভারতের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মহম্মদ এরশাদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেননের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন শাহবাগ আন্দোলন প্রসঙ্গে। এ প্রসঙ্গে মেনন বলেন, মুক্তিযুদ্ধে যে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়ার কথা ছিল, কিন্তু শাসকদের ধারাবাহিক আপসে আজও হয়ে ওঠেনি, শাহবাগ সেই খামতিটাকেই দাবী হিসেবে তুলে ধরেছে।[১১০]

ভারতীয় কূটনীতির ইতিহাসে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের তিনদিনের বাংলাদেশ সফর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে পরিগণিত হয়। উনচল্লিশ বৎসর আগে ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি ঢাকায় পা রেখেছিলেন। বাস্তবিক দিক থেকে, উচ্চতম ভারতীয় পদাধিকারীদের বাংলাদেশ বিষয়ে এই অনীহা

বাংলাদেশকে হয়তো খানিকটা ক্ষুণ্ণ করেছিল। তবে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সফর প্রমাণ করে ভারতের কুটনীতির মানচিত্রে বাংলাদেশের স্থান পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু কেবল সফরের সিদ্ধান্ত নয়, সিদ্ধান্তকে পূর্বনির্ধারিত সূচী অনুযায়ী কার্যকর করাই ছিল ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। শাহবাগ আন্দোলন চলাকালীন, প্রবল রাজনৈতিক উত্তেজনা, হিংসা, সংকট ও তীক্ষ্ণ জাতীয় দ্বিধাবিভাজনের প্রেক্ষিতেও যখন ভারতীয় রাষ্ট্রপতির বিমান ঢাকাতে নামল তা ঐতিহাসিকতার অবকাশ রাখে।

এক্ষেত্রে প্রণব মুখোপাধ্যায় তাঁর সফরকে যতই অরাজনৈতিক বুলন না কেন, রাজাকার বিরোধী, মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনের শিখর চুম্বিতার মুহূর্তে ভারতের রাষ্ট্রপতিও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনা ও আন্তরিক সম্পর্ক প্রদর্শনের মধ্যে ভারতের দিক থেকে একটি স্পষ্ট রাজনৈতিক বার্তা ছিল। আন্দোলনের তথা হাসিনার স্বপক্ষে ভারতের রাজনৈতিক সমর্থন খর সূর্যালোকের মতো চোখ ধাঁধানো সত্য।

২১শে এপ্রিল পদ্মশ্রী সম্মান নিতে দিল্লিতে আসেন প্রথম বাংলাদেশী মহিলা গান্ধীবাদী সমাজকর্মী ঝর্ণাধারা চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘‘বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে ভারত সহযোগীতা করেছে। কিন্তু সম্মান জানালো এই প্রথম।”[১১১] যা ভারত-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে তুলে ধরে।

১০ই জুন মিজোরামের লেংপুই বিমানবন্দরের কাছে লেংটে এলাকায় আসাম রাইফেসল এর জওয়ানরা হানা দিয়ে সেখানকার একটি বাড়ি থেকে ২৩টি এ কে ৪৭ রাইফেল, একটি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও একটি মেশিনগান উদ্ধার করে। এছাড়া আইজল এলাকা থেকে ৮টি এ কে ৪৭, প্রচুর গুলি ও কার্তুজের খোঁজ মেলে। পুলিশ জানায়, অস্ত্র ঘাঁটি থেকে গ্রেফতার তিনজনের কাছ থেকে জানা যায়, তারা ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি’ নামে বাংলাদেশের একটি জঙ্গী সংগঠনের সদস্য। মায়ানমার থেকে অস্ত্রগুলি কিনে নিয়ে এসে সেগুলি বাংলাদেশে ওই সংগঠনের চট্টগ্রাম ঘাঁটিতে পাঠানো হচ্ছিল। অস্ত্রপাচারে নাগা জঙ্গিরাও জড়িত। নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ওই অস্ত্র পাচারচক্রের তদন্ত ভার নেয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এর এন আই এ। যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে খানিকটা ভাবিয়ে তোলে।[১১২]

অন্যদিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েও ঘরোয়া ঐকমত্যের অভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তা ও স্থলসীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়িত করে উঠতে পারেনি। কিন্তু সে দেশের পরিকাঠামো প্রকল্প থেকে শুরু করে শক্তি, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য-সব ক্ষেত্রেই ঢালাও সহায়তার পথে হেঁটেছিল নয়াদিল্লি। শেখ হাসিনার ভারত

সফরের সময় ৬৪০০ কোটি টাকার ঋণ ঘোষণা করেছিল ভারত। এই ঋণে প্রথমে ভারত ১.৭৫ শতাংশ সুদ ধার্য করেছিল কিন্তু পরে তা কমিয়ে ১ শতাংশ করে। বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানায়, এই ঋণ কোন প্রকল্পে ব্যবহার হবে তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই টাকায় বাংলাদেশ ৪২৮টি উন্নত বাস কিনেছে, কেনা হয়েছে ব্রডগেজ লাইনে চলার উপযোগী ১৬৫টি তেলবাহী ওয়াগন এবং মিটারগেজে চলার মতো ৬টি ব্রেকভ্যান। তৈরি হয়েছে ভৈরব এবং তিতাস সেতু। ঋণের ১৬০০ কোটি টাকা অনুদান হিসাবে ঘোষণা করেছে ভারত। হাসিনা সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে পদ্মা সেতু নির্মাণে ওই অর্থ খরচ করা হবে। এবিষয়ে ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন বাংলাদেশকে দেওয়া বিভিন্ন সহায়তা প্যাকেজের বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেছে।[১১৩]

২০১৩ সালের ২৫-২৬শে জুলাই বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী দীপু মণি নয়াদিল্লি সফরে আসেন। উক্ত সময়ে ভারতের দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের মেয়াদ শেষের মুখে অন্যদিকে বাংলাদেশেও নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছিল। এইরকমএকটি আপৎকালীন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দূত হিসাবে মরিয়া ভারত সফর ছিল দীপু মনির। তিস্তা ও স্থলসীমান্ত চুক্তির ব্যাপারে তিনি বৈঠক করেন ভারতের সংসদে বিরোধী নেত্রী সুষমা স্বরাজ ও নেতা অরুণ জেটলির সঙ্গে। এক্ষেত্রে বিজেপির অসম ও পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রবল আপত্তিতে চুক্তিগুলি আটকে গিয়েছিল। তাই তারা এ বিষয়ে ইতিবাচক কোন বার্তা দেননি দীপু মনিকে। ঐ সময়ে বাংলাদেশে যুদ্ধপরাধীদের বিচার নিয়ে দীপুমনি বলেন, ‘‘বাংলাদেশের মানুষ ৪২ বছর ধরে এই বিচারের জন্য অপেক্ষা করেছেন। নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে বিচার হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমরা আন্তর্জাতিক বিধি মেনে চলেছি।” আরো বলেন, ‘‘শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেক বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে। যার ফলে ভারত-বাংলাদেশের পুরনো বন্ধন আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে।”[১১৪] ভারতীয় নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে তার বার্তা, ‘‘আসুন আমরা একসঙ্গে বেড়ে উঠি। আর সেই বৃদ্ধির যোগসূত্র হোক নদী।”[১১৫]

দীপু মনির ভারত সফরের আনুষ্ঠানিক উপলক্ষ আর কে মিশ্র স্মারক বক্তৃতা দেওয়া। সংবাদ মাধ্যমে, কূটনৈতিক কর্তা এবং বেশ কিছু রাষ্ট্রদূতের সামনে ‘ভারত-বাংলাদেশ ভবিষ্যৎ সম্পর্ক এবং গোটা দক্ষিণ এশিয়ার নদী অববাহিকা ভিত্তিক যৌথ ব্যবস্থা’ বিষয়ক বক্তৃতায় উপস্থাপনা করেন যে—দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং জীবনযাত্রাকে সমৃদ্ধ করতে এই যৌথ অববাহিকা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুদেশের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। তাই আমাদের দুদেশের সম্পদ ভাগাভাগি করে নেওয়ার মধ্যেই

লুকিয়ে রয়েছে এগিয়ে যাওয়ার সূত্র। এরপর তিনি মনমোহন সিংহ এবং সলমন খুরশিদের সঙ্গেও বৈঠক করেন এবং তিস্তা ও স্থলসীমান্ত চুক্তি সম্পর্কে দীপু মনির গলায় হতাশার সুর চিহ্নিত হয়। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন এই দুটি চুক্তি ফলপ্রসূ না হলে বাংলাদেশের নির্বাচনে কি তার প্রভাব পড়বে? এই প্রশ্নের উত্তরে দীপু মনি বলেন, ‘‘চুক্তিগুলি সম্পন্ন না হলে তা অবশ্যই হতাশাজনক হবে। তারপরিনামও দেশে পড়তে পারে। কিন্তু মানুষ তো দেখছেন যে আগের সরকার এই বিষয়গুলিতে আদৌ উদ্যোগীই হয়নি। এগুলি তো আজকের বিষয় নয়, দশকের পর দশক জুড়ে ঝুলে রয়েছে। হাসিনা সরকার যে এই চুক্তিগুলির অন্তিম পর্যায়ে নিয়ে এসেছে, আশা করি সেটা এখন সবাই বুঝবেন।’’[১১৬] তাই স্বাভাবিকভাবে অপ্রত্যাশিত বদনে খালি হাতেই ঢাকা ফিরতে হয় দীপু মনিকে।

২০১৩ সালের ১লা আগস্ট ঢাকা হাইকোর্ট জামাতে ইসলামীর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার রায় দেয়। তার ফলে বাংলাদেশে স্বাধীনতার সময়ে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে লুঠপাট খুন ধর্ষণ চালানোয় অভিযুক্ত এই দলটি রাজনৈতিক কর্মসূচী পালন করতে পারলেও প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। অন্যদিকে জামাতের নেতারা জেলে স্বাধীনতা যুদ্ধেরসময় মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য একের পর এক শাস্তি পাচ্ছিলেন। এরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। চারবছর শুনানিরপর হাইকোর্টের এই রায়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষেরা উল্লসিত। শাহরিয়ার কবির, মুনতাসির মামুন, কামাল লোহানীর মত বিশিষ্টজনেরা সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছিলেন, জামাতে ইসলামীকে এবার নিষিদ্ধ করা হোক। তাঁদের অভিযোগ, আদতে জঙ্গী সংগঠন জামাত গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র তাদের শেকড় ছড়িয়েছে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে তালিবান ধাঁচের শাসন প্রতিষ্ঠা এই দলটির ঘোষিত লক্ষ্য।[১১৭] এইরকম পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে।

এইসময় বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার তরজা চরম রূপ লাভ করে। খালেদা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ভোটের দাবী তোলেন। এক্ষেত্রে হাসিনা সংসদে ঘোষণা করেন যে ‘‘আমেরিকা, ভারতসহ বিশ্বের সব দেশে সরকারকে রেখে নির্বাচন হয়। ভোট হয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে। বাংলাদেশেও তাই হবে।’’ হাসিনা সরকারের মন্ত্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, ‘‘গণতান্ত্রিক অধিকার হরনের ঘটনা বারেবারেই ঘটেছে বাংলাদেশে। কখনও রক্তাক্ত, কখনও অবার রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখল হয়েছে। চক্রান্তকারীদের আর কোনও সুযোগ দিতে চায় না সরকার। সেজন্যই প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, কোন অনির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা

তুলে দেওয়া হবে না।"[১১৮] এই অশান্তি ও সংঘাতের বাতাবরণে শেষ পর্যন্ত ভোটটা হবে কিনা, সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নাগরিক আন্দোলনের নেতা শাহরিয়ার কবিরের কথায়, ইতিহাস বলছে— এমন সঙ্কট যখনই এসেছে, অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করেছে অপশক্তি। তাহলে স্বৈরতন্ত্রই কি ভবিতব্য বাংলাদেশের? এই প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

২০১৩র ২৮সে সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদে প্রকাশিত হয় বেআব্রু সীমান্তের চর উজিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকছে নকল টাকার নোট। সি আই ডির এক কর্তা বলেন, মালদহের চর এলাকার বিস্তীর্ণ অংশের ভৌগোলিক অবস্থান এমন, যে পুলিশি নজরদারী কিংবা বিএসএফের টহলদারি সেখানে নিয়মিত করা সম্ভব নয়। সেই জায়গায়গুলি দিয়েই জাল নোট পাচার হয়ে আসছে। ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের হিসেব অনুযায়ী, দেশে জাল টাকার ৭০ শতাংশই পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে ঢোকে। গত পাঁচ বছরে এ রাজ্যে প্রায় ১৭ কোটি টাকার জাল নোট ধরা পড়েছে। আবার পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য পুলিশের হিসেবে, বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে যত জাল নোট ঢোকে, তার ৮০ শতাংশই ঢোকে মালদহের বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে এই জেলার কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর থানা। এনআইএর এক অফিসার বলেন, "মালদহের কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর থানার সঙ্গে জাল নোটের ব্যাপারে যতবার যোগাযোগ করতে হয়, দেশের আর কোনও থানার সঙ্গে আমাদের তা করতে হয় না।"[১১৯] প্রকৃতপক্ষে ভারতের অর্থনীতিকে পঙ্গু করার জন্য বাংলাদেশ হয়ে ভারতীয় জাল নোট এ দেশে ঢোকাচ্ছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই। গোয়েন্দাদের হিসেব— যত জাল নোট ধরা পড়েছে, তার অন্তত দশগুণ ইতিমধ্যেই বাজারে ছড়িয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে তিস্তার জলবন্টন চুক্তি এবং স্থলসীমান্ত চুক্তি নিয়ে ২৮শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভার অধিবেশনের ফাঁকে বৈঠক করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। মূলতঃ পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলি নিয়ে আলোচিত হলেও হাসিনা চুক্তি দুটির রূপায়নের জন্য বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনকে মাথায় রেখে ভারতের ওপর চাপসৃষ্টি করেন। বৈঠকের শেষে হাসিনা বলেন, দুটি চুক্তির বিষয়ে ভারতের জনগণ এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যা বাংলাদেশ তাঁদের কাছে আশা করে থাকে। চুক্তি দুটি কার্যকর করার ব্যাপারে কেন্দ্র উদ্যোগী হবে বলে আশ্বাস দেন মনমোহন সিংহ। এবং তিনি সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে স্থলসীমান্ত চুক্তি পাশ করানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন বলে ইঙ্গিত দেন বৈঠকে।[১২০]

২০১৩ সালের ৫ই অক্টোবর বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী বাস্তব রূপ পায়। সুইচ অন করতেই ভারতের বিদ্যুৎ ঢুকল বাংলাদেশের জাতীয় গ্রীডে। একইসঙ্গে ঐ দিন শিলান্যাসকরা হয় বাংলাদেশে বাগের হাটের রামপালে ভারতের আর্থিক সহযোগিতায় প্রস্তাবিত ১৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পেরও। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাক্ষী ছিলেন দুইদেশের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ও শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ বলেন, ‘‘ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্ব শুধু আরও দৃঢ় হল তাই-ই নয়, দুদেশের বাণিজ্য সম্পর্কে নতুন একটি মাত্রা যোগ হল।’’[১২১]

হাসিনার দিল্লি সফরের সময়েই দু দেশের মধ্যে শক্তি বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর হয়। তাতে ঠিক হয় বাংলাদেশ ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করবে। এরমধ্যে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেবে এন টি পি সি। বাকী ২৫০ মেগাওয়াট ভারতের অন্য যে কোনও সংস্থার কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনবে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ পর্ষদ। ঠিক হয়েছে, বাকী এই ২৫০ মেগাওয়াট পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা বিক্রি করবে। ঐদিন থেকে যে বিদ্যুৎ বাংলাদেশে যাচ্ছে তা পুরোটাই এন টি পি সির। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ পাঠাতে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে ৪০০ কেভির সাবস্টেশন তৈরি করেছে ‘‘পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন’’। বাংলাদেশের দিকে সাবস্টেশনটি হয়েছে ভেড়ামারায়। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রকের এক কর্তা বলেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ১৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিতে পারছে। ধাপে ধাপে তা বাড়ানো হবে।

রামপালে ‘‘মৈত্রী’’ তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পটি গড়ে তুলবে বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেন্ডশিপ কোম্পানী। এন টি পি সি এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে এই সংস্থাটি তৈরি হয়েছে। যদিও সুন্দরবন লাগোয়া এই প্রকল্পটির বিরোধীতা করে ইতিমধ্যেই পরিবেশ কর্মীদের একাংশ আন্দোলন শুরু করেছে। তবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটির শিলান্যাস করে আশ্বাস দেন যে— ‘‘বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি গড়ার সময় পরিবেশ রক্ষার দিকটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে। সুন্দরবন আমাদের দু দেশের ঐতিহ্য।’’[১২২] প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘‘রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ার সিদ্ধান্তে কেউ কেউ জলঘোলা করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পরিবেশের ক্ষতি হতে পারে এমন কোন প্রকল্পের অনুমোদন আমাদের সরকার দেয়নি, দেবেও না।’’[১২৩] প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বলেন, কোনও অবস্থাতেই রামপালে তাঁরা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়তে দেবেন না। যদিও বিদ্যুৎক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন আলোর সূচনা করে।

আবার তিস্তার জল ভাগাভাগি নিয়ে যখন দুদেশের মনকষাকষি চলছে। তখন নদীশাসনের

দাওয়াই নিয়ে দিল্লিতে আসেন বাংলাদেশের নদী বিশেষজ্ঞ আইনুন নিশাত। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী, ভারতের মতো উজানের দেশ কখনই এতটা জল নিতে পারবে না; যাতে ভাটির দেশ বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রকৃতি, বাস্তুতন্ত্র ও অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আইনুন নিশাতের মতে, তিস্তা নদীতে জলের অভাব। সেজন্যই দুদেশের মধ্যে চুক্তি করতে হচ্ছে। শুধু নদীর জল নয়, নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলেও সমস্যা তৈরি হয়। আইন-শৃঙ্খলার সমস্যাও দেখা দেয়। অথচ নদী শাসন প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে তিস্তার জলের উৎস থেকেই সুষম বন্টন করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে নদীর গতিপথও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।[১২৪]

তিস্তা নিয়ে সব পক্ষকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এক ছাতার তলায় আনার চেষ্টা করে 'Strategic foresight groups' বা SFG। তিস্তার জলবন্টন নিয়ে এই গ্রুপের অধিকর্তা সন্দীপ ওয়াজলেকরের মতে, তিস্তা জলবন্টন নিয়ে যে নতুন চেষ্টা শুরু করা হচ্ছে তার মূল লক্ষ্য দুটি। দেশের অভ্যন্তরীণ মতানৈক্যের অবসান ঘটানোর পাশাপাশি গোটা তিস্তা অববাহিকার বাস্তুতন্ত্র বা ইকো সিস্টেমের উন্নয়ন ঘটিয়ে স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা। মূলত তিন দফা সূত্র দেওয়া হচ্ছে প্রস্তাবে। নদী কমিশনকে ঢেলে সাজানো, নদী অববাহিকার পলি সরিয়ে জল প্রবাহ ও সেচ বাড়ানো এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সুষম জলবন্টন। এছাড়াও চুক্তিটির শর্তগুলিকে নমনীয় করে তোলা, বর্ষাকালের উদ্বৃত্ত জল ধারণ ক্ষমতা বাড়ানো, স্থানীয় শিল্পকে উৎসাহ দেওয়ার মতো বিষয়গুলিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এইভাবে Track-II Diplomacy বা কূটনৈতিক দ্বৈততার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজা যায়।

২০১৩ র অক্টোবর মাসের শেষপর্বে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের আগে অন্তবর্তী সরকার গড়া নিয়ে শুরু হয় সংঘাত শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে। এমতাবস্থায় দিল্লির মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় খালেদা জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমানের কার্যকলাপ। ঢাকার পাঠানো তথ্য অনুযায়ী, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই পুরোদস্তুর সাহায্য সহযোগিতা করে চলেছিল লন্ডনের এডমন্টনে স্বেচ্ছানির্বাসনে থাকা তারেক ও তার দলবলকে। একইসঙ্গে উপমহাদেশে সক্রিয় মৌলবাদী ও জঙ্গী নেতাদের সঙ্গেও নিবিড় যোগাযোগ রেখে চলছিলেন বিএনপির এই নেতা। গোয়েন্দা সমন্বয়ের মাধ্যমে দিল্লির হাতে আসা এই সব তথ্যের ভিত্তিতে একটি রিপোর্ট তৈরি করে পাঠানো হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের কাছে।[১২৫]

বিদেশমন্ত্রকের কূটনীতিকদের বক্তব্য, বাংলাদেশ সার্বভৌম রাষ্ট্র। সেখানে কোন দল ক্ষমতায়

আসবে, বাংলাদেশের মানুষই তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্ধারণ করবেন। কোনও দল বিশেষের প্রতি নয়াদিল্লির পক্ষপাতের প্রশ্ন নেই। বিরোধী নেত্রী হিসাবে খালেদা জিয়ার সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ও প্রণব মুখোপাধ্যায়। শাসক দল আওয়ামী লীগ তাতে বিরক্ত হলেও দিল্লি তা পাত্তা দেয়নি। কিন্তু ভারতের উদ্বেগের কারণটি ছিলো অন্য। বাংলাদেশের গোয়েন্দাদের পাঠানো তথ্যে স্পষ্ট, বাংলাদেশে ক্ষমতায় ফিরতে আইএসআই ও মৌলবাদী শক্তির সাহায্য নিচ্ছেন বিএনপির উদীয়মান নেতা তারেক রহমান। প্রকৃতপক্ষে বিগত সময়ে বিএনপি-জামাত সরকার ISI-এর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাংলাদেশ কার্যত জঙ্গীঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। জঙ্গীদের বাড়বাড়ন্ত শুধু বাংলাদেশ প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানায়নি, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলেছিল। ভারত বিরোধী নানা জঙ্গী গোষ্ঠীকেও বাংলাদেশের মাটিতে ঘাঁটি গাড়তে দিয়েছিল বিএনপি জামাত সরকার। খালেদা জিয়া দিল্লিতে এসে অঙ্গীকার করে গিয়েছিলেন যে, ফের ক্ষমতায় এলে অতীতের সেইসব ভুল তাঁর দল আর করবে না। কিন্তু তারেকের কার্যকলাপ তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

বিএনপির মুখপাত্র তথা কেন্দ্রীয় নেতা ফখরুল ইসলাম এ প্রসঙ্গে বলেন, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য ধারাবাহিক অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে আওয়ামি লীগ সরকার। মির্জা বলেন, ‘‘তারেকের জনপ্রিয়তাকে ভয় পেয়েই এই সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসায় নেমেছেন। তিনি মেরুদন্ডের চিকিৎসার জন্য লন্ডনে রয়েছেন পড়াশোনা করছেন। আইএসআই বা জঙ্গি শক্তির সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই।’’[১২৬] এইরকম পরিস্থিতিতে ভারতের আশু ও দীর্ঘমেয়াদী বিপদের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে দিল্লি। তবে বাংলাদেশের মানুষের আবেগ ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের স্পর্শকাতরতার বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখেই যা পদক্ষেপ গ্রহণ করা তা করবে বলে মনে করে নয়াদিল্লি।

এইরকম একটি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ জুড়ে মৌলবাদ ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিতে বিপুল বিনিয়োগ করেছিল আরবের ১৮টি ইসলামী ব্যাঙ্ক। বাংলাদেশে নির্বাচন যত এগিয়ে এসেছিল তাদের সক্রিয়তা তত পরিমাণে বেড়েছিল। তৎকালীন সময়ে নয়াদিল্লির কাছে যে গোয়েন্দা রিপোর্ট ছিল তাতে দেখা যায়— গোটা ঘটনাটির পেছনে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এর হাত প্রকট। ওই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের জামাতপন্থী মৌলবাদী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে বিভিন্ন খাতে ঢালাও ঋণ দিয়েছিল ইসলামি ব্যাঙ্কগুলি। গোয়েন্দারা অনুমান করেছিলেন, বাংলাদেশে নাশকতা ও সন্ত্রাসের পরিকাঠামো তৈরি এবং অস্ত্র কেনার কাজেই এই অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। সীমান্তে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপে এই অর্থ লাগানো হচ্ছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে

মৌলবাদীদের আর্থিক মদত দেওয়া ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই সৌদি আরবের। এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, কুয়েত ও কাতারের কিছু ব্যাঙ্কের কার্যকলাপও খুবই সন্দেহজনক। এক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাঙ্ক অফ বাংলাদেশ (IBBL), সোস্যাল ইসলামিক ব্যাঙ্ক (SIBL) এর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক উদ্বেগ প্রকাশ করে যে, সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ভূরিভূরি প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমের কিছু দেশ অকাতরে ডলার ঢেলেছে ওই দুটি ব্যাঙ্কে। সৌদি আরবের আল রাঝি ব্যাঙ্ক ও বাংলাদেশে টাকা ঢালতে সক্রিয়। IBBL এর ৩৭ শতাংশ শেয়ার এই আল রাঝির হাতে। বাংলাদেশের জঙ্গী সংগঠন জামাতুল মুজাহিদ্দিন বাংলাদেশ (JMB)র মাথা শায়ক আব্দুর রহমান এবং তার সহযোগী সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলাভাইর ও এক সময়ে তাদের পুঁজির জন্য এই ব্যাঙ্কটির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল।[১২৭]

বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক এবং বাংলাদেশের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কই প্রথম কয়েকটি ইসলামি ব্যাঙ্কের সন্দেহজনক কাজকর্ম লক্ষ করে। সন্দেহভাজন গ্রাহকদের লেনদেন খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে তারা বেশ কিছু ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দেয়। আইন ভেঙে জঙ্গী সংগঠনকে টাকা দেওয়ার জন্য এই আইবিবিএলকে তিন তিন বার জরিমাণা করা হয়েছিল। তবে তাতে কাজ হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আরো লক্ষ করেছিল যে, বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি ইসলামি ব্যাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ইসলামী স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা 'লাজনাত আল-বির আল ইসলাম' আল কায়দার অন্যতম প্রধান অর্থদাতা হিসাবে যারা পরিচিত।[১২৮]

তৎকালীন বাংলাদেশে হরতাল ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ভাবিয়ে তুলেছিল নয়া-দিল্লিকে। ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মোজেনার সঙ্গেও কথা বলেছিলেন ভারতের বিদেশ সচিব সুজাতা সিংহ। তবে ঢাকার এই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে একমত ছিলনা ভারত। বাংলাদেশে বিএনপি-জামাত জোটের মৌলবাদী রাজনীতি, হেফাজতে ইসলামের উত্থান ও ভারত-বিরোধী প্রচার যথেষ্টই অস্বস্তিতে রেখেছিল নয়া-দিল্লিকে। ভোটপর্ব যতক্ষণ না মেটে তার শেষ নেই। তবে নয়াদিল্লির স্পষ্ট অবস্থান ছিল— যে দলই বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসুক না কেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সরকার বদলায় কিন্তু বিদেশনীতির অভিমুখ এক থাকে। এছাড়া নয়াদিল্লি এজন্য আশঙ্কিত ছিল যে মৌলবাদী রাজনীতির বাড়বাড়ন্তে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের আগে ও পরে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ ভারতে চলে আসতে পারেন। এইভাবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উত্থান-পতন অবধার্য হয়ে দাঁড়ায়।

২০১৩ সালের ৫ই নভেম্বর বাংলাদেশের বিরোধী দল নেত্রী খালেদা জিয়া ভারত সফরে আসেন। বলা যায় সসম্মানে তাঁকে এনে তাঁর সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ এবং রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। কিন্তু প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর পুত্রবধূ সনিয়া গান্ধী খালেদার সঙ্গে একান্ত বৈঠক থেকে বিরত থাকেন। বিদেশমন্ত্রকের মতে, সনিয়া কিন্তু ভারত সরকারের অঙ্গ নন। তিনি ইউ পি এর সভানেত্রী, কংগ্রেসের দলনেত্রী। কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব বলেন, খালেদার সঙ্গে সনিয়ার বৈঠক না করার ঘটনাটি একটি সচেতন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সনিয়া-খালেদা বৈঠকে বসলে তার অর্থ, বিএনপির সঙ্গে কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্পর্কে একটা নতুন মাত্রা যোগ হওয়া।[১২৯]

যদিও খালেদা জিয়ার ঘনিষ্ঠ মহল অবশ্য একে খুব বেশী গুরুত্ব দেননি। খালেদার এক সফরসঙ্গীর মতে, "খালেদা এই সফরের মধ্যে দিয়ে ভারতের সঙ্গে তাঁর সখ্যর একটি নতুন অধ্যায় শুরু করতে চাইছিলেন। কাজেই তাঁর দিক থেকে এটা হচ্ছে বরফ গলানোর একটা প্রয়াস। খালেদার শরিক হল জামাত। ভারত ঘোরতর জামাত বিরোধী। কদিন আগেও প্রধানমন্ত্রী জামাত সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছিলেন। তাই বিরোধীনেত্রী হিসেবে খালেদার এই সফর যে ভারতের মন সম্পূর্ণ জয় করবে, এমন অতি প্রত্যাশাও খালেদার নেই।"[১৩০]

তবে একথা সত্য যে দুদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে জড়াতে রাজী ছিল না ভারতের বিদেশমন্ত্রক। কারণ ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কিন্তু আওয়ামী লীগ ও কংগ্রেসের সম্পর্ক নয়। সেখানে বাংলাদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক। যে কারণে হাসিনা দিল্লি এলে আদবানী বা সুষমা স্বরাজের সঙ্গে দেখা করেন, সে কারণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতিও খালেদার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। খালেদার সফরের আগেই বিষয়টি ভারতের পক্ষ থেকে হাসিনাকে বোঝানো হয়েছিল। হাসিনাও অবশ্য খালেদার সফরের মধ্যে তাঁদের রাজনৈতিক লাভই অনুভব করেছিলেন। কারণ, ভারত সফরের ফলে বিএনপির পক্ষে হাসিনার বিরুদ্ধে ভারত-বিরোধীতার তাসকে ব্যবহার করাটা নির্বাচনের আগে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

১৫ই নভেম্বর ২০১৩ সাল থেকে দীর্ঘ ৪২ বছরের বিশেষ 'ভারত-বাংলাদেশ পাসপোর্ট' (IBP) তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। এরফলে বাংলাদেশ সফরের জন্য সাধারণ পাসপোর্টই যথেষ্ট। ১৯৭২ সালে IBP চালু হয়। তৎকালীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্য সরকারদের আইবিপি দেওয়ার অধিকার দিয়েছিল। IBP তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ওই সব রাজ্যকে

জানিয়েও দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে ২০১৩র ২৮শে জানুয়ারী ভারত-বাংলাদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তার সিদ্ধান্ত IBP তুলে দেওয়া।[১৩১] অন্যদিকে ১১ই নভেম্বর ইউরোপ-এশিয়া (আসেম) সম্মেলনের পার্শ্ব বৈঠক করেন বাংলাদেশ ও ভারতের বিদেশমন্ত্রী দীপু মণিও সলমন খুরশিদ। খুরশিদ বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের আসন্ন পরিস্থিতিতে বলেন যে, বাংলাদেশের সঙ্গে বকেয়া স্থলসীমান্ত চুক্তিটি সংসদের আসন্ন অধিবেশনে নিয়ে আসতে বদ্ধপরিকর ভারত। ঐদিন সর্বদলীয় সরকার গঠনের জন্য হাসিনার মন্ত্রীসভার সদস্যরা শেখ হাসিনাকে পদত্যাগপত্র জমা দেন। যা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ভারত ও পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে শুরু করে।[১৩২]

১৭ই নভেম্বর ২০১৩ সালে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীর ত্রিপুরার আখাউড়াতে আসেন একটি ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের উদ্বোধনে। বাংলাদেশে বন্দী আলফার সাধারণ সম্পাদক অনুপ চেটিয়াকে ভারতের হাতে তুলে দেবে বাংলাদেশ সরকার। একথা আলমগীর জানিয়ে বলেন, ‘‘দুদেশের মধ্যে বন্দী প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী ধৃত আলাফা জঙ্গী অনুপ চেটিয়াকে ভারতের হাতে তুলে দেওযা হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সুপ্রীমকোর্ট এর আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে সরকার।’’ ঐদিন ত্রিপুরার আখাউড়া সীমান্তে স্থল বন্দর তথা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের উদ্বোধন করেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্ধে ও বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। দুই দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাক্ষাতের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বলে, অনুপ চেটিয়ার প্রত্যর্পণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার সে দেশের কুখ্যাত দুই অপরাধী সুব্রত বায়েন ও সাজ্জাদ হোসেনকে হাতে চায়। এই দুজনই ভারতীয় জেলে বন্দী। এ প্রসঙ্গে আলমগীর বলেন ‘‘বাংলাদেশের মাটিতে ভারত-বিরোধী কোন কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকার বরদাস্ত করবেনা। পাশাপাশি, আমরাও আশা করব, বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী কোনও কাজ এ দেশের মাটিতে হবে না।’’[১৩৩]

তবে স্বভাবতই, প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের স্থলবন্দর তথা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট তৈরির ক্ষেত্রে ভারত আরও একধাপ এগিয়ে গিয়েছিল। ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে, পাঞ্জাবের আটারিতে ২০১২ সালে দেশের প্রথম ICP (Integrated Cheak Post) তৈরি হয়। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ত্রিপুরার আখাউড়ায় দ্বিতীয় ICP তৈরি হলো। কেন্দ্রিয় সরকার আরোও ১১টি ICP তৈরি করবে বলে শিন্ধে জানান। ভারত-বাংলাদেশ, ভারত-নেপাল, ভারত-মায়ানমার সীমান্তে এগুলি তৈরি হবে। তখন পশ্চিমবঙ্গে পেট্রাপোল সীমান্তে ICP তৈরির কাজ ও চলছিল। সিন্দে বলেন, ‘‘ভারত ও বাংলাদেশের

মধ্যে সুসম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আখাউড়া আইসিপি অনুঘটকের কাজ করবে। পাশাপাশি শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও বাড়বে।”[১৩৪]

অন্যদিকে ১৮ই নভেম্বর শেখ হাসিনা নির্বাচনকালীন অন্তবর্তী মন্ত্রীসভা গঠন করেন। তাঁর ফর্মূলা অনুযায়ী, এই সর্বদলীয় সরকারই বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন পরিচালনা করবে। তবে খালেদা জিয়ার দল বিএনপি এই সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাতে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এবং এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আব্দুল হামিদের দারস্থ হন ১৯শে নভেম্বর। বিএনপি-জামাত শিবির থেকে একটি চিঠি রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয় তাতে লেখা হয়—প্রধানমন্ত্রী যে অন্তবর্তী সরকার গড়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, তাকে শাসক দলের সরকার ও পক্ষপাতদুষ্ট মনে করছে বিএনপি-জামাত জোট। এবিষয়ে রাষ্ট্রপতি যেন তার সাংবিধানিক ক্ষমতা ব্যবহার করে দুপক্ষকে আলোচনায় বসাতে উদ্যোগী হন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবুদ্দিন আহমেদ অন্য কমিশনারদের নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন ঐদিন। রাষ্ট্রপতিকে তাঁরা জানান, নির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশ করতে তাঁরা তৈরি। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন করতে তারা প্রস্তুত। সবদল এই নির্বাচনে সমান সুযোগ পাবে। শীঘ্রই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হবে।[১৩৫]

বাংলাদেশের নির্বাচনী নির্ঘন্ট প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলাদেশে বিরোধী দল বিএনপি ও জামাত জোট দেশব্যাপী বিক্ষোভ আন্দোলনের মাধ্যমে হিংসা, অরাজকতা, লুটপাঠ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও হানাহানি শুরু করে চরমভাবে। রেললাইন উপড়ানো, চলন্ত ট্রেন ও বাস উল্টানো, আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়। এবং এই বিক্ষোভ আন্দোলনকে বিএনপি শান্তিপূর্ণ বলে দাবী করে। এমনকি সংখ্যালঘু মানুষের উপর ও আক্রমণ সংঘটিত হয়। ভারত এই সন্ত্রাস ও হিংসার ফলে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং অনুপ্রবেশ নিয়ে আশঙ্কিত হয়। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও। ২১শে নভেম্বর মার্কিন কংগ্রেসের এক আলোচনাসভায় বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়, মৌলবাদকে প্রশ্রয় না দিয়ে কড়া হাতে দমন করতে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সেখানে হিন্দু, খ্রিস্টান,বৌদ্ধ প্রভৃতি সংখ্যালঘুদের বাসও রয়েছে। তাই ঐ দিন মার্কিন কংগ্রেসের বিদেশ বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান এড রয়েস বলেন, “বাংলাদেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা বিপন্ন। এটাই আমাদের চিন্তার বিষয়। তাই বাংলাদেশ সরকারকে এই পরিস্থিতি কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করার আবেদন জানাচ্ছি। সে দেশের নাগরিকদের সাধারণ অধিকারগুলি রক্ষা করার জন্য সরকারকেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।[১৩৬]

সমসাময়িক পরিস্থিতিতে পূর্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে নির্বাচন যত এগিয়ে আসছিল, ততই অশান্ত হয়ে উঠেছিল সেখানকার পরিস্থিতি। স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপূর্বের বাংলাদেশ সীমান্ত নিয়ে নয়াদিল্লির কপালে ভাঁজ পড়েছিল। আবার পশ্চিমের পাক সীমান্তে প্রধান চিন্তা জঙ্গী অনুপ্রবেশ ও পাক সেনার অতিসক্রিয়তা। তাই আসন্ন লোকসভা ও চলতি বিধানসভা ভোট বানচাল করতে জঙ্গী হামলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ সমস্ত রাজ্যের ডি জিদের সতর্ক করে দেন। এ প্রসঙ্গে বিএসএফ-এর ডি জি সুভাষ জোশীর মন্তব্য ''বাংলাদেশে জানুয়ারিতে ভোট আসছে। তাই পূর্ব সীমান্ত নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।''[১৩৭] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট বলেছিল, বাংলাদেশের ভোটের আগে দেশজুড়ে নাশকতা ও হিংসার পরিকল্পনা নিয়েছে জামাতে ইসলামি। বিভিন্নভাবে তার আঁচ এসে পড়বে পশ্চিমবঙ্গের মতো বাংলাদেশ লাগোয়া রাজ্যগুলিতে। অনুপ্রবেশ বাড়বে, ভারতে সন্ত্রাস আমদানির ঘটনাও বাড়বে। নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী কড়া হাতে দমন শুরু করলে তারাও অনেকে পালিয়ে এসে ভারতে গা ঢাকা দিতে চাইবে। তাই বিএসএফ কর্তারা বাড়তি জওয়ান মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিএসএফ-এর এ ডি জি (পূর্বাঞ্চল) বংশীধর শর্মা বলেন, ''বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুবই ভালো। কাজেই যা করার, তা দুদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী একসঙ্গে মিলেই করবে। আমরা সমন্বয় রেখে নজরদারির মাত্রা বাড়াচ্ছি। সীমান্তে বিবিজির সঙ্গে নিয়মিত বৈঠকও হচ্ছে।''[১৩৮]

৪ঠা ডিসেম্বর এরকম পরিস্থিতিতে ঢাকা সফরে যান ভারতের বিদেশসচিব সুজাতা সিংহ। ঢাকা পৌঁছে তিনি বৈঠক করেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলির সঙ্গে। এরপর প্রধানমন্ত্রীর দফতরে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচীব বলেন যে দুদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং দারিদ্র দূরীকরণের নানা প্রকল্প নিয়ে কথা হয়েছিল। তবে বাংলাদেশের রাজনীতির সব পক্ষকেই তিনি শুধু ভোটের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। ঢাকা সফরে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়া ও প্রাক্তন সেনাশাসক হুসেইন মহম্মদ এরশাদের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সুজাতা সিংহ বলেন, রাজনৈতিক সংকটের সমাধান, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলিকেই করতে হবে। এটা তাদের সমস্যা। ভারত শুধু চায় বাংলাদেশে সব পক্ষের অংশগ্রহণে এমন একটি সুষ্ঠু ভোট হোক, যার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না। তবে হুসেইন মহম্মদ এরশাদ সুজাতার সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি দাবী করেন, সুজাতা তাঁকে বলেছেন সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে অগণতান্ত্রিক শক্তি বা জামাত-শিবিরের মতো মৌলবাদীরা ক্ষমতা দখল করতে পারে।

এরশাদের দাবী অনুযায়ী তিনি যে জামাত শিবিরের ক্ষমতা দখল চান না, তা তিনি সুজাতাকে জানিয়েছিলেন এবং উদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য সরকারকেই দায়ী করেছিলেন।

কিন্তু ঘটনাক্রমে সুজাতা নয়াদিল্লি ফিরে যাওয়ার পর এরশাদ দাবী করে বসেন যে, সুজাতা সিংহ তাঁকে বলেছেন, আওয়ামি লীগ ছাড়া অন্য কেউ ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশে জামাত শিবিরের বাড়বাড়ন্ত হবে, যা ভারতের কাম্য নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে জামাত ইসলামি বিবৃতি দেয় যে, ‘‘এই অবাঞ্ছিত বক্তব্য বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ।’’[১৩৯] ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন এরশাদের বক্তব্যে অসন্তুষ্ট হয়ে বলে যে প্রাক্তন সেনাশাসক উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবেই বিদেশ সচিবের বক্তব্য বিকৃত করেছেন। ভারতের বিদেশসচিব বলেছিলেন, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন না হলে অগণতান্ত্রিক শক্তি বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করতে পারে, প্রতিবেশী হিসাবে যা ভারতের কাম্য নয়।[১৪০]

এরপর দেখা যায় যে রাষ্ট্রপুঞ্জের সহকারী মহাসচিব অস্কার ফার্নান্ডেজ তারানকো ঢাকা সফর করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আগ্রহের কেন্দ্রে উপস্থিত হয় বাংলাদেশ। কাদের মোল্লার ফাঁসিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি উত্তরোত্তর উত্তাল হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব বান কি মুন শেখ হাসিনাকে ফোন করে খোঁজ খবর নেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ সচিব জন কেরী হাসিনাকে ফোন করেন পরিস্থিতির প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করে। অন্যদিকে ভারতের বিদেশ সচিব সুজাতা সিংহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে সে দেশের বিদেশ সচিব ওয়েন্ডি স্যোরম্যানের সঙ্গে ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করেন। এবং সাউথ ব্লক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্পষ্ট জানায়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার প্রশ্নে পশ্চিম বিশ্বের উচিত বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক এবং হিংসামুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করা। যার মূল কথা হলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গোটা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতিকে দেখা। এরফলে বাংলাদেশের বিজয় উৎসবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ানের অনুপস্থিতি পশ্চিমী বিশ্বের অসন্তোষকে প্রতিকীরূপ দান করে তৎসঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক বার্তা বাংলাদেশের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে।

বাংলাদেশের প্রাক্ নির্বাচনী আভ্যন্তরীণ রাজনীতির টানাপোড়েন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে— মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ ‘ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি’ এবং ‘ধর্মাশ্রয়ী বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি এই দুটি ধারাতে বিভক্ত। প্রথম ধারাটির নেতৃত্বে নানা আপস করেও আওয়ামী

লিগই থেকে যায়। আর দ্বিতীয় ধারাটির নেতৃত্বে আসীন হন মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত বহুল সমীকরণকৃত বিএনপি। মৌলিক অর্থনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে এই দুটি ধারার তেমন পার্থক্য নেই। দুটি ধারাই মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রতি বিশ্বাসী। তবে বিএনপির ভারত-বিরোধীতার মাত্রা অনেক বেশী। সাম্প্রদায়িক শক্তি ও যুদ্ধাপরাধীদের সঙ্গে (হেফাজতে ইসলাম, ইসলামি শাসনতন্ত্র) তাদের সখ্যও বেশী। তাই অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে কাছাকাছি হলেও বাংলাদেশের রাজনীতি ক্রমেই দুই মেরুতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে শক্তি বনাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী শক্তি। আরও একটি বড় দলের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ চেতনার (ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র) পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাসী বলে আওয়ামী লিগেরও বিরোধী। আওয়ামী লিগের মধ্যে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ চেতনার খন্ডীকরণের প্রচেষ্টা দেখেন। তাই আওয়ামী লিগ ও বিএনপি দুই দলকে একমত হতে হবে যে, সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী সন্ত্রাসী শক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও জামাত রাজনীতির নিষিদ্ধকরণ মেনে নিতে হবে।

অন্যদিকে ভারত যখন জামাত বিরোধী কড়া অবস্থান গ্রহণ করে চলেছে তখন ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে তৎপর হয়ে ওঠে জামাত। ১৭ই ডিসেম্বর ধানমন্ডির একটি বাড়িতে বসে জামাতে ইসলামির অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুর রজ্জাক জানিয়েছিলেন, ‘‘ভারতে আমাদের নেতিবাচক ভাবমূর্তি রয়েছে। সেখানকার সরকার বা সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনও সুযোগই পাওয়া যায় না। আমেরিকা-ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ থাকলেও, নয়াদিল্লি আমাদের জন্য দরজা বন্ধ করে রেখেছে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের খাতিরে সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা ভারতের সঙ্গে কথা বলতে চাইছি।’’[১৪১] তবে ভারতের কাছাকাছি আসার জন্য যতই বার্তা দিন রজ্জাক, হাসিনা সরকারের কর্মকান্ডের জন্য তাঁর দল এখনও ভারতকেই দোষারোপ করে চলে। নিজেদের মুখপত্রে জামাত এমন অভিযোগ করেছিল যে— এই সরকারকে সামনে রেখে বাংলাদেশকে উপনিবেশ বানানো ভারতের লক্ষ্য। ভারত বিরোধী জিগিরের এ বিষয়টি অস্বীকার করেন নি রজ্জাক। তবে তাঁর যুক্তি, ভারতের কাছে প্রত্যাশা না মেটারই ফলশ্রুতি এই সব অভিযোগ। বড় প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের কাছে বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশা অনেক।

১৮ই ডিসেম্বর ভারতের সংসদের রাজ্যসভায় ‘স্থলসীমান্ত চুক্তি বিল’’ বিলটি পেশ করে ভারতসরকার। এ বিষয়ে দিল্লির এই পদক্ষেপে বাংলাদেশ সরকার সন্তোষ প্রকাশ করলেও কঠোর সমালোচনায় সরব হন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষপর্যন্ত তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত

হয়। এই সময় বাংলাদেশে গুলসনে বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়ার বাড়ী ঘিরে ধরে নিরাপত্তারক্ষীরা। তাই স্বভাবতই শাসক দলের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে বিএনপি নেত্রী ও তাঁর দলের কর্মীরা। এইরকম পরিস্থিতিতে ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করে। ভারতের বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরশিদ বলেন, ''ভারত বাংলাদেশে কোনও পক্ষকে সমর্থন করতে রাজী নয়। তবে সে দেশের পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। গণতন্ত্রকে সফল করতে গেলে হিংসা রুখতে হবে।''[১৪২] তিনি আরো বলেন, ''বাংলাদেশ নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। আশা করব আমেরিকা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে গুরুত্ব দেবে। কারণ আমরা বাংলাদেশের প্রতিবেশী।''

এইরকম উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা সৃষ্টি হবে তাতে ভারতে অনুপ্রবেশ বাড়তে পারে এই আশঙ্কায় ভারতের সীমান্ত সীল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও যদি শরণার্থীরা ভারতে প্রবেশ করে সেক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছিল যে এই শরণার্থীদের ফেরৎ না পাঠিয়ে বা 'পুশব্যাক' না করে তাদের প্রতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হবে। সেই নির্দেশ ভারতের সীমান্তরক্ষীবাহিনী এবং বাংলাদেশ লাগোয়া রাজ্যগুলিকে দিয়েছিল নয়াদিল্লি। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের এক মুখপাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ''নির্বাচন বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়। ভারতের এ বিষয়ে হস্তক্ষেপের কোনও ইচ্ছে নেই। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ হওয়ার দরুন একদেশের ঘটনাপ্রবাহ অন্যদেশেও প্রভাব ফেলে।''

বাংলাদেশের সংসদের সাধারণ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হওয়ার পরও রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধান যখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না সেইরকম সময়ে পৌঁছান ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট গিবসন। তিনি শাসক ও বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করেন। পরে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজেনা ও বিরোধী নেত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। তারপর তিনি বিবৃতি দেন যে, ''বাংলাদেশের সঙ্কট মেটাতে জনগণের কাছে একটি গ্রহণযোগ নির্বাচনের পথ খোঁজাটাই জরুরী। সেই নির্বাচন হওয়া উচিত অবাধ ও নিরপেক্ষ। গণতন্ত্রের মধ্যে সন্ত্রাস ও হিংসা কাম্য নয়। এবং বিরোধীদের গ্রেফতার করে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টাও গণতন্ত্রে গ্রহযোগ্য নয়।''[১৪৩] এতদসত্ত্বেও বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩ টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ী হয়ে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে নয়াদিল্লি আশঙ্কা করে যে নির্বাচনের পর নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে। কারণ জামাতে ইসলামিকে কোনওভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। যা দক্ষিণ এশিয়ার সার্বিক কৌশলগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমস্যাসঙ্কুল। তাই

জামাতকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অন্যদিকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড্যান মজেনার বক্তব্যে জানা গিয়েছিল নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হওয়া উচিত, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ গ্রহণযোগ্য নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গী আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ান তাই মনে করেছিল যে আগামী দিনে বাংলাদেশে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে তার সঙ্গে চূড়ান্ত অসহযোগিতা করবে। যার প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর। ভারত এক্ষেত্রে হাসিনাকে তাই পরিস্থিতির রাশ ধরার জন্য সংবেদনশীল পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলে।

উক্ত সময়ে ভারত ঘেঁষা বাংলাদেশ ও মায়ানমার সীমান্তে ৫০টি জঙ্গী ঘাঁটি রয়েছে বলে দাবী করলেন BSF-এর ডিজি সুভাষ জোশী। তিনি বলেন, "এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত ঘেঁষা বাংলাদেশে কোনও জঙ্গী শিবিরের খবর নেই। তবে, দেশের অন্যত্র বাংলাদেশ ও মায়ানমার সীমান্তেও জঙ্গীরা সক্রিয়। বিএসএফের পক্ষ থেকে বিদেশমন্ত্রকের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে অবহিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী আমাদের সহযোগীতা করছেন।"[১৪৪] বাংলাদেশের এরকম উত্তাল পরিস্থিতিতে ঘোজাডাঙা সীমান্তে একটি ভারতীয় পণ্য বোঝাই ট্রাক পুড়িয়ে দেয় কিছু লোক। যার দরুন ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়াডিং এজেন্ট এসোসিয়েশন বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে ঘোজাডাঙা এবং পেট্রাপোল সীমান্তে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। সমসাময়িক নির্বাচনী পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার আশঙ্কা করে ভারত হাসিনার পাশে দাঁড়ানোর অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী বাংলাদেশের জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়ানোর প্রশ্নে একটা বড় সমস্যা ছিল। কারণ ভারত নিজেই লোকসভা নির্বাচনের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত দলই যখন ব্যস্ত নির্বাচনী রণকৌশল নিয়ে। ফলে বিদেশনীতির প্রশ্নে এককাট্টা হওয়া যেমন দেশের রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে কষ্টকর তেমনই ঐ মুহূর্তে দেশের কোনও কূটনৈতিক দৌত্য ও রাজনৈতিক শক্তির অভাবে তেমন জোর পাওয়া কঠিন ছিল। তবে একথা সত্য যে তাণ্ডবের আবহে বাংলাদেশের নির্বাচন সমাপ্ত হলেও এবারের নির্বাচন নিছক ব্যালট যুদ্ধ ছিল না। এটা ছিল, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধারণার সঙ্গে ধর্মভিত্তিক ইসলামিক রাষ্ট্রগঠনের লড়াই।

২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। ৬ই জানুয়ারী ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৩৬টি আসন পেয়েছিল এবং ওয়ার্কাস পার্টি ৬টি আসনও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ৬টি আসন; বিরোধী জাতীয় পার্টি পেয়ে ছিল ৩১টি আসন। নির্বাচনে জয়লাভ

করার পর শেখ হাসিনা সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, ‘‘যারা বাংলাদেশের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, যারা জঙ্গীবাদে বিশ্বাস করে, তারাই নির্বাচনে যায়নি। নতুন সরকার দেশ থেকে মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদ উৎখাতের লক্ষ্যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চালিয়ে যাবে। বিচারের রায় ও কার্যকরী করবে’’।— খালেদা জিয়ার উদ্দেশ্যে বলেন— ‘‘জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী জামাতকে ঘাড় থেকে নামান। ওরা সুস্থ ভাবে ভাবতে দেয় না। ওদের ছেড়ে, হিংসা ছেড়ে আলোচনায় আসুন, আলোচনা হবে।’’[১৪৫]

ভোট পরবর্তী বাংলাদেশে জামাতের তান্ডবের প্রতিবাদ করে গণজাগরণ মঞ্চের রোড মার্চ অনুষ্ঠিত হয় ১১ই জানুয়ারী। এই মঞ্চের আহ্বায়ক ইমরান এইচ সরকার বলেন, ‘‘বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী। তাঁরা অসাম্প্রাদায়িক বাংলাদেশ গড়তে চান। জামাতের মতো ধর্মীয় মৌলবাদীদের প্রতিরোধ করতে জোট বেঁধেছেন এ দেশের যুবশক্তি।’’[১৪৬] এই সময় হাসিনাকে স্বস্তি দিয়ে নতুন সরকারের পাশে দাঁড়ায় রাশিয়া। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও কমনওয়েলথ এর আগে নতুন সরকারের বিরোধীতা করেছিল। ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তাই ভারতের পর রাশিয়ার মতো দেশ বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোয় বাংলাদেশের ওপর পশ্চিমী দুনিয়ার শাস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞা চাপানো শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর হাসিনাকে টেলিফোনে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। এক্ষেত্রে হাসিনার প্রেসসচীব আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘‘মনমোহন সিংহ বলেছেন, ভারতের মানুষ যে কোনও পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের পাশে থাকবে।’’[১৪৭] দুদেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি অমীমাংসিত দ্বি-পাক্ষিক বিষয়গুলি দ্রুত সমাধানের আশ্বাসও দিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু মানুষের উপর অত্যাচার হওয়ায় ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করে। কিন্তু ১৪ই জানুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন হাসিনা সরকারের সঙ্গে কাজ করতে অসুবিধা নেই জানায়। এরফলে ভারত খানিকটা স্বস্তি প্রকাশ করে।

অন্যদিকে ২০১৪ সালের ১৭-১৯ যে জানুয়ারী বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ভারত সফর করেন। এই সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিবশঙ্কর মেননকে তিনি আশ্বাস দেন যে— জামাতের অত্যাচারের জেরে বাংলাদেশের মানুষ যাতে দলে দলে শরণার্থী হিসেবে ভারতে না আসেন তা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে শেখ হাসিনার

সরকার। তিনি আরো বলেন, তিস্তা ও স্থলসীমান্ত চুক্তির পাশাপাশি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়ানোকে ও তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। এই বিষয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে।[১৪৮] অন্যদিকে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জানিয়েছিল তারা হাসিনা সরকারের পাশে আছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বহু আপত্তি সত্ত্বেও পশ্চিমী বিশ্ব যে শেখ হাসিনাকে মেনে নিয়েছিল, তার পেছনে ছিল ভূ-রাজনীতির সক্রিয়তা। দুই বৃহৎ প্রতিবেশীর মধ্যে ভারত বরাবর শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বাংলাদেশের সঙ্গে দ্রুত বিকাশমান বাণিজ্যিকও সামরিক সহযোগিতার সুযোগ ও চিন হাতছাড়া করতে চায়নি। শেখ হাসিনার প্রতি দিল্লির সদর্থক অভিনন্দন বার্তার পর তাই বেজিং তাকে দ্রুত অনুসরণ করতে শুরু করে। যদিও ধারাবাহিকভাবে চীন বিএনপির অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলে পরিচিত। তাই এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছিল রাশিয়া, ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া সহ আরো বেশ কিছু দেশ।

এরমধ্যে ২০১৪ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী খবরে প্রকাশিত হয় যে প্রতিবেশী দেশ ভারতে নাশকতা চালানোর উদ্দেশ্যে জঙ্গীদের সঙ্গে যোগসাজসে লিপ্ত ছিল বাংলাদেশের খালেদাজিয়ার সরকারের একটা প্রভাবশালী অংশ। চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলার রায়ে বিচারক এস এম মুজিবুর রহমান এই ভাষাতেই আগের বিএনপিও জামাতে ইসলামির জোট সরকারকে অভিযুক্তকরেন। খালেদা জিয়ার দুই মন্ত্রী ও আলফার কমান্ডার পরেশ বড়ুয়াসহ ১৪জনের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন বিচারক রহমান। রায়ে বলা হয়েছিল যে, দেশ পরিচালনায় ঘোষিত নীতির বাইরে সরকার যে অন্য একটি নীতিও মেনে চলত, এই মামলায় তা স্পষ্ট হয়েছে। বিচারকের মতে,— এই প্রবণতা যেমন অর্থনৈতিক, তেমনই জাতীয় ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার পক্ষেও চরম বিপজ্জনক। প্রতিবেশী দেশে নাশকতা চালানো কখনও কোনও সরকারের নীতি হতে পারেনা।[১৪৯]

সমসাময়িক সময়ে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের সাময়িক যবনিকাপাতের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিংহ এবং শেখ হাসিনার দীর্ঘ কূটনৈতিক সম্পর্কের ইতি সময় বিশেষ হয়ে দাঁড়ায়। একজন পাঁচবছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে সদ্য পুর্ননির্বাচিত হয়েছিলেন। অন্যজন দশ বছরের মেয়াদ শেষ করে প্রস্থানের পথে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাই উক্ত সময়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে বাংলাদেশকে জানানো হয় যে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের কোন পরিবর্তন হবে না।তা

যে সরকারই কেন্দ্রে আসুক না কেন, ভারতের নিজস্ব কৌশলগত এবং নিরাপত্তার স্বার্থেই ঢাকার সঙ্গে সম্পাদিত সব বাণিজ্যিক এবং কৌশলগত পদক্ষেপ আরোও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাধ্যবাধকতা মেনেই বাংলাদেশের প্রতি যুদ্ধং দেহি মনোভাব থেকে কিছুটা সরে আসার অবস্থান গ্রহণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন বিদেশ দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিভাগের সহ-সচীব নিশা দেশাই বিসওয়াল সেনেটের একটি বৈঠকে জানান, বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও বাড়াতে হবে। আওয়ামী লীগ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রত্যাহার করারও প্রয়োজন রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এই মনোভাবে নয়াদিল্লি খানিকটা স্বস্তি প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন কূটনীতিক এবং ভারত-মার্কিন সম্পর্কের অন্যতম রূপকার রনেন সেন বলেছিলেন, ‘‘এটি অবশ্যই ইতিবাচক ঘটনা। তবে বিষয়টি আচমকা ঘটেনি। বাংলাদেশে ভোট হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ওয়াশিংটনের তরফে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। একটু দেরিতে হলেও আমেরিকা অনুধাবন করেছে যে জামাতে ইসলামির সঙ্গে আইএসআই ছাড়াও ইসলামি জঙ্গী সংগঠনগুলিরও যোগসাজস রয়েছে। মায়ানমারে রোহিঙ্গা উপজাতিদের নিয়ে উদ্ভূত সমস্যাতেও যে জামাত যুক্ত— এমন খবরও মার্কিন বিদেশ দফতরের কাছে পৌঁছেছে।”[১৫০] বাংলাদেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত রজিত মিটারের মতে— ‘‘বাংলাদেশে বিরোধী দলের সেই রাজনৈতিক জোর যে আর নেই তা স্পষ্ট। আমেরিকা বুঝছে বাইরে থেকে হাওয়া দিয়ে তাদের বেশিক্ষণ ভাসিয়ে রাখা যাবেনা। ইউনূস এর সঙ্গে হাসিনার সম্পর্ক খারাপ হওয়াটা অবশ্যই আমেরিকাকে খুশি করেনি। কিন্তু আজকের দিনে সব দেশই নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়, আমেরিকাও।”[১৫১] এ প্রসঙ্গে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিবশঙ্কর মেনন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বলেন, ‘‘কোন দেশই তার বিদেশনীতি রাতারাতি বদলায় না। কিছু সুক্ষ্ম তারতম্য ঘটায় মাত্র। এক্ষেত্রে আমেরিকা কেন হাসিনা সরকারের প্রতি নরম মনোভাব নিচ্ছে, তার কোনও সাময়িক কারণ রয়েছে কিনা, গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে তবেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।”[১৫২] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থান পরিবর্তনকে তাই ভারত নিজেদের কৌশলগত ও কূটনৈতিক সাফল্য মনে করে।

২০১৪ সালের ৪ঠা মার্চ মায়ানমারের রাজধানী নেপিদয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। বিমস্টেক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে এসে প্রতিবেশী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে এদিন প্রায় ২৫ মিনিট মুখোমুখি বৈঠকে বসেন মনমোহন।

বিদ্যুৎ সমস্যায় নাজেহাল বাংলাদেশকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিচ্ছে ভারত। এজন্য মনমোহনকে ধন্যবাদ জানান হাসিনা। তিনি বলেন ত্রিপুরার পালটানা থেকে আরও অন্তত ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেলে তাদের সুবিধা হয়। মনমোহন জানান, যত শীঘ্র সম্ভব পালটানা থেকে বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেওয়া হবে। নির্বাচনে জিতে ইউপিএদের ক্ষমতায় এলেও তিনি যে আর প্রধানমন্ত্রী হবেন না, মনমোহন ইতিমধ্যে তা ঘোষণা করেছিলেন। তাই এই বিমস্টেকের শীর্ষবৈঠক ছিল তাঁর শেষ বিদেশ সফর। মনমোহন বারেবারে বলে এসেছেন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই জঙ্গীবাদের কবল থেকে মুক্ত করতে পারে বাংলাদেশকে, এবং দিল্লি এ বিষয়ে ঢাকাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে তৈরি। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে ঢাকাও যে ভাবে ভারতকে সাহায্য করে এসেছে, তা নজিরবিহীন। তাই নেপাল, ভূটান, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কার নেতারা এই বিমস্টেক বৈঠকে থাকলেও প্রধানমন্ত্রী বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছিলেন শেখ হাসিনাকে। এই সফরের সঙ্গী ছিলেন বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরশিদ, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শিবশঙ্কর মেনন ও বিদেশ সচীব সুজাতা সিংহ।

১৯শে মার্চ সিকিমে ২৩টি বাঁধের কারণে বাংলাদেশে তিস্তার জলপ্রবাহ কমে যাচ্ছে বলে দিল্লির কাছে নালিশ করে ঢাকা। তিনদিনের ভারত সফরে আসেন বাংলাদেশের বিদেশসচীব শহিদুল হক। হাসিনা সরকারের দায়িত্ব পেয়ে প্রথম ভারত সফরে এসেছিলেন শহিদুল হক। হক বলেন, ‘‘সরকার বদলালেও আমলা পর্যায়ের টেকনিক্যাল আদানপ্রদানগুলি তো আর থেমে যাবেনা। চলতি ভারত সফরে সেগুলি নিয়েই পর্যালোচনা করতে এসেছি।”[১৫৩] তিনি বৈঠক করেন ভারতের বাণিজ্যসচীব, জাহাজসচীব এবং জলসম্পদ সচীবের সঙ্গে। বৈঠকে স্থিরিকৃত হয় বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র ধরে ধরে টাস্ক ফোর্স গঠন, সীমান্ত বাণিজ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন, জলসম্পদের যৌথ উন্নয়ন, জাহাজ পরিবহন বাড়ানো প্রভৃতি বিষয়। বাংলাদেশের বিদেশসচীবের এই সফর প্রকৃতপক্ষে হল দিল্লিতে নতুন সরকার আসার পরে সম্পর্ক মসৃণভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে।

২০১৪ সালের এপ্রিল মাসে ভারত, পাকিস্তান ও চীনের নৌবাহিনী পূর্ব চিন সাগরের কাছে যৌথ মহড়া দিতে উদ্যোগী হয়। তবে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে একসঙ্গে চীন ও পাকিস্তানের রণতরী ও নৌবহর নিয়ে দূর চীন সাগরে ভারতীয় নৌবাহিনীর যৌথ মহড়া যেন ঠিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অথচ তাই দেখা গিয়েছিল ২০১৪ সালের ২৩শে এপ্রিল। ভারতীয় ফ্রিগেট আইএনএস শিবালিক ছাড়াও আরও আঠারোটি রণতরী এবং সাতটি হেলিকপ্টার নিয়ে ভারতীয় নৌবাহিনী মহড়ায় যোগদান

করেছিল।

মহড়াটির নাম দেওয়া হয় : নৌ সহযোগিতা ২০১৪। পূর্বোক্ত তিনটি দেশ ছাড়া তাতে যোগ দেয় বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ব্রুনেই প্রভৃতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কতকগুলি দেশও। নামেই স্পষ্ট, এই মহড়া ছিল বহুজাতিক সহযোগিতার। যুদ্ধ ছাড়াও নৌবাহিনীর আরও অনেক কাজ থাকে। দুর্ঘটনায় পড়া জাহাজের ফুরিয়ে যাওয়া রসদ সরবরাহ করা, বিপন্ন জাহাজ তল্লাসি করে তার যাত্রী বা আরোহীদের রক্ষা করা, জলদস্যুদের হামলা ঠেকাতে তৎপর হওয়া, জাহাজ ছিনতাই হলে তা উদ্ধারকরে ছিনতাইকারীদের আটক করা, দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে নজরদারি চালানো— এক কথায় সমুদ্রপথগুলি নিরাপদ করে তোলা। পারস্য উপসাগর সহ আরব সাগর, বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর এবং পূর্ব ও দক্ষিণ চিন সাগর জুড়ে বাণিজ্যের গুরুত্ব যথেষ্ট অর্থবহ। সমুদ্রবেষ্টিত দেশগুলি তাই পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা মারফৎ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তৎপর। ভারতের সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উত্তেজনা বা বৈরীতার উপাদান আছে। এমনকী চীনা নৌশক্তিও উপকূলবর্তী ভিয়েতনামি তৈলসম্ভার অনুসন্ধানে আমন্ত্রিত ভারতীয় তৈল খনন সংস্থার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে আগ্রহী। অন্যদিকে চীন সাগরের সর্বত্র সমুদ্র সম্পদের উপর চিনের নিরঙ্কুশ গতিবিধি ও অধিকার ভারত মেনে নেয়নি বলে কিছু জটিলতাও সৃষ্টি হয়েছিল। তা অবশ্য চীনের সঙ্গে যৌথ মহড়ার ক্ষেত্রে ব্যাঘাতের কারণ হয়নি।[১৫৪]

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য সমুদ্রবেষ্টিত রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের এই নৌসহযোগিতা কূটনীতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। সীমান্তের দুর্গমতম একখণ্ড জমির দখল নিয়ে উত্তেজিত বাক্যবিনিময় বা হুমকীই ভারতের সঙ্গে চিন ও পাকিস্তানের সম্পর্কের একমাত্র মাপকাঠি নয়। ওই রণংদেহী মনোভাব ও অবস্থানের মধ্যে নাটকীয়তা আছে, অতিরঞ্জন ও আছে, যা নিজ দেশবাসীর জাতীয়তাবাদী অহমিকাকে তুষ্ট করে। কিন্তু তার অন্তরালে পণ্য চলাচল অব্যাহত থাকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বর্তমানে কোন দেশের সঙ্গে বিরূপ মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিকাশলাভ করেনা। তাই জাতীয়তাবাদ যত অপরাজেয়ই হোক, শেষ বিচারে তাকে কূটনৈতিক বাস্তবতার উপর নির্ভর করতে হয়।

১৫ই মে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যকেই সমর্থন জানায় ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্ট। এই মুহূর্তে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বলছে, গোটা দেশেই জেলগুলিতে বাংলাদেশীদের সংখ্যা ফুলে ফেঁপে উঠছে। কেন্দ্রের মতে, দেশের সমস্ত জেলে প্রায় ৭ হাজার বিদেশী

নাগরিক বন্দী রয়েছেন, যার মধ্যে ৪ হাজারেরও বেশী বাংলাদেশী। দশ বছর আগে, ২০০৪ সালে এই সংখ্যাটা ছিল ২৮৫৮ জন। ২০০১সালে ২৩২৭ জন বাংলাদেশী বন্দি ছিলেন দেশের জেলগুলিতে। ২০০৪ সালে তা বেড়ে হয় ২৮৫৮ জন। তারপরের দশ বছরে বন্দী সংখ্যা ৪ হাজারের উপর চলে যাওয়া থেকেই স্পষ্ট, সীমান্তে কাঁটাতার বসালেও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি।[১৫৫]

২০১৪ সালের ২৭শে মে জাপান সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শপথে হাজির থাকতে পারেননি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছিলেন বাংলাদেশ সংসদের স্পীকার শিরিন শরমিন চৌধুরীকে। তিনি নয়াদিল্লিতে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেন এবং বৈঠকে ভরতের সঙ্গে বকেয়া তিস্তা ও স্থলসীমান্ত চুক্তির কথা তোলেন শিরিন। তিনি মোদীকে বলেন, দুদেশের সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যেতে এই দুটি চুক্তির বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী। বৈঠকের পর বিদেশসচীব সুজাতা সিংহ বলেন, ‘‘নিরাপত্তা, শক্তি, সীমান্ত সহযোগিতার মতো ক্ষেত্রে ঢাকা যেভাবে সহযোগিতা করে গিয়েছে, বৈঠকে তার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। সাম্প্রতিক অতীতে দুদেশের সম্পর্কে যে গতি এসেছে, তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাও বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।’’[১৫৬]

ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর অভিষেক ইউ পি এ জমানার অবসান ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের গতি নতুন অভিমুখে পরিচালিত হওয়া শুরু হয়। নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী ভারতের পঞ্চদশ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার মুহূর্তেই দেশের বিদেশনীতিতে এক ধরনের চমক সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক বা সুসংহত চিন্তাভাবনার ঘাটতি লক্ষ্য করা গেলেও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সার্ক এর শীর্ষ নেতাদের আমন্ত্রণ জানানো যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। উক্ত সময়ে ভারত ও পাকিস্তানের শীর্ষ নেতাদের সাক্ষাতের অভিঘাতে অভিষেক কূটনীতির বাকি প্রয়াস অন্তরালে থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এটা অত্যন্ত তাৎপর্যের যে তাঁর শপথ অনুষ্ঠানে নজিরবিহীনভাবে মোদী প্রতিবেশী দেশের সরকার প্রধানদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমেরিকা, চিন বা রাশিয়াকে বিন্দুমাত্র উপেক্ষা না করেও যে নয়াদিল্লি তাঁর প্রতিবেশীদের গুরুত্ব দিতে পারে, এক্ষেত্রে তা প্রমাণিত। নির্বাচনী প্রচারে নরেন্দ্রমোদী বেশ কয়েকবার ভারতের কয়েকটি প্রতিবেশী দেশকে তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য বানিয়েছিলেন। সেই প্রেক্ষিতে এই কূটনৈতিক চালের তাৎপর্য আরো অর্থবহ।

হেরাট হানা প্রতিহত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী যেমন আফগানিস্তানকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তেমনই অনুরূপভাবে বিদেশ সচিব বলেছিলেন, আফগানিস্তান নিজস্ব প্রয়াসেই সে

দেশের যাবতীয় সমস্যা মেটাক, ভারত তাই চায়। এক অর্থে শরিফ ও কারজাইয়ের ভারত সফর এটা প্রমাণ করে যে, হেরাট কান্ডকে গুরত্বহীন প্রমাণ করতে ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান— তিন দেশের রাষ্ট্রনেতাই বদ্ধপরিকর।

তবে একথা স্বীকার্য যে, আগামী এক দশকে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা জরুরী। জ্বালানি ব্যবহারে চীন, আমেরিকা, রাশিয়া এবং মায়ানমারের সঙ্গে সহযোগিতার বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলে চীন ভারতের থেকে যথেষ্ট এগিয়ে রয়েছে। তুর্কমেনিস্তান কিংবা ইরান থেকে ভারতে জ্বালানীর যোগান সুনিশ্চিত করতে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা নয়াদিল্লির কাছে প্রয়োজন। অনুরূপভাবে মায়ানমার থেকে বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানীও জরুরী। আশার কথা এটাই যে, বিজেপি তার ইস্তাহারে জ্বালানিকে জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে এক বন্ধনীতে রেখেছিল এবং দাবী করেছিল যে, জ্বালানির যোগানের ঘাটতি যাতে ভারতের আর্থিক বিকাশের অন্তরায় না হয় তা দেখা অত্যন্ত জরুরী।

তামিল রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ক্ষোভ ব্যক্ত করলেও শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মহেন্দ্র রাজাপক্ষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নরেন্দ্র মোদী স্পষ্ট বার্তা দিতে চেয়েছেন যে, ভারতের বিদেশনীতিকে দেশের আঞ্চলিক দলগুলির স্বার্থের কাছে সঁপে দিতে তার সরকার প্রস্তুত নয়। আবার শ্রীলঙ্কার তামিল বংশোদ্ভুতদের অধিকার রক্ষার তাগিদে সে দেশের সংবিধানের প্রায় বিস্মৃত ত্রয়োদশ সংশোধনীর বাস্তবায়নের কথাও সফররত প্রধানমন্ত্রীকে স্পষ্ট জানিয়ে মোদী তামিলনাড়ুকে রাজনৈতিক বার্তা দিতে চেষ্টা করেছেন।

বাংলাদেশ থেকে ‘‘বে-আইনী অনুপ্রবেশ” এর যে প্রসঙ্গে মোদী তাঁর নির্বাচনী প্রচারে সরব হয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিনিধিত্বকারী সে দেশের জাতীয় সংসদের স্পিকারের সঙ্গে আলোচনার সময়ে তা ফের উত্থাপিত হয়েছিল। তিস্তার জলবন্টন প্রসঙ্গ বা ছিটমহলের বিষয় আলোচনায় এলেও টিপাইমুখ বাঁধ প্রসঙ্গ অবশ্য আলোচনায় আসেনি। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি উত্তবঙ্গ সফরে গিয়ে ছিটমহলের যে সব এলাকা নিয়ে বিতর্ক নেই, তার দ্রুত সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাই স্বাভাবিকভাবে মোদীর অভিষেক কূটনীতিতে রাজনীতির কূটনীতিগত অবস্থান আছে।

প্রতিবেশীদের প্রচ্ছন্নভাবে নিজস্ব শক্তি প্রদর্শনের ইঙ্গিতও বেশ স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও মোটের উপর এই প্রচেষ্টা সদর্থক। এই কূটনীতির সরণি বেয়ে সুসংহত প্রতিবেশীত্বের নীতি গড়ে তোলাও নয়াদিল্লির পক্ষে অসম্ভব নয়। যা মোদীর বিদেশনীতিকে তুলে ধরে। এখানে এক্ষেত্রে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার ‘‘গণতান্ত্রিক শান্তি’’ বা “Democratic Peace” এর তত্ত্বটি যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে। এর পেছনে কী কারণ বর্তমান— তাদের উদারনৈতিক ঐতিহ্য না বিত্তশালিতা না সংস্কৃতিগত সারূপ্য না কি নিছক পারস্পরিক বন্ধুত্ব— তা নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু বলা যায় যে উদার গণতন্ত্রের আদর্শ যতবেশী সংখ্যক রাষ্ট্র গ্রহণ করবে তত সমস্ত পৃথিবীতেই যুদ্ধের সম্ভাবনা অপসারিত হয়ে শান্তির বাতাবরণ বিস্তার লাভ করবে।

২০১৪ সালে ২৫-২৭ শে জুন মোদী সরকারের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ তিনদিনের ঢাকা সফর করেন। ভারতে নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই প্রথম সে দেশের একজন মন্ত্রী বাংলাদেশে গেলেন। তিনদিনের সফরে সুষমা স্বরাজ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ, প্রধনমন্ত্রী শেখ হাসিনা, বিদেশমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলির সঙ্গে বৈঠক করেন। ‘Bangladesh Institute of International and Strategic Studies’ এর এক আলোচনা চক্রে ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেন, ‘‘তিস্তার জলবন্টন চুক্তি এবং স্থল সীমান্ত চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশ যে উদ্বেগে আছে তা আমি জানি। এই দুটি সমস্যা এখনো বকেয়া রয়েছে। তিস্তার জলবন্টন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ভারতে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা। অন্যদিকে ল্যান্ড বাউন্ডারি এগ্রিমেন্ট বিষয়টি আমাদের একটি সংসদীয় কমিটির বিবেচনাধীন রয়েছে। উভয়দেশের মানুষেরই কল্যান হয় এমনভাবেই দুই সমস্যার সমাধান করা হবে।’’[১৫৭] এছাড়া এই সফরে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে দ্বিপাক্ষিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেগুলি হল—

- ৬৫ বছরের বেশী ও ১৩ বছরের কম বয়সীদের জন্য মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা দেবে ভারত।
- পালটানা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আরো ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে বাংলাদেশকে।
- বিভিন্ন ক্ষুদ্র প্রকল্পের জন্য ৬০কোটি টাকা অনুদান দেবে ভারত।
- আলফা নেতা অনুপ চেটিয়া এবং দু মাস আগে ঢাকার নারায়ণগঞ্জে সাত খুনের আসামী নূর হোসেনকে প্রত্যর্পণ করা হবে।
- মৈত্রী এক্সপ্রেসের আরো বাতানুকূল কামরা সংযোজন ও যাত্রার সময় কমানো।
- ঢাকা থেকে শিলং হয়ে গুয়াহাটি পর্যন্ত বাস চলাচল পরিষেবার সূচনা করা হবে।

এছাড়াও দুদেশের বাণিজ্য ভারসাম্যের অভাব যথাসমম্ভব কমিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করবে দুই দেশ— একথা সিদ্ধান্ত হয়।

সুষমা বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক। এই সম্পর্ক ভবিষ্যতেও অটুট থাকবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের জঙ্গীদের উচ্ছেদের জন্য হাসিনা সরকারকে তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। এইভাবে বাস্তবতার তত্ত্বের নিরিখে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা উভয় দেশ করে।

তবে তিস্তা চুক্তি রূপায়নের প্রশ্নে গোড়া থেকেই ঘোর আপত্তি করে গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে বাংলাদেশের। তাই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত। মমতার আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে নতুন সরকার যে তাড়াহুড়ো করে তিস্তা চুক্তি করতে চায় না, সেকথা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। হাসিনাকে তিনি জানিয়ে এসেছিলেন— ঐক্যমত্যের ভিত্তিতেই তিনি এ ব্যাপারে এগোবেন।

এমতাবস্থায় অন্যদিকে কলকাতায় ধরা পড়া সাত খুনের অসামী নূর হোসেনের বিনিময়ে আলফার সাধারণ সম্পাদক অনুপ চেটিয়াকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে বাংলাদেশ সরকার এবং ২০-২৫শে আগস্ট নয়াদিল্লিতে BSF ও BGB ৩৯তম সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন— ‘‘মূল অভিযোগ এটাই যে দুই দেশের সম্পর্ক কার্যত একতরফা। বাংলাদেশ বহুভাবে ভারতকে সাহায্য করলেও ঢাকার কোনও প্রত্যাশাই পূরণ করতে পারেনি নয়াদিল্লি। এতে বাংলাদেশের সরকারের সংকট বাড়বে। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের পক্ষেও এটা ভাল হবেনা।’’[১৫৮]

২০১৪ সালের ০২-০৪ই সেপ্টেম্বর ১৪তম যৌথ স্বরাষ্ট্র সচীব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকাতে। এই বৈঠকে নিরাপত্তা, দ্বিপাক্ষিক সহযোগীতা, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, চোরাচালান ও পাচার এবং বিভিন্ন কুখ্যাত দুষ্কৃতীদের প্রত্যপর্ণের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর ৮-১২ই সেপ্টেম্বর ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী হর্ষবর্ধন বংলাদেশ সফর করেন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ৩২ তম দক্ষিণপূর্ব এশিয় অঞ্চলের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের বৈঠকের জন্য। ২০শে সেপ্টেম্বর ভারত-বাংলাদেশ যৌথ

পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে উভয়দেশ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতার ক্ষেত্রে যৌথ সমঝোতাপত্র বা MOU স্বাক্ষর করে।[১৫৯]

তবে ১৯-২১শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলি নয়াদিল্লি আসেন। তিনি ভারতে এসে ভারতীয় নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ করেন যে পশ্চিমবঙ্গের একটি অর্থলগ্নি সংস্থা সারদার কোটি কোটি টাকা বাংলাদেশের জামাতের হাতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা মৌলবাদীরা পশ্চিমবঙ্গে একটি রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে নিশ্চিন্তভাবে রয়েছে এবং বাংলাদেশের জাতীয় সরকারের বিরোধীতাকে চরম মাত্রায় পৌঁছে দিতে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। এরকম অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের বে-আইনী অর্থলগ্নী সংস্থা সারদার টাকা জামাতের হাতে যাওয়া এবং পালিয়ে আসা মৌলবাদী দুষ্কৃতীদের পশ্চিমবঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া প্রসঙ্গে কতটা উদ্বিগ্ন ঢাকা? এ ব্যাপারে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজকে তিনি কি জানিয়েছেন? প্রশ্ন করা হলে মাহমুদ বলেন— ‘‘এ ব্যাপারে যা বলার ভারত সরকারই বলবে। তবে ভারতের মাটি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না বলে আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছে। এই আশ্বাসে আমরা সন্তুষ্ট। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ গঠনের সময় ভারতও এক সঙ্গে রক্ত ঝরিয়েছে। জামাতের মতো কিছু মৌলবাদী সংগঠন ছাড়া গোটা দেশই চায় বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে মিলেমিশে উন্নয়নের পথে হাঁটুক।’’[১৬০]

তিনদিনের সফর শেষে যৌথ পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকের পর ভারতের বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র সৈয়দ আকবরউদ্দিন ও বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলি যৌথ বিবৃতি দিয়ে বলেন— দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য পরমাণুক্ষেত্র, মহাকাশ গবেষণায় সহযোগীতা, রেল ও বাস যোগাযোগ বাড়ানোর বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ বিষয়ে আকবরউদ্দিন বলেন— ‘‘দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক লেনদেন সবচেয়ে বেশি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে ঢাকাকে অনুরোধ করছি, ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির জন্য সে দেশের কিছু বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হোক। আনন্দের বিষয়, ভারতীয় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির জন্য আজ ১৬টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ার কথা ঘোষণা করেছে ঢাকা।’’ এই সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি উপকৃত হবে। দুদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ও কমবে। এ বিষয়ে মাহমুদ আলি বলেন— ‘‘ভারত এখানে গাড়ির কারখানা তৈরি করলে, আমরাও তার পাশে যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা গড়তে পারি। বাড়বে কর্মসংস্থান। এবং ভারত এই নির্দিষ্ট বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে কারখানা গড়লে বাংলাদেশের অর্থনীতি

তাতে লাভবান হবে।”

২৭শে সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠক করেন। এই বৈঠকে হাসিনা সারদার টাকা বাংলাদেশে পাচার হওয়া ও পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশের সঙ্গে মৌলবাদী সংগঠন জামাতে ইসলামীর যোগাযোগ নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর হাতে বেশ কিছু তথ্য তুলে দেন। এবং সাংসদ আহমদ হাসান ইমরান এর সঙ্গে জামাতের যোগ স্পষ্ট একথা বলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দেন যে, বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী কোনও শক্তিকে ভারতের মাটি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। এ প্রসঙ্গে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ডোভাল বলেন, শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগের। তাই তিনি বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রীর কাছে আরো তথ্য চান। ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের নিরাপত্তা বিভাগ ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি ও তথ্য সংগ্রহে ভূমিকা গ্রহণ করে। মোদীও আশ্বাস দিয়েছিলেন দোষীরা রেহাই পাবে না। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, “ভারতে জঙ্গীদের বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না বলে আগেই অঙ্গীকার করেছি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এ বিষয়ে নেত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতার প্রশংসা করেছেন। আমরা আশা করব ভারতও তাদের মাটি থেকে বাংলাদেশের জঙ্গীদের ডেরাগুলি উচ্ছেদ করবে।”[১৬১] তবে এটা কেবলমাত্র সারদা প্রশ্নেই থেমে ছিল না, বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাংলাদেশী জঙ্গীযোগের প্রমাণ মেলে। এই সন্ত্রাসের মোকাবিলায় বাংলাদেশকে ভারতের পাশে প্রয়োজন। ভারতের মাটিকে বিস্ফোরক ও অস্ত্র তৈরির কাজে লাগানো হচ্ছিল, যা শুধু বাংলাদেশ নয় ভারতের পক্ষেও বিপজ্জনক। এবং বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা ভারতে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বেড়ে উঠছিল যা নিরাপত্তাকে প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন করে তোলে।

এই আবহের মধ্যেই ২৬-২৭শে অক্টোবর ভারত-বাংলাদেশ রেল যোগাযোগের জন্য যৌথ প্রতিনিধি দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। ভারতের পূর্বরেল সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে ভারতের গেদে ও বাংলাদেশের দর্শনা দিয়ে দু'দেশেরই একটি করে ট্রেন কলকাতা-ঢাকা যাতায়াত করে। ওই ট্রেনে মোট ৪৫৯ জন যাত্রীর আসন রয়েছে। বাংলাদেশের ট্রেনেও ৩২৬ জনের আসন রয়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, ২০১০-২০১১ সালে যাত্রীসংখ্যা একহাজার বেড়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবর্ষে যাত্রীসংখ্যা বেড়েছে প্রায় পাঁচ হাজার। একথা মাথায় রেখেই দুদেশের রেল কর্তৃপক্ষ ট্রেন বাড়ানোর প্রস্তাব নিয়েছেন। অনেকদিন ধরেই আগরতলা থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত রেল যোগাযোগের

চেষ্টা চলছে। নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগরতলা থেকে আখাউড়া পর্যন্ত একটি নতুন লাইন তৈরি করা হবে। তাতে যাত্রীবাহী ট্রেন তো চলবেই, পাশাপাশি পণ্য পরিবহনও হবে। পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহী ভারত। এরপর ২৯-৩১ অক্টোবর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরিন শরমিন চৌধুরী ভারতের চণ্ডীগড়ে আসেন। ''সংসদীয় কৃষি কমিটির'' কর্মশালায় যোগাদনের জন্য। এছাড়া ৩০-৩১শে অক্টোবর বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ নয়াদিল্লি আসেন। সার্ক দেশগুলির শিক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক সফল করে তুলতে। ৩০শে অক্টোবর থেকে ০২রা নভেম্বর বোধগয়াতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের 'হোলি ইয়োলো রোবস' অনুষ্ঠানে হাজির হয় বাংলাদেশ সংসদের সাংসদ হাসানুল হক ইনু। এইভাবে উভয়দেশের সম্পর্ক সহযোগিতার নতুন দিক উন্মোচনে সচেষ্ট হয়। এই সাথেই সার্কের শক্তি সহযোগিতার বৈঠকও নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। যার ফলে সার্ক দেশগুলির মধ্যে শক্তি সরবরাহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

২০১৪ সালের ৫-৭ই নভেম্বর ৭ম 'দক্ষিণ এশিয়া অর্থনৈতিক সম্মেলন' (SAES)এ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। এরপরেই ৭-৯ই নভেম্বর নয়াদিল্লিতে ৬ষ্ঠ আয়ুর্বেদ কংগ্রেসে যোগাদন করতে আসেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক।[১৬২] ঐ মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) একটি আঞ্চলিক বৈঠক হয় বাংলাদেশে। এই বৈঠকের আয়োজনে ছিল ভারত ও বাংলাদেশের সংসদ জেনেভা ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহ এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার। যা সামগ্রিক সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করে। কিন্তু নভেম্বর মাসের গোড়াতেই বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ডে অভিযুক্ত বাংলাদেশের জামাত জঙ্গী শাহনূরের মাথার দাম ৫ লক্ষ টাকা ঘোষণা করে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ন্যাশন্যাল ইভেস্টিগেশন এজেন্সি (NIA)। এরসঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিজেপি নেতা সিদ্ধার্থনাথ সিংহ বলেন, ''জামাতে ইসলামির সাহায্য নিয়েই সীমান্ত এলাকায় ৭৫টি আসনের অধিকাংশ জিতেছিল কংগ্রেস-তৃণমূল জোট। তৃণমূল জিতেছিল-৩১টিতে এবং কংগ্রেস ১৩টিতে।'' এবং প্রশ্ন তোলেন জামাতে ইসলামির সঙ্গে সমঝোতার কারণেই কি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ঢাকা সফর বাতিল করে তিস্তা চুক্তি রুখে দিয়েছিলেন মমতা? ''বাংলাদেশের গোয়েন্দাদের রিপোর্ট কিন্তু দুপক্ষের এই সমঝোতার কথাই বলছে। ও দেশের সংবাদপত্রেই এই খবর প্রকাশিত হয়েছে।''[১৬৩] স্বাভাবিকভাবে ভারতের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের প্রমাণ স্পষ্ট হতে থাকে। যা ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। এই পরিস্থিতিতে ১৯শে নভেম্বর সচিব পর্যায়ের

ছয় সদস্যের একটি দল ও পরে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (RAB) এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে NIA এর প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসেন। ভারতের পক্ষ থেকে RAB এর হাতে ১১ জন ফেরার বাংলাদেশী জঙ্গীর নামের একটি তালিকা তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ মোট ৫১জনের নামের তালিকা NIA এর হাতে তুলে দেয়, যারা লুকিয়ে আছে বলে সন্দেহ। তদন্তের কাজ দেখতে বাংলাদেশের গোয়েন্দাদেরও আমন্ত্রণ জানায় NIA। খাগড়াগড় কান্ডের পর উত্তর ২৪ পরগণা পুলিশের পরিসংখ্যানে প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর মাসে ১১৯ ও অক্টোবর মাসে ২৮০ জন বাংলাদেশী সীমান্তে ধরা পড়ে। যার দরুন অনুপ্রবেশজনিত সমস্যা এক সন্ত্রস্ত আকার ধারণ করে। এইভাবে সন্ত্রাসের আবহেই সম্পর্কের তাপপ্রবাহ চলতে থাকে।

অসমের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই বাংলাদেশকে জমি হস্তান্তর করা হবে। কেন্দ্রে ইউ পি এ সরকারের আমলে অসমের কিছুটা জমি বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়ায় 'স্থলসীমান্ত চুক্তি' নিয়ে বিরোধীতায় সরব হয়েছিল বিজেপি। কিন্তু ৩০শে নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুয়াহাটির সরুসজাই ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে এক কর্মীসভায় বলেন, ''অসমের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই জমি হস্তান্তর করা হবে। তবে কোনওভাবেই অসমের লোকসান হতে দেব না।''[১৬৪] আরো বলেন, ''অসম বা উত্তরপূর্বকে কোনও শক্তি আঘাত করতে পারবে না। পারবে না দূর্বল করতেও। যারা এ রকম কিছু করতে চায়, কেন্দ্র তাদের খুঁজে বের করে সাজা দেবে।'' এইরকম প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচীব সঞ্জয় মিত্র কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে চিঠি দিয়ে জানায় যে, রাজ্য সরকার চায় ৬৫ বছর ধরে ঝুলে থাকা বিষয়টির সমাধান হোক। ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল বিনিময়ে কোন নীতিগত আপত্তি নেই রাজ্য সরকারের। তবে ছিটমহলের যে অংশ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হবে, সেখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রনয়ন ও পরিকাঠামো উন্নয়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। রাজ্য চায় সেই আর্থিক দায়িত্বের পুরোটাই নিক কেন্দ্র। এইভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার দীর্ঘ বিরোধীতা করা স্থলসীমান্ত চুক্তির ক্ষেত্রে সবুজ সঙ্কেত দেয় কেন্দ্র সরকারকে।

সরকারের এই অবস্থানকে স্বাগত জানিয়ে 'ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি'র নেতা দীপ্তিমান সেনগুপ্ত বলেন, স্থলসীমান্ত চুক্তি বিল সংসদে পাশ হওয়াটা এখন সময়ের অপেক্ষা হয়ে দাঁড়াল। সুদীর্ঘ বঞ্চনার পরে এবার আশার আলো দেখছেন দুদেশের ১৬২টি ছিটমহলের প্রায় ৫৬ হাজার অধিবাসী। ছিটমহল বিনিময় হলে কত সংখ্যক পরিবার ঠিকানা পরিবর্তন করতে চায়? সে সম্পর্কে বলেন, বর্তমানে ভারতীয় ছিটমহলের ১৪৯টি পরিবারের ৭৩৪ জন বাসিন্দা ঠিকানা বদলে

ভারতের নাগরিকত্ব পেতে চান। তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশী ছিটমহলের বাসিন্দারা ইতিমধ্যেই পর্যাপ্ত জমি কোচবিহার প্রশাসনের হাতে দিয়ে রেখেছেন। প্রয়োজনে আরোও জমি দিতে পারেন।[১৬৫] এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির সভাপতি রাহুল সিংহ ছিটমহলবাসীদের পুর্নবাসনের জন্য ৩০০০ কোটি টাকা কেন্দ্রের কাছে দাবী করে বলেন, ‘‘জামাতে ইসলামীর কথাতেই মমতা এতদিন ছিটমহল বিনিময় হতে দেননি। একই কারণে তিনি বিগত সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে বাংলাদেশে ও যাননি। ছিটমহল বিনিময় হলে অনুপ্রবেশ বন্ধ হবে। জঙ্গীরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকতে পারবেন না। এটাই জামাতের কাছে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।’’[১৬৬] এইরকম সময়ে বাংলাদেশের মনে আশার সঞ্চার ঘটে। ভারতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার পদে নিযুক্ত হন সৈয়দ মুয়াজ্জেম আলি। ৯ই ডিসেম্বর ২০১৪ সালে তিনি ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর পরিচয়পত্র জমা দিয়ে বলেন, ‘‘এমন একটা সময়ে আবার ডেকে পাঠিয়েছে সরকার, যখন ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক ক্রমশ উন্নত হচ্ছে।’’[১৬৭] তিনি আরো বলেন, আঞ্চলিক সহযোগিতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়ানোর পাশাপাশি যে বকেয়া বিষয়গুলি রয়েছে সে সম্পর্কেও নয়াদিল্লির কাছে ইতিবাচক বাধা পাওয়া যাচ্ছে। এইভাবে সম্পর্কের উষ্ণতার পারদ চড়তে থাকে।

মুয়াজ্জমের হাইকমিশনার হয়ে ভারতে আসার পর ১৮-২৩শে ডিসেম্বর নয়াদিল্লি সফরে আসেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আব্দুল হামিদ। ৪২ বছর পর কোন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ভারতে এলেন। এরপর তিনি এসে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারিসহ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এবং রাজ্যসভার বিরোধী দল নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সহযোগিতা ও সমৃদ্ধির বার্তা দেন। এই সফরে তিনি ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিমণ্ডিত আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, আজমেঢ়, জয়পুর ও কলকাতা ভ্রমণ করেন। দ্বিপাক্ষিক সাংস্কৃতিক বিনিময়কে জোরদার করে।

এইভাবে ভারতের ‘পূবে তাকাও নীতি’র আংশিক শর্তপূরণের উদ্দেশ্যে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক মজবুত করতে ১০ই ডিসেম্বর গুয়াহাটি থেকে ঢাকা পর্যন্ত বাস পরিষেবা শুরু হয়। স্বাধীনতার পর অসম ও বাংলাদেশের মধ্যে রেল ও সড়ক যোগযোগ বন্ধ ছিল। কলকাতা ও আগরতলা থেকে ঢাকা পর্যন্ত বাস পরিষেবা আগেই শুরু হয়েছে। তাতে নতুন সংযোজন ঘটল গুয়াহাটি-শিলং-শ্রীহট্ট-

ঢাকা রুটের বাস। ঐদিন আসামের পূর্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগ এই বাস যাত্রার সূচনা করে বলেন, ‘‘দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার অসমের ও বাংলাদেশের মধ্যে বাস পরিষেবা চালুর চেষ্টা করেছিল।’’[১৬৮] এপ্রসঙ্গে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচীব শেখ আব্দুল আহাদ বলেন,— ‘‘এই বাস পরিষেবা দুই দেশের সম্পর্ক মজবুত করার পাশাপাশি অসম- মেঘালয়-শ্রীহট্ট-ঢাকার মানুষের কাছে নতুন সুযোগ এনে দিল।’’[১৬৯] যা দ্বিপাক্ষিক সড়ক পরিবহনকে সচল করে তুলবে এবং ট্রানজিটের সুবিধা পাবে।

তবে খাগড়াগড় কান্ডের অন্যতম মাথা শাকিল আহমেদের ডেরা নদীয়ার সীমান্ত গ্রাম বরাবকপুরে জেনে NIA তদন্তে নেমে জঙ্গীযোগেরবহু সূত্র আবিষ্কার করে। সেই আবহে ২৬শে ডিসেম্বর নদীয়ার কৃষ্ণনগরে ভারত-বাংলাদেশ দুদেশের জেলা স্তরের প্রশাসনিক কর্তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশের মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, চুঁয়াডাঙা, কুষ্ঠিয়া, রাজশাহী ও কাপাই নবাবগঞ্জ জেলার পদস্থ কর্তা, বাংলাদেশের বিভিন্ন দফতরের ও বর্ডার গার্ড মিলে প্রায় ৪০ জন কর্তা কৃষ্ণনগরে এসে নদীয়া, মুর্শিদাবাদের পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে ঘন্টাচারেক বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ডার ডিমারকেশন দফতরের কর্তারাও। এই জেলাস্তরের কর্তাদের আলোচনা প্রায় আঠারো বছর পর অনুষ্ঠিত হলো তাৎপর্যমণ্ডিতভাবে। এই দিনের বৈঠকে, সীমান্ত সন্ত্রাস রোধের পাশাপাশি দুদেশের সীমান্ত লাগোয়া এলাকার উন্নয়ন নিয়েও আলোচনা হয়। অপরাধের পর অনেক সময়েই সীমান্ত উজিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া অপরাধীদের চেনা পথ ও রেওয়াজ। এমন ১১২ জন দুষ্কৃতীর নামের তালিকা এদিন দেওয়া হয় বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের হাতে। তবে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা এমন কোনও তালিকা ভারতের হাতে তুলে দেননি।

২০১৪ সালের ১৭-১৮ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের কক্সবাজারে ‘জয়েন্ট স্টাডি গ্রুপের’ (JSD) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মায়ানমার অর্থনৈতিক করিডোর স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যা ভারতের ‘পূবে তাকাও নীতি’র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এরপর ২৬-২৯ শে ডিসেম্বর ৪০তম ‘সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হয় ঢাকাতে এবং সেখানে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মহানির্দেশক (DG) ও বাংলাদেশের বর্ডার গার্ডসের মহানির্দেশক (DG) বৈঠক করেন। সীমান্ত সহযোগিতা সন্ত্রাসরোধ, পাচাররোধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

এছাড়া উভয়দেশের প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিকল্পনার (ITEC) পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৪ সালে ১৮৫জন ভারতে পড়াশোনা করার জন্য আসে। এবং ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে বাংলাদেশের

রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয় যার জন্য ভারত ৫৮.২৪ কোটি টাকা অনুমোদন করেছিল। এছাড়াও ঐ বছর ভারতের Indian footwear components Manufacturers Association (IFCOMA)র সঙ্গে বাংলাদেশের জুতো তৈরির সংস্থা Leather Goods and Footwear Manufacturers & Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB) এর MOU স্বাক্ষরিত হয় যে উভয় পক্ষ এই শিল্পে বিনিয়োগ করবে ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের বৃদ্ধি ঘটাবে। তবে ২০১৪ সালে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬.০৩ বিলিয়ান ডলার যা ২০১২-১৩ তে ছিল ৪.৭ বিলিয়ান ডলার। তাই বাণিজ্য বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬.৩৫% । যা সার্ক দেশগুলির বাণিজ্য বৃদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।[১৭০]

এইভাবে ২০০৯-২০১৪ সাল পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক সাপ লুডো খেলার মতো সরলরৈখিক পথে এগোয়নি। বিএনপি আমলে ভারতবিরোধী বাংলাদেশের অবস্থিতি এবং আওয়ামী লীগের আমলে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন ভারতের ইউপিএ-২ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ককে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবে উভয়দেশ উক্ত সময়কালে কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও গঠনমূলক সহযোগিতার নয়া ইতিহাস গড়ে তুলেছিল।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে NDA ও UPA আমলের তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে NDA সরকারে যে সময়মসীমা তা অত্যন্ত ছোট বা কম। এতদসত্ত্বেও কোন কিছুকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য তুলনার প্রয়োজন। তাই পূর্বোক্ত দুটি অধ্যায় এবং এই অধ্যায়ের পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে UPA আমলের সময় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক একটি গঠনমূলক দিকে এগিয়েছে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। গবেষণা পদ্ধতিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে একথা বলা যায় যে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানান বিরোধ থাকলেও বন্ধুত্ব ও সম্ভাবনাময় দিকগুলি উন্মোচিত হয়েছে UPA আমলে। উভয়দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের মারাত্মক সমস্যা ও নেতৃবর্গের দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যের কারণে সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ সঠিকভাবে বিকশিত হয়নি। কিন্তু কেবলমাত্র মার্জিত ও সহনশীল নীতি প্রণয়নের মধ্যদিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে সদর্থকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে সম্ভবনাময় দিকগুলি হলো— প্রথমতঃ বাংলাদেশ যদি ভারতের প্রস্তাবমত মায়ানামার থেকে সে দেশের মধ্য দিয়ে গ্যাস পাইপলাইন ভারতের ভূখণ্ডে আনার অনুমতি প্রদান করে এবং উত্তর পূর্ব ভারতের “Seven Sister States” গুলোর সাথে সরাসরি যোগাযোগের জন্য “transit” বা ‘স্থলপথ পরিবহন’এর ব্যবহার করতে অনুমতি প্রদান করে তা হলে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটতে পারে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে যে সাতটি রাজ্য রয়েছে এগুলি বাংলাদেশের ভূমি দ্বারা মূল ভারত

থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন। এই সাতটি রাজ্য হল ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশ। এই রাজ্যগুলিতে একদিকে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ অন্যদিকে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এ সকল সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন করার জন্য ও দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত বাংলাদেশের ওপর দিয়ে এই সাতটি রাজ্য বা Seven Sister State এ যাওয়ার ট্রানজিট দাবী করছে দীর্ঘদিন ধরে। বাংলাদেশ এ প্রস্তাব খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ 'স্থলসীমান্ত চুক্তি' ও 'তিস্তা জলবন্টন চুক্তি' বাস্তবায়িত হলে উপরোক্ত সমস্যার সমাধান অনেকখানিই সম্ভবপর হবে। 'ছিটমহল বিনিময় একটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসাবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সদর্থক দিককে তুলে ধরবে।

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের চিটাগাং বন্দর ও ভারতের হলদিয়া, পারদ্বীপ প্রভৃতি বন্দরগুলো যদি একদেশ অপর দেশের জন্য উন্মুক্ত করে দেয় তাহলে দ্বিপাক্ষিক লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ভারত ব্যবহার করতে আগ্রহী কারণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি থেকে সমুদ্রপথে পণ্য ঐ সকল বন্দরে এলে সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আনা খুবই সহজসাধ্য হবে। এতে ভারতের 'পূবে তাকাও নীতি' অনেকটাই বাস্তবতা লাভ করবে।

চতুর্থতঃ ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনার উদ্যোগে চাকমা শরণার্থী সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়। চাকমা শরণার্থীরা ভারতের পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। এতে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার উপর চাপের সৃষ্টি হয়েছিল। NDA সরকার পূর্ববর্তী সময়েই হাসিনা ভারতের চাপের কাছে নতিস্বীকার করেই চাকমা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করেন। যা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ইতিবাচক মাইলস্টোন হিসাবে প্রমাণিত।

পঞ্চমত, নটবর সিং UPA-I এর আমলে ঢাকা সফরকালে সে দেশের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের সাথে এক বৈঠকে দুদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির ওপর জোর দেন এবং সীমান্ত সন্ত্রাস ও অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এগুলি মোকাবিলার জন্য উভয়দেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়েছে।

পঞ্চমতঃ বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ভারত বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং ভারতের

শিল্পপতিগণ সেদেশে বিনিয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়নে ভারত প্রায় ৪,৫৪০ কোটি টাকা বাংলাদেশকে দিয়েছে। ৪৭টি পণ্যের উপর শুল্ক প্রত্যাহার করে নিয়েছে ভারত। এছাড়া ভারতী টেলিকম ১ বিলিয়ান ডলার বিনিয়োগ করেছে। ভারতের মেরু ট্যাক্সী টাটার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ২০০০০ রেডিও ট্যাক্সী চালু করেছে। পালটানা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশ প্রায় ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাচ্ছে। যার দরুন প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো উন্নয়নে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ষষ্ঠতঃ ঢাকা-কোলকাতা, ঢাকা-আগরতলা বাস পরিষেবা দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সচল করেছে। আখাউড়া-আগরতলা রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ঢাকা-কোলকাতা রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মেলবন্ধনকে দৃঢ় করে তুলেছে। ভারত আরো বাংলাদেশের বন্যাপ্রবণ নদীগুলির বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য ড্রেজিং এরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা উভয়পক্ষের কাছে বার্তাবাহী পদক্ষেপ।

সপ্তমতঃ উভয়দেশের মধ্যে যৌথ প্রযোজনায় সিনেমা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংবাদিকদের খবর সরবরাহ, সাংস্কৃতিক সহযোগিতার জন্য হায়দ্রাবাদের সালার জং মিউজিয়ামকে ব্যবহার করা, ভারত ও বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সমন্বয়ে বিভিন্ন প্রকাশনা করা, রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে উভয়দেশের সম্পর্ক স্থাপন একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। যা ভবিষ্যৎ সম্পর্ককে প্রশস্ত করতে পারে।

অষ্টমতঃ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের একটি স্তম্ভ হিসাবে সাফ্টা (SAFTA) চালু হওয়ার পর বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানির পরিমাণ ৪৮০% বেড়ে গেছে শেষ পাঁচ বছরে। তাই দ্বিপাক্ষিক উন্মুক্ত বাণিজ্য বৃদ্ধি হয়েছে অনেকটাই।

নবমতঃ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বিশ্বাযোগ্যতা এর জন্য উভয়দেশের জনগণের আন্তরিক প্রয়াস আবশ্যক। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে ভারতের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাচার হয়ে যাওয়া নারী ও শিশুদের রক্ষার জন্য ভারতের দায়িত্বশীল ও দৃঢ় পদক্ষেপ।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন সঙ্গত কারণেই ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশের প্রত্যাশা অনেক। বাংলাদেশ ও ভারত সার্ক ও বিমস্টেক এর সদস্য। ফলে এ অঞ্চলে উন্নয়নে ভারত একটি বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। এ অঞ্চলের দেশগুলির কাছে ভারতের গ্রহণযোগ্যতা তাই বাড়ানো প্রয়োজন।

এটা সম্ভব যদি ভারত প্রতিবেশী বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক দায়িত্বশীলতার পরিচয় ভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। ভারতের NDA বা UPA জোট সরকার প্রতিবেশী দেশগুলোরসাথে সম্পর্ক উন্নয়নে যে অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছে তার সঠিক বাস্তবায়নই এই অঞ্চলে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করবে।

একবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপ থেকে এশিয়ার দেশগুলির দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার নতুন শতাব্দী স্থাপনের দিকে এগোচ্ছে তখন তার নিরিখে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কও যথেষ্ট তাৎপর্যমণ্ডিত। তাই উভয় দেশের মধ্যে প্রয়োজন 'Common', 'Comprehensive' and 'Cooperative Security'। এ প্রসঙ্গে বলা যায় All there have led to the emergence of a more holistic approach of 'Human security'....human security refers to the quality of life of the people of a society or polity. Anything that degrades their quality of life like demogaphic pressures, diminish access to or stock of resources, etc is a security concern. Conversely, anything that can upgrade their quality of life like economic growth improved access to resources, social and political empowerment, etc is an enhancement of human security."[১৭১]

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে নিরাপত্তাগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বাংলাদেশ ভারতকে একটি 'Security threat' হিসাবেও কখনো কখনো দেখে। দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বৈরীতার বিষয়ে এরকম মানসিক উদ্বেগ বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়— "Most security interpretations vary from country to country in congruence with their domestic political developments and geopolitical realites and neighbourly pattern of relationship. Six of the south asian states perceive threat of security from "one power hegemony" viz India, with its huze size, popuation and resources.[১৭২] যাকে 'Peculiar fear phychosis' বা "big brotherly and regional bully' হিসাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

অন্যদিকে আবার এই সম্পর্ককে Track-II diplomacy বা দ্বৈত কূটনৈতিক তত্ত্বের নিরিখে বিশ্লেষণ করা যায়। ট্রাক-টু কূটনীতির মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈরীতার ক্ষেত্রগুলিতে সমস্যার সমাধানে উদোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। Track-II diplomacy র ধারণাটি হল এই যে—

The concept of Track-II diplomacy which is generally more acceptable, hasbeen defined as 'unofficial', informal interaction between members of adversary groups or nations which aims to develop strategies, influence public opinion, and organize human and material resources in ways that might help resolve their conflict.[১৭৩] এর প্রয়োগ এভাবে সম্ভব যে (১) সমস্যা সমাধানে উভয়দেশের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। (২) নয়া সমস্যার উদ্ভবের পথকে বন্ধ করা (৩) উভয়দেশের মধ্যে উদ্বেগ কমিয়ে বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করা (৪) নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা এড়িয়ে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করা— তবেই রাজনৈতিক সদিচ্ছার মাধ্যমে সম্পর্কের উন্নয়ন সম্ভব হবে।

তাই এই তত্ত্বকে বাস্তবিক প্রয়োগ করতে গেলে দেখা যায় যে—

১) এটি হলো সম্পর্ক স্থাপনের দ্বিতীয় পদ্ধতি যা উভয় দেশের মধ্যে সেতু নির্মাণ করবে নয়া বিদেশনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে।

২) এর মাধ্যমে উভয় দেশের জনগণের মধ্যে People to People contact গড়ে উঠবে।

৩) সম্পর্কের উন্নয়নে বহুপাক্ষিক আলাপ আলোচনা ও ইস্যু ভিত্তিক বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যাবর্তন বা বিনিময় সম্ভব হবে। যা সার্কের মাধ্যমেও ঘটতে পারে।

৪) দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ব্যবসা বাণিজ্যের বৃদ্ধি ও সংযোগ এর ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫) প্রতিনিয়ত ধারাবাহিকভাবে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষক বিনিময় পরিকল্পনা সফল হবে।

৬) দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে সুদৃঢ় করতে গেলে এর বাইরের দেশগুলির সঙ্গেও দূরত্ব কমাতে হবে।

৭) এভাবে দ্বৈত কূটনৈতিক ব্যবস্থা আন্তঃ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এইভাবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দের মাধ্যমে প্রত্যাশিত মানব উন্নয়নকে সফল করে তুলতে সক্ষম হবে। যাকে এক কথায় বলা যায়— Promoting the welfare

of the peoples of the two countries and improving their quality of life, acelarated economic growth, social progress and cultural development. যা দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি ও কৌশলগত সম্পর্ককে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে।।

তথ্যসূত্র

১. Annual Report 2004-2005, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, p -03.

২. Gokuldas M.V. and Bhattyacharya Pinaki –'Bangladesh A Pricly Relationship' in *India and Neighbours*, CNF, New Delhi,2005, p.-107.

৩. Ibid, p -101.

৪. Op.cit.no -2, p -114.

৫. Chakraborty Asish – 'Prakitik Gas Rajnitir Garoy' in *Desh* ,Vol. -72, No. – 4 ,ABP Private Ltd, Kolkata, 2004, P-33.(in Bengali)

৬. Op.cit.,no -1, p -04.

৭. Annual Report 2005-2006, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, p -04.

৮. 'Tension over Indo-Bangladesh border BDR intensifies troops deployment' in *News behind News* (May 02) Asia News Agency Pvt. Ltd.,New Delhi,2005, p. -25.

৯. Ibid.

১০. Op.cit. , no. – 07, p – 04.

১১. Basuroychoudhury Sabyasachi – 'Natwar sunnya hatei firlern' in *Desh*, Vol. -72' No. – 21, ABP Pvt. Ltd.,Kolkata,2005, p. -27.(in Bengali)

১২. Sen Parama – 'Taslimar badale gas' in *Desh*, Vol. 72, No. -16, ABP Pvt. Ltd.,Kolkata, 2005,p. -25.

১৩. Op.cit. , no. -7,p.- 04.(in Bengali)

১৪. Dutta V P – India's foreign policy –since independence, National Book Trust, New Delhi,2007, p. -138.

১৫. Annual Report 2006-2007, Ministry of External affairs, Government. of India, New Delhi ,p. -04.

১৬. "Speech by Prime Minister Dr. Manmohan Singh at the Banquet in honour of Bangladesh Prime Minister Begum Khaleda Zia" in *Strategic Digest*, Vol. – 36, No. -04, April 2006. Source: http://meaindia.nic.in./speech/2006/03/09ss01htm.

১৭. Ghosh Sreemoyee –'Antarjatik Rajnitite Anchalik Sangathan' in Purusottam Bhattyacharya and Anindyajyoti Mazumdar(eds.) *Antarjatik Samparker Ruprekha*, Setu, Kolkata, 2007, p. – 290.

১৮. Op.cit. ,no. -15,p. -05.(in Bengali)

১৯. Rajamohan C – 'India's Neibourhood Policy : four dimentions' in *Indian foreign affairs Journal*, Vol. -02, No. -01, Jan-Mar 2007, Cambridge University Press, New Delhi, 2007, p. -11.

২০. Prof. Chakraborty Tridib – 'Seikh Hasina's India Mission : From distance to Proximity' in *World Focus*, No. -362, feb 2010, New Delhi, 2010, p. -37.

২১. Mastoor Mariyam – 'Bangladesh's Political Turmoil, 2006 -08 : An Analysis' in *Regional Studies*, Vol. –xxvii,No. 04, Autumn 2007, Institute of Regional Studies, Islamabad, 2007, p. -87.

২২. Anti corruption Commission, News update January 2009,Source : http://acc.org.bd/jan09.php

২৩. Datta Sreeradha – 'Caretaking Democracy – Political process in *Bangladesh 2006 - 2008*, (Chapter -6)Institute for Defence Studies and Analysis, New Delhi,2009, pp. - 88-89.

২৪. Annual Report 2007-2008, Ministry of External affairs, Government. of India, New Delhi ,p. -04.

২৫. Op.cit. ,no. -23, p.- 09.

২৬. Indian Express , 23rd july 2007. Source : www.indianexpress.com

২৭. Op.cit. ,no. -24 ,p. – 04.

২৮. The Daily Star, 23rd November,2007.

২৯. Annual Report 2008-2009, Ministry of External affairs, Government. of India, New Delhi ,p. -04

৩০. Op.cit. ,no. -28.

৩১. Op.cit. ,no. -29, P. -04.

৩২. Op.cit. ,no. -23, p.- 111.

৩৩. Uddin M. Jasim –'Security sector reform in Bangladesh' in *South Asian Survey*, Vol. -16, No. -02, July-Dec 2009, Sage Publications, New Delhi, 2009, p. -225.

৩৪. Ahmed Nizam –'Critical elections and democratic consolidations : the 2008 parliamentary elections in Bangladesh' in *Contemporary South Asia*, Vol. -19, No. -02, June 2011, Routledge, UK, 2011, p. -147.

৩৫. Op.cit. ,no. -21, p. -101.

৩৬. Op.cit. ,no. -20, p. -38.

৩৭. Annual Report 2009-2010, Ministry of External Affairs , Government of India, New Delhi, p.-04.

৩৮. Karim Mohd. Aminul – 'Bangladesh –India Relations : Some recent trends' in *ISAS working paper*, No. -96, National University of Singapore, Singapore, 2009, p. -38.

৩৯. Op.cit. ,no. -20, p. -38.

৪০. Dixit J N – India's foreign policy and its Neighbours, Gyan Publishing house, New Delhi, 2001,p.-208.

৪১. Annual Report 2010 -2011 ,Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, p. -02

৪২. Ibid.

৪৩. Anandabazar Patrika , 16th june 2011, pp. -1,13.

৪৪. Anandabazar Patrika, 8th April 2011, p. -02.

৪৫. Ajkal, 8th May 2011, p. -02

৪৬. Dainik Statesman , 7th July 2011, p. -05.

৪৭. Anandabazar Patrika, 8th July 2011, p. -01.

৪৮. Ibid.

৪৯. Bartaman, 9th July 2011, p. -15.

৫০. Anandabazar Patrika , 8th July 2011,p. -05.

৫১. Annual Report 2011-2012, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, p. -04.

৫২. Anandabazar Patrika, 28th August 2011,p. -1.

৫৩. Anandabazar Patrika, 7th September2011, p. -1.

৫৪. Op.cit. ,no. -58.

৫৫. Anandabazar Patrika, 14th September 2011,p. -08.

৫৬. Anandabazar Patrika,9th September 2011, p. -04.

৫৭. Anandabazar Patrika, 14th September 2011,p. -1.

৫৮. Anandabazar Patrika,18th October 2011, p. -9.

৫৯. Ibid.

৬০. Op.cit. ,no. -58.

৬১. Anandabazar Patrika, 21st October 2011,p. -6.

৬২. Anandabazar Patrika,20th October 2011, pp. -1,9.

৬৩. Ibid.

৬৪. Anandabazar Patrika, 23rd October 2011, p. -1.

৬৫. Anandabazar Patrika, 29th October 2011, p. -1.

৬৬. Ibid.

৬৭. Anandabazar Patrika, 26th October 2011.

৬৮. Anandabazar Patrika, 8th November 2011, p. -1.

৬৯. Ibid., p.-8.

৭০. Anandabazar Patrika, 11th November 2011, p.-5.

৭১. Ibid.

৭২. Anandabazar Patrika, 17th November 2011, p.-1.

৭৩. Ibid.

৭৪. Anandabazar Patrika, 22nd November 2011, p. -6.

৭৫. Anandabazar Patrika, 3rd December 2011, p. -1.

৭৬. Ibid.

৭৭. Anandabazar Patrika, 7th December 2011, p. -1.

৭৮. Op.cit.,no. -51, p. -5.

৭৯. Anandabazar Patrika, 11th January 2012, p. -1.

৮০. Anandabazar Patrika, 12th January 2012, p.-5.

৮১. Anandabazar Patrika, 13th January 2012, p.-5.

৮২. Ibid.

৮৩. Anandabazar Patrika, 21st January 2012, p. -1.

৮৪. Anandabazar Patrika, 22nd January 2012, p. -17.

৮৫. Anandabazar Patrika, 18th February 2012, p. -7.

৮৬. Anandabazar Patrika, 25th February 2012, p. -5.

৮৭. Annual Report 2012-2013, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, p. -2.

৮৮. Anandabazar Patrika, 7th May 2012, p. -5.

৮৯. Ibid.

৯০. Op.cit. ,no.-88, p.-5.

৯১. Anandabazar Patrika, 8th May 2012, p. -5.

৯২. Op.cit. ,no. -87,p. -2.

৯৩. Anandabazar Patrika, 15th August 2012, p. -5.

৯৪. Anandabazar Patrika, 28th August 2012, p. -5.

৯৫. Anandabazar Patrika, 23rd August 2012, p. -14.

৯৬. Op.cit. ,no. -92, p. -2.

৯৭. Anandabazar Patrika, 17th November 2012, p. -7.

৯৮. Anandabazar Patrika, 2nd December 2012, p. -5.

৯৯. Anandabazar Patrika, 3rd December 2012, p. -5.

১০০. Anandabazar Patrika, 16th December 2012, p. -5.

১০১. Anandabazar Patrika, 18th December 2012, p. -8.

১০২. Ganasakti, 29th January 2013, pp.-1, 2.

১০৩. Anandabazar Patrika, 30th January 2013, p. -9.

১০৪. Anandabazar Patrika, 4th February 2013, p. -6.

১০৫. Anandabazar Patrika, 9th February 2013, p. -5.

১০৬. Anandabazar Patrika, 9th February 2013, pp. -1, 7.

১০৭. Ibid.

১০৮. Ganasakti, 18th February 2013, p.-7.

১০৯. Anandabazar Patrika, 19th February 2013, p. -5.

১১০. Anandabazar Patrika, 7th March 2013, p.-5.

১১১. Anandabazar Patrika, 22nd April 2013, p. -7.

১১২. Anandabazar Patrika, 11th June 2013, p. -9.

১১৩. Anandabazar Patrika, 13th July 2013, p. -5.

১১৪. Anandabazar Patrika, 26th July 2013, p. -9.

১১৫. Ibid.

১১৬. Anandabazar Patrika, 27th July 2013, p. -9.

১১৭. Anandabazar Patrika, 2nd August 2013, p. -7.

১১৮. Anandabazar Patrika, 13th September 2013, p.-7.

১১৯. Anandabazar Patrika, 28th September 2013, p. -9.

১২০. Ganasakti, 30th September 2013, p. -7.

১২১. Anandabazar Patrika, 6th October 2013, p. -5.

১২২. Ibid.

১২৩. Op.cit.,no. -121.

১২৪. Anandabazar Patrika, 21st October 2013, p. -5.

১২৫. Anandabazar Patrika, 26th October 2013, pp. -1, 6.

১২৬. Ibid.

১২৭. Anandabazar Patrika, 2nd November 2013, p. -1.

১২৮. Ibid.

১২৯. Anandabazar Patrika, 6th November 2013, p. -7.

১৩০. Ibid.

১৩১. Anandabazar Patrika, 12th November 2013, p. -6.

১৩২. Ibid.

১৩৩. Anandabazar Patrika, 18th November 2013, p. -5.

১৩৪. Ibid.

১৩৫. Anandabazar Patrika, 20th November 2013, p. -7.

১৩৬. Anandabazar Patrika, 22nd November 2013, p. -9.

১৩৭. Anandabazar Patrika, 30th November 2013, p.-9.

১৩৮. Ibid.

১৩৯. Anandabazar Patrika, 6th December 2013, p. -9.

১৪০. Ibid.

১৪১. Anandabazar Patrika, 18th December 2013, p. -7.

১৪২. Anandabazar Patrika, 31st December 2013, p. -4.

১৪৩. Anandabazar Patrika, 2nd January 2014, p. -7.

১৪৪. Anandabazar Patrika, 5th January 2014, p. -13.

১৪৫. Anandabazar Patrika, 7th January 2014, p.-7.

১৪৬. Anandabazar Patrika, 12th January 2014, p. -17.

১৪৭. Anandabazar Patrika, 13th January 2014, p. -8.

১৪৮. Anandabazar Patrika, 20th January 2014, p. -9.

১৪৯. Anandabazar Patrika, 7th February2014, p.- 11.

১৫০. Anandabazar Patrika, 26th February2014, p. -11.

১৫১. Ibid.

১৫২. Op.cit. ,no. -150.

১৫৩. Anandabazar Patrika, 20th March 2014, p. -9.

১৫৪. Ibid.

১৫৫. Anandabazar Patrika, 16th May2014, p. -5.

১৫৬. Anandabazar Patrika, 28th May2014, p.-10.

১৫৭. Ganasakti, 27th June 2014, p. -7.

১৫৮. Anandabazar Patrika, 20th August2014, p. -4.

১৫৯. Annual Report 2014 -2015, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, 2014, p. -5.

১৬০. Anandabazar Patrika, 21st September 2014, p. -5.

১৬১. Anandabazar Patrika, 10th October 2014, p. -7.

১৬২. Op.cit.,no. -159.

১৬৩. Anandabazar Patrika, 12th November2014, p. -1.

১৬৪. Anandabazar Patrika, 1st December 2014, p. -5.

১৬৫. Anandabazar Patrika, 3rd December 2014, p. -5.

১৬৬. Anandabazar Patrika, 12th December 2014,p. -8.

১৬৭. Anandabazar Patrika, 10th December 2014, p. -5.

১৬৮. Anandabazar Patrika, 11th December 2014, p. -5.

১৬৯. Ibid.

১৭০. Op.cit. ,no.-162.

১৭১. Chakraborty Shantanu – Cooperation in South Asia –the Indian Perspective, (Chapter-6), K.P. Bagchi & Company, Kolkata, 2008, p.-200.

১৭২. Cheema Pervaiz Iqbal – 'SAARC needs revamping' in Eric Gonsalves and Nancy Jetly (eds.) – *The Dynamics of South Asian Regional Cooperation and SAARC*, Sage Publication,New Delhi, 1999,p. -66.

১৭৩. Op.cit. ,no.-171, p.-201.

চতুর্থ অধ্যায়

ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়নে (সার্ক) SAARC একটি মঞ্চ

দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতির বিশ্লেষণে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়নে সার্ক একটি অতি আবশ্যক মঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক উপ-ব্যবস্থাকে সামগ্রিক বিশ্ব রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সাধারণত, ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে সন্নিহিত বা ঘনিষ্ঠ দেশ সমূহের মধ্যে সহযোগিতার তাগিদই এই উপব্যবস্থার জন্ম দেয়। যাতে করে এতদ্ অঞ্চলের জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান বৃদ্ধি পায় এবং বর্হিবিশ্বে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা আদায়ে যৌথ প্রয়াস সফল হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে উপনিবেশিক আমল থেকে ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন এইরকম একটি উপব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। যা সার্ক নামে আত্মপ্রকাশ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল দুটি অতিবৃহৎ রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ ও ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয়কে কেন্দ্র করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে উদ্ভুত বৈরীতা ঘণীভূত হয়ে পৃথিবীকে এক যুদ্ধহীন উত্তেজনার সম্মুখীন করেছিল। দুই বৃহৎশক্তির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন অস্ত্র প্রতিযোগিতার পরিস্থিতি ঠাণ্ডাযুদ্ধের মাত্রাকে উত্তপ্ত করে তোলে। তাই এই এরকম পরিস্থিতিতে দুই বৃহৎশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন সামরিকভাবে জোটবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস শুরু করে তখন অন্যদিকে একটি নতুন প্রবণতার উন্মেষ ঘটে। শুরু হয় আঞ্চলিক সংহতির প্রয়াস। পশ্চিম ইউরোপ ছিল এর প্রাথমিক উদাহরণ। এই আঞ্চলিক সংহতির প্রয়াস বহুমুখী ও বহুমাত্রিক প্রকার লাভ করে। তবে দক্ষিণ এশিয়ায় দেশগুলির মধ্যে ইতিহাসের অভিন্ন অভিজ্ঞতা, নৈসর্গিক নৈকট্য এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পূরকতা জাতি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একধরনের বন্ধন রচনা করেছিল। আবার একটি আঞ্চলিক ব্যবস্থার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সবক্ষেত্রে স্বার্থের ঐক্য নাও থাকতে পারে। তবে এই প্রক্রিয়ার সাফল্য তখনই আসে যখন বিরোধকে অতিক্রম করে সহযোগিতা এবং এই আঞ্চলিক ব্যবস্থার অংশীদার রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয় নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে সমন্বয়ের দ্বারা। আঞ্চলিক সংহতির চরিত্র বিভিন্ন ধরনের হলেও এর লক্ষ্য সদস্য দেশগুলির উন্নতি, বিকাশ ও সুরক্ষা। তাই সহযোগিতা হল আঞ্চলিক সংহতির প্রাথমিক ভিত্তি। সেই অর্থে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সংহত হওয়ার সুযোগ যেমন ছিল, তেমনি বাধা বিপত্তিও ছিল বিস্তর ও সুকঠিন।

এতদসত্ত্বেও আশির দশকে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যিনি প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি হলেন বাংলাদেশের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। যার উদ্দেশ্য ছিল— "to Promote the welfare of the peoples of south Asia and to improve their quality of life.[১] আরো বলা যায়— President Zia Conceived of regionalism for this "region without regionalism"[২] দক্ষিণ-এশিয়ার অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির একটা সাধারণ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থাকলেও দারিদ্য, অশিক্ষা, বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পুঁজির অভাব ছিল এদের সাধারণ সমস্যা। তাসত্ত্বেও সমস্ত সংকট ও বিপ্রতিপতাকে অনেকটা অতিক্রম করে ১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় মিলিত হয়েছিল। ভারত, ভুটান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল 'সার্ক' (SAARC)। এই সম্মেলনে প্রয়াত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মন্তব্য করেন— এই অঞ্চলের জনগণ ''দক্ষিণ এশিয়ার অভিন্ন চেতনায় উজ্জীবিত। আমাদের জনগণের মাঝে রয়েছে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতা ও পরিচিতি, অভিন্ন মূল্যবোধ, জ্ঞাতিসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ।"[৩] এই প্রেক্ষিতে সার্ককে গণ্য করা যায় এই অঞ্চলের অপরিহার্য ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে। এছাড়া সাতটি দেশের নেতৃবৃন্দ দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন— ''দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে তাদের সাধারণ মানবিক ও বস্তুগত সম্পদের সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার করা হবে।"[৪] কিন্তু 'সার্ক' গঠিত হওয়ার পরেও সদস্য দেশগুলির মধ্যে চলেছিল সংঘাত ও পারস্পরিক অভিযোগের ধারাবাহিক পর্ব। তাই বাংলাদেশের আবির্ভাবে ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা থাকলেও মুজিব উত্তর যুগে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে চোরা দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। অন্যদিকে শ্রীলঙ্কায় তামিল জনগোষ্ঠীর আন্দোলনে ভারতের ভূমিকা ভারত-শ্রীলঙ্কা সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি করেছিল। তেমনই অর্থনৈতিকভাবে নেপাল ভারতের ওপর নির্ভরশীল থাকলেও নেপালের শাসকগোষ্ঠীর ওপর চীনের গভীর ভারত বিদ্বেষের একটা প্রভাব ছিল। স্বভাবতই সার্কের দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের এই টানাপোড়েন প্রথম থেকেই দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সংহতির প্রয়াসকে আড়ষ্ট ও নিরুত্তাপ রেখেছিল।

সে যাইহোক, ১৯৮০ দশকে যখন সার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তখন খোদ দক্ষিণ এশিয়া এবং তার নিকট প্রতিবেশী অঞ্চলে বিরাজমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা বুঝতে পারব যে আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের তৎকালীন নেতৃত্বকে কমবেশী অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল। ১৯৭৯ সালের শুরুতে ভিয়েতনাম তার পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কম্বোডিয়ায় সৈন্য

পাঠিয়ে সেখানকার পলপট সরকারকে উচ্ছেদ করে এবং নিজেদের পছন্দমতো হুন্‌সেন সরকারের হাতে নমপেনের শাসনভার তুলে দেয়। এদিকে ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে সৈন্য প্রেরণ করে এবং কাবুলে তাদের তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করে। একদিকে ভিয়েতনাম অন্যদিকে আফগানিস্তান, এই দুই দেশের মোটামুটি মাঝামাঝি স্থানে এবং সমান দূরত্বে বাংলাদেশের অবস্থান। ঠিক একই সময়ে কাকতালীয় হলেও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্যপদের মেয়াদ ও শেষ হয়ে যায়।

দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশের জন্য বিশেষ করে ছোট ছোট দেশগুলোর জন্য কাম্বোডিয়া এবং আফগানিস্তানের ঘটনা কিছুটা যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ফলে দেশগুলো প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশের উদ্যোগে ইতিবাচক সাড়া দিতে এগিয়ে এসেছিল। অন্যদিকে ভারত ও পাকিস্তান তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা বিবেচনায় এ ব্যাপারে তেমন উৎসুক্য দেখায়নি, বরং পরোক্ষভাবে একে নিরুৎসাহিত করবার প্রয়াস পেয়েছে। ভারত মনে করতো, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো প্রস্তাবিত অঞ্চালিক সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক বিষয়ে ভারতের উপর সম্মিলিত চাপ সৃষ্টি করে তার স্বার্থ বিঘ্নিত করবার সুযোগ পাবে। অন্যদিকে পাকিস্তান সন্দেহ করতো, আঞ্চলিক সংস্থার বিষয়টি আসলে ভারতের একটি কূটনৈতিক চাল। উদ্দেশ্য, পাকিস্তানসহ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় তার আধিপত্য বিস্তার। যাকে এককথায় বলা যায় “mistrust Syndrome”।[৫]

দক্ষিণ এশিয় দেশগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে কিভাবে পরস্পরের পরিপূরক হবে। তা ‘সার্ক’ প্রতিষ্ঠার কিছুদিন আগে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত যে নির্জোট সম্মেলনে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছিল সার্ক তারই এক সার্থক পদক্ষেপ বলে আশা প্রকাশ করা যায়। আত্মনির্ভরতার যৌথ কর্মসূচীতে দেশগুলিকে ব্রতী হতে হবে এই সংকল্পও ব্যক্ত হয়। এই সংস্থার কোন সামরিক উদ্দেশ্য থাকবে না; প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হবে এই সংস্থার সফল কার্যক্রমে; দ্বি-পাক্ষিক স্তরে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তা নিয়ে এই সংস্থাকে ভারাক্রান্ত করা যাবেনা। একটি ত্রিস্তরীয় সংস্থা গড়ে তোলা হবে, যার শীর্ষে থাকবে রাষ্ট্র নায়কদের শীর্ষ সম্মেলন, মধ্যে থাকবে বিদেশমন্ত্রীদের পরিষদ, নিয়মিত কাজকর্ম পরিচালনার জন্য থাকবে একটি সচিবালয়। উপরিউক্ত সনদের স্বার্থকতার মাধ্যমে যেসব মূল উদ্দেশ্য অভিমুখে সার্ক সংগঠন পরিচালিত হবে তাও স্থিরিকৃত হয়— ঢাকায় ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে প্রথম সম্মেলনে। সেগুলি হল— জীবনযাত্রার গুণমান বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিসঞ্চার, যৌথ স্বনির্ভরতার ভিত্তিস্থাপন, পারস্পরিক আস্থা সৃষ্টি, বিজ্ঞান ও কারিগরী সহযোগিতার

সম্প্রসারণ এবং সকলের জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবনের আশ্বাস।[৬] সনদের ৩ এবং ৮ নং ধারায় সাংগঠনিক কাঠামো বিবৃত হয়েছে। রাষ্ট্রনায়কগণ বৎসরে একবার এবং যখনই কোন জরুরী অবস্থা দেখা দেবে তখনই মিলিত হবেন শীর্ষ সম্মেলনে। কার্য পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রী পরিষদের ব্যবস্থা রয়েছে যার কাজ হবে সংগঠনের নীতি নির্ধারণ, সহযোগিতার গতিপ্রকৃতি বিচার, নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি। সার্ক সচিবালয় গঠনের দায়িত্ব পড়ে মন্ত্রীপর্ষদের উপর। তাই ঢাকাতেই সচিবালয়ের কাজ শুরু হলেও স্থায়ী দপ্তর কাঠমাণ্ডুতে স্থানান্তরিত হয়।[৭]

সার্কের দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল ১৯৮৬ সালের নভেম্বরে ব্যাঙ্গালোরে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত তার নিজস্ব আধিপত্য বলয় গড়ে তোলার ইচ্ছা থেকে নিজেদের বিযুক্ত রাখার প্রবণতা সার্কের অন্যান্য দেশগুলিকে খানিকটা সন্দিগ্ধ করেছিল। এই সম্মেলনে মাদক দ্রব্য চালান প্রতিরোধ, সন্ত্রাসবাদ দমন, উন্নয়নের কর্মসূচীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদের অপশাসন, নামিবিয়ার স্বাধীনতার প্রশ্নে নিজেদের সদর্থক ভূমিকা ও সচিবালয় গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

সার্কের তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮৭ সালে নেপালের কাঠমাণ্ডুতে। এই সম্মেলনে ২.১৯ লক্ষ টন পরিমাণের এশীয় খাদ্যভাণ্ডার মজুতের সিদ্ধান্ত, উত্তর-দক্ষিণ সহযোগিতা, সন্ত্রাস দমন, আঞ্চলিক স্থিতি ও বাণিজ্য সহযেগিতা, দক্ষিণ এশিয়ার ক্রমাগত পরিবেশ বিপর্যয় সম্বন্ধে সজাগ থাকার প্রস্তাব গ্রহণ, বাংলাদেশ ও নেপাল নদী প্রকল্প ও জলবন্টনের বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করে। যা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়ে।

চতুর্থ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে। এই সম্মেলনে ভারত-পাক সম্পর্কের গতিসঞ্চার হয়। এই সম্মেলনে “SAARC-2000; A Basic Needs Perspective” প্রকল্পে স্বাক্ষরতা, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য এই তিনটি ক্ষেত্রে জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়, যার সুফল দশকোটি মানুষ একসঙ্গে ভোগ করবে। যা ভারত ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সুফল হিসাবে প্রতিভাত হয়। এছাড়া মাদক চোরাচালানের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো এবং ১৯৯০ সালকে ‘কন্যাবর্ষ’ “SAARC Year of the Girl Child’ রূপে চিহ্নিত করা হয়।[৮]

১৯৯০ সালের নভেম্বরে মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে সার্কের পঞ্চম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ইরাকের কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে পশ্চিম এশিয়ায় ঘনীভূত সংকট প্রভাব ফেলে এবং কুয়েত থেকে ইরাককে সেনা প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছিল।

১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে কলম্বোতে ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ঠাণ্ডা লড়াই-এর অবসান সূচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী দুনিয়ার আধিপত্য বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা হওয়ার সুযোগ পায়। তাই এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির খাপ খাইয়ে নেওয়ার পালা অনুভব করে। তাই বাণিজ্যে উদারীকরণ, বিদ্যমান উচ্চহারের বাণিজ্যশুল্ক কমিয়ে আনা, সরকারী স্তরে কর্মীগোষ্ঠী তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে মাদক ব্যবস্থা প্রতিরোধ, সন্ত্রাসদমন, আঞ্চলিক বিরোধ মীমাংসার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হয়।

সার্কের সপ্তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা শহরে। ১৯৯২-এর ডিসেম্বর মাসে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে একটা সাম্প্রদায়িকতার অশুভ পরিবেশ তৈরি করেছিল। এর প্রভাব ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। তবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রভাব ঢাকা সম্মেলনকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তাই এই সম্মেলনে সম্পাদিত হয়েছিল সাপটা (SAPTA) অর্থাৎ South Asian Preferential Trade Agreement (SAPTA) যার মূল নীতিগুলি হলো—

- Overall reciprocity and mutuality of advantages so as to benefit equitably all contracting states, taking into account their respective levels of economic and industrial development, the pattern of their external trade, trade and tariff Policies and systems.

- Negotiations of tariff reform step by step, improved and extended in successive stages though periodic reviews.

- recognition of the special needs of the least developed contracting states and agreement on concrete preferential measures in their favour; and

- inclusion of all products, manufactures and commodities in their raw, semi processed and processed forms.[৯] এবং ২০১১ সালের মধ্যে SAPTA বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশ যেহেতু ভারতের ১৭তম বৃহত্তর বাণিজ্য সহযোগী দেশ তাই এই SAPTA-র ফলে বাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতের সুবিধাই হয়েছিল। ১৭৫টি বিষয়ে সার্ক-গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য শুল্ক হ্রাসের বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল এই সম্মেলনে। এছাড়া

SAPTA ছাড়াও ASEAN, EEC এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত এই সম্মেলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

১৯৯৫ সালের মে মাসে সার্কের অষ্টম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দিল্লিতে। এই সম্মেলনে কাশ্মীরের জঙ্গী সন্ত্রাসকে কেন্দ্র করে ভারত-পাক সম্পর্ক তিক্ততার পর্যায়ে পৌঁছায়। পাকিস্তান কাশ্মীর ইস্যুর আন্তর্জাতিকীকরণ করার জন্য ভূমিকা নেয়, ভারত তার বিরোধীতা করে। এই সম্মেলনে বাংলাদেশ ১২০টি এবং ভারত ১০৬টি পণ্যের শুল্ক হ্রাস করে যার ফলে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে একটি সাড়া পাওয়া যায়। ২০০২ সালের মধ্যে সার্কের দেশগুলির মধ্যে দারিদ্র দূরীকরণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। এছাড়াও সন্ত্রাস দমন, মাদক চালান রোধ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হয়।

নবম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালের মে মাসে মালে তে। এই সম্মেলনে দারিদ্র্য দূরীকরণ, পরিবেশ সুরক্ষা, মহিলা ও শিশুকল্যাণ, যৌথ অর্থনৈতিক উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হয়। প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি Consortium of Open University বা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মণ্ডলী গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের উদারীকরণ যার থেকে খোলাবাজার সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে গড়ে তুলতে SAPTA একটি অঞ্চলের জন্ম দেয় যার নাম SAFTA বা South Asian Free Trade Area বা দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল। তাই এই সম্মেলনে এই মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে কলম্বোতে সার্কের দশম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বছর মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিযোগিতামূলক পরমাণু বিস্ফোরণ প্রথম থেকেই গভীর দুশ্চিন্তার সঞ্চার করে। এর প্রভাব বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ও আশঙ্কা ও ভীতির সঞ্চার করে। যদিও এই সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ মন্তব্য করেন যে, সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সার্কের পক্ষে সদস্য দেশগুলির পারস্পরিক মতভেদ ও উত্তেজনা থেকে নিস্পৃহ থাকা সম্ভব নয়। তিনি ‘শান্তি-নিরাপত্তা-উন্নয়ন’ নামে ত্রিমুখী শ্লোগান তুলে সার্ক বিদেশমন্ত্রীদের নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বিরোধগুলির নিয়মিত পর্যালোচনার দাবী রাখেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এর কঠোর বিরোধীতা করে বলেন ‘no first strike’ অর্থাৎ ‘প্রথম আঘাত থেকে বিরত থাকা’ এবং পরমাণু অস্ত্রহীন কোন রাষ্ট্রের ওপর পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগ না করা।[১০] উক্ত সময়ে শ্রীলঙ্কাতে তামিলদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও কাশ্মীরে তালিবানী সন্ত্রাস দক্ষিণ এশিয়াকে অস্থির করে তুলেছিল। তাই আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্যের ক্ষেত্রে

পরিমাণগত অন্তরায় দূর করা এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনের ও নিয়ন্ত্রণ করার ওপর জোর দেওয়া হয় এই সম্মেলনে।

সার্কের দশম সম্মেলনের কয়েকবছর পর ২০০২ সালে নেপালের রাজধানী কাঠামাণ্ডুতে একাদশতম শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্যাবধানের প্রথম কারণ ছিল দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতা। ৯/১১ এর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ দমনের প্রচেষ্টাও আফগানিস্তানের ওপর চূড়ান্ত বলপ্রয়োগ অন্যদিকে কার্গিল যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ব্যর্থ আগ্রা বৈঠকসহ ২০০১ সালে ভারতীয় সংসদে জঙ্গী হানা অস্থির ও একটি সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দক্ষিণ এশিয়াতে। এই সময় বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের অবসান এবং বেগম খালেদা জিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু বিশেষজ্ঞ মনে করেছিলেন যে এই উত্তপ্ত ও জটিল পরিমণ্ডলে সার্কের সম্মেলন সুসম্পন্ন হওয়াটাই বড় সাফল্য।

তবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সার্কের ব্যর্থতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন যে, সার্ক তার জন্মের পর থেকে কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখাতে পারেনি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সার্কের মঞ্চকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাবার মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে সন্ত্রাস দমনে কড়া পদক্ষেপ না নিলে দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচী সফল হবেনা। পাকিস্তান অবশ্য দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলিকে সার্কের মঞ্চে আনার পুরনো প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তবে তা সফল হয়নি। বেগম জিয়ার সঙ্গে একান্ত বৈঠকে বাংলাদেশের ২৫টি পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্কহীন প্রবেশের অনুমতিদানের বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে জানিয়েছিলেন বাজপেয়ী। এই সম্মেলনে ভারত উপ আঞ্চলিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দিলেও পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা এর বিরোধী। ভারত-বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটানকে নিয়ে গড়ে ওঠে 'Growth Quadrangle' বা 'উন্নয়ণমুখী চতুষ্কোণ'। তা যাতে ভবিষ্যতে মন্ত্রীপর্যায়ে বৈঠকে মিলিত হতে পারে তার জন্য প্রস্তাব রেখেছিলেন বাজপেয়ী। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান মনে করে যে এই ধরনের উপ আঞ্চলিক ব্যবস্থা সার্কের ভবিষ্যৎ সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। ড. রাধারমন চক্রবর্তী বলেছিলেন যে, এই ধরনের আশঙ্কা মূলত কূটনৈতিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের থেকেই জাত।[১১]

এই সম্মেলনে নেপালী কূটনীতিবিদ মন্তব্য করেন যে, চীন যেহেতু সার্কের দেশগুলির সীমান্তে অবস্থিত তাই সার্কের সদস্যপদ দাবী করায় অধিকার তার আছে। এছাড়া মায়ানমারকেও অন্তর্ভুক্ত

করার কথা ভাবা যেতে পারে। বস্তুত যে দেশ বা দেশগুলি চীনকে সার্কের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সম্ভবত ভারতের বিশাল উপস্থিতির Counter balance তৈরীর কথা ভাবছে। এছাড়াও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডকে নিয়ে একটি উপ আঞ্চলিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ১৯৯৭ সালে যা BIMSTEC বলে পরিচিত। লক্ষণীয় আশিয়ান (ASEAN)ভুক্ত দুটি দেশ এই ব্যবস্থায় যুক্ত। এই সম্মেলনে আরো বলা হয় 'আদর্শগত', রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অথবা অন্য কোন কারণে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করা যাবে না। ঘোষণাপত্রে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে কোন পার্থক্য টানা হয়নি। এটি ছিল নিঃসন্দেহে ভারতের একটি কূটনৈতিক জয়। তাই একথা বলা যায় যে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগীতার সূত্র ধরে সার্কের আবির্ভাব হলেও দক্ষিণ এশিয়ার জটিল রাজনৈতিক বাতাবরণ তাকে কোনদিনই সুস্থ ও সংহত হতে দেয়নি। বস্তুত, দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতির মধ্যেই একটি গভীর ভারসাম্যহীনতা আছে। অতীতের অখণ্ড ভারত হচ্ছে আজকের দক্ষিণ এশিয়া। এই অঞ্চলটিতে ভারতের বিশাল উপস্থিতি একদিকে যেমন ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃত্বের দাবীদার করেছে; তেমনি অন্যদিকে অঞ্চলটির ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি সেই স্বাভাবিক নেতৃত্বকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। ভারতের স্বাভাবিক কর্তৃত্বের মধ্যে তারা সর্বদাই প্রভুত্বের ছায়া দেখেছে। যাকে এককথায় বলা যায়— There is widespread recognition in South Asia that India is the Primary external threat to security.[১২] রাধারমণ চক্রবর্তী তাই বলেছিলেন যে, সংযুক্তির চেয়ে বিযুক্তিই সার্ক সংগঠনের সদস্যদের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য।[১৩]

দক্ষিণ এশিয়ার হিংসার রাজনীতি এই অঞ্চলের উন্নয়ন ও বিকাশের পথে বাধার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কোথাও ধর্ম, কোথাও জাতিসত্ত্বা (ethnic identity) বিভেদ ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে সক্রিয় জঙ্গীরা বাংলাদেশ, ভুটানে আশ্রয় নিচ্ছে। আলফা ও কামতাপুরী সন্ত্রাসবাদীরা প্রশিক্ষণ নিয়েছে ও নিচ্ছে ডুয়ার্স সংলগ্ন ভুটানের দুর্ভেদ্য অঞ্চল ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে। পাকিস্তানের নিরবচ্ছিন্ন আশ্রয়ে ও মদতে পরিপুষ্ট জঙ্গী গোষ্ঠীগুলি বর্তমানে আই.এস.আইয়ের সাহায্যে বাংলাদেশে ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে এরা ভারতে অনুপ্রবেশ করে ছড়িয়ে পড়ছে দেশের চতুর্দিকে। জামাত ও আইএসের বাড়বাড়ন্ত ভারতের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন করে তুলেছে। যা বাংলাদেশ থেকেই পরিচালিত হচ্ছে। ফলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাসবাদ এক স্বতন্ত্র রূপ নিয়েছে।

অর্থনৈতিক সহযোগিতার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সার্কের সদস্য

রাষ্ট্রগুলি এখনও পরস্পরের প্রতিযোগী। সার্কের দেশগুলির পারস্পরিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় অকিঞ্চিৎকর। এই বাণিজ্যের একটা বড়ো অংশ অবৈধ। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাচালানের বাড়বাড়ন্ত সর্বজনবিদিত। এ প্রসঙ্গে বলা যায়— In this direction, exchange of defence related persons and military dialogue, agreement on resumption of border trade, keeping peace along the borders and line of actual control, MOU on banking cooperation, and consensus on illegal trafficking of narcotics, drugs, crimes, maritime transport, economics and technology remained very siginficant.[১৪] তবে পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, সার্কের দেশগুলির নিজেদের মধ্যে রপ্তানির পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ৪.৩% এবং ১৯৯৫ সাল থেকে SAPTAর অধীনে কিছু ছাড় দেওয়ার পরেও এদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় মোট আমদানির পরিমাণ মাত্র ৪%। এর প্রধান কারণ সার্কের দেশগুলির সঙ্গে পশ্চিমী দুনিয়ার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ এশিয়া কিন্তু আজও পৃথিবীর দারিদ্রতম অঞ্চলগুলির অন্যতম। বিশ্বায়নের ফলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির উন্নয়নের কোন গতি সঞ্চারিত হয়নি। বলাবাহুল্য এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সার্কের মাধ্যমে সহযোগিতার সম্প্রসারণ। ড. জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধ্যানধারণাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হওয়ায় তা সার্কের সাফল্যকে ব্যাহত করেছে। প্রকৃতপক্ষে, দক্ষিণ এশিয়ার সংহতির অনুকূল পরিমণ্ডল এখনো তৈরি হয়নি। যা ভারত ও বাংলাদেশ সম্পর্ককে ও প্রভাবিত করে।

২০০৪ সালে সার্কের একদশতম শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয় পাকিস্তানের ইসলামাবাদে। এই বৈঠকের পটভূমি মোটামুটি তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও আভ্যন্তরীণ। আন্তর্জাতিক স্তরে সাদ্দাম হোসেনকে বন্দী করে ইরাকের পরিস্থিতিকে মার্কিন নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা সহ যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানে পুতুল সরকারের প্রতিষ্ঠা অন্যদিকে ইরান, উত্তর কোরিয়ার মত দেশগুলি পরমাণু অস্ত্রের প্রশ্নে আপসমুখী মনোভাব। সব মিলিয়ে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসমুখী ও স্থিতিশীল সম্পর্ক রেখে আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রবাহ। আঞ্চলিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়াতে পাকিস্তানের কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রসারের লক্ষ্য, যা ভারত-পাক সম্পর্ককে বিরোধপূর্ণ করে তোলে। অন্যদিকে ভূটানের সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ভূটানে ঘাঁটি গেড়ে থাকা উত্তরপূর্বের জঙ্গীদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ দক্ষিণ এশিয়ায় সুপ্রতিবেশীমূলক মনোভাবকে তুলে ধরেছিল। যা পাকিস্তানের কাছে অস্বস্তির কারণ ছিল। আর আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দ্বৈরথ দক্ষিণ এশিয়াকে

উত্তপ্ত করে তুলেছিল। ইরাকে মার্কিন দখলদারী ও মুশারফের মার্কিনী তোষণ-নীতি মুশারফকে দুবার আত্মঘাতী আক্রমণের সম্মুখীন করে তুলছিল। সন্ত্রাসবাদ দমন, পরমাণু অস্ত্রের সম্প্রসারণ রোধ ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এই তিনটি ক্ষেত্রেই মুশারফ ব্যর্থ বলে প্রতিপন্ন হয়। এবং এটা প্রমাণিত হয় যে ইরান, উত্তর কোরিয়া ও লিবিয়ার পরমাণু অস্ত্র সম্প্রসারণে পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে। তাই মুশারফের একদিকে মার্কিনী চাপ অন্যদিকে মৌলবাদী ফতোয়া পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে অস্থির করে তুলেছিল।

এইরকম একটি পরিস্থিতিতে সার্কের ইসলামাবাদ বৈঠকের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি রচনায় সহায়তা করেছিল ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের বন্ধন স্থাপনের ঐকান্তিক ইচ্ছা। ঐসময় বেশ কিছুদিন ধরেই দুই দেশের জনসমাজের মধ্যে ভাব বিনিময় শুরু হয়। সীমান্ত পেরিয়েছিলেন দুটি দেশের সাংসদরা, ছাত্রছাত্রীরা ও অন্যান্য বিদগ্ধজনেরা। ভারতে পাক শিশুকন্যার চিকিৎসা, ভারতের জেলে বন্দী হয়ে থাকা জনৈক পাক রমণীর সন্তানসহ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, দুই পারের বিবাহ বন্ধন এসবই দুই দেশের জনমানসে গভীর প্রত্যাশা ও আবেগের সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং বলা যায় যে “Track-II diplomacy” সার্কের ইসলামবাদ বৈঠকের পথকে অনেকটাই মসৃন করে তুলেছিল।[১৫]

এই বৈঠকে সার্কের সনদের নিয়ম মেনে সাতটি সদস্যরাষ্ট্রের বিদেশমন্ত্রীর ঘরোয়া আলাপ আলোচনায় মিলিত হয়ে ‘সাফটা’, সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত প্রস্তাব ও সামাজিক সনদ বিষয়গুলিতে ঐকমত্যে পৌঁছান। এই বৈঠকে ভারতের বিদেশমন্ত্রী যশবন্ত সিন্হা ২০১৫ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক সংঘ (South Asia Economic Union) গড়ে তোলার সাহসী প্রস্তাব রেখেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন সার্কের রাষ্ট্রগুলির অর্থমন্ত্রীগণ ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির গভর্ণরগণ একযোগে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য একটি অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলনের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারেন। এছাড়া আরো বলেন দক্ষিণ এশিয়াকে ক্ষুধা থেকে মুক্তির জন্য একটি Common food Bank গড়ে তোলা প্রয়োজন। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাজপেয়ী ভারতের পক্ষ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার জন্য ১০০ মিলিয়ান ডলারের একটি উন্নয়ন তহবিল গঠনের কথা বলেন যার উদ্দেশ্য ভারতের বাইরে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত বিশেষ প্রকল্পগুলিতে অর্থ সাহায্য করা।

পাক প্রধানমন্ত্রী ও সার্কের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান বাংলাদেশের মির জাফরুল্লা খান জামালি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন কীভাবে রাজনৈতিক বিবাদ দীর্ঘকাল ধরে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক

সহযোগিতাকে বিনষ্ট করেছে। এছাড়া বিদ্যুৎ ও শক্তিক্ষেত্রে সহযোগিতাকে ত্বরান্বিত করতে 'South Asian Energy Ring' গঠনের প্রস্তাব দেন। শ্রীলঙ্কা মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল গঠনের জন্য ভারতের প্রশংসা করে। জঙ্গী দমনের প্রশ্নে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সরাসরি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে ভূটানের ন্যায় উদ্যোগী হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বস্তুতঃ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বহুদিন থেকেই উত্তর পূর্ব ভারতের জঙ্গী নেতারা ঘাঁটি গেড়েছেন। এমনকী আলফার কিছু নেতা ঢাকার আশ্রয়ে রয়েছে। এপ্রসঙ্গে খালেদা জিয়া তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করে বলেন যে ঢাকা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জঙ্গীদের আশ্রয় দেবেনা, এবং বাংলাদেশের ভুখন্ডকে কোন জঙ্গী আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে দেবে না। তিনি বাংলাদেশে জঙ্গীদের আশ্রয়ের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। বলাবাহুল্য, জঙ্গী দমনের প্রশ্নে খালেদা জিয়ার অবস্থান স্ববিরোধী ও অসংগতিপূর্ণ।

ইসলামাবাদে সার্কের শীর্ষ সম্মেলনে সাত দেশের রাষ্ট্রনেতারা এক ঐতিহাসিক চুক্তিতে সই করেছিলেন। চুক্তির নাম : 'South Asian Free Trade Area framwork Agreement'। এই চুক্তি অনুসারে ২০০৬ সালের ১লা জানুয়ারী এই সাতটি দেশ মিলে তৈরী হবে একটি 'দক্ষিণ এশিয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল' বা SAFTA।[১৬] যার মূল উদ্দেশ্য ছিল 'Strengthen Collective Sefl-relience and to accelerate development through regional cooperation.[১৭] এই 'সাফটা'র ফলে সাতটি দেশের পারস্পরিক বাণিজ্য উদার হবে। একে অন্যের পণ্য আমদানির ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেবে, আমদানি শুল্ক কমাবে, তাছাড়াও অর্থনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে একে অন্যকে নানা ধরনের বিশেষ সুবিধা দেবে। এই সময়ের মধ্যে সার্কের সব চাইতে অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস পাবে ৩০ শতাংশ ও অন্যান্য দেশগুলির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ। পরবর্তী পাঁচ বছরে সার্কের তুলনামূলকভাবে উন্নত দেশগুলিতে শুল্কের হার হ্রাস পাবে ০-৫ শতাংশ। একেবারে অনুন্নত দেশগুলিকে সময় দেওয়া হবে আটবছর। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ এশিয়াকে একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার প্রশ্নে পাকিস্তান প্রথম থেকেই অনমনীয় মনোভাব পোষণ করে। কারণ পাকিস্তান 'সাফটা'কে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের সঙ্গে যুক্ত করে দেখার নীতি গ্রহণ করে চলেছিল। এর বিপরীতে, ভারত দক্ষিণ এশিয়াকে একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল হিসাবে গড়ে তোলার বিষয়ে প্রথম থেকেই আগ্রহী ছিল। কারণ ভারত মনে করে ঠাণ্ডাযুদ্ধোত্তর যুগে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল যেভাবে অতিজাতিক স্তরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দ্রুত অর্থনৈতিক উনয়নের পথে এগিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে 'সার্ক'কে অর্থনৈতিক সংহতির পথে এগোতে হবে। অথচ তখন সার্কের দেশগুলির নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ তাদের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের মাত্র ৫ শতাংশ, NAFTA (North

Atlantic free trade Area)র ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ৫১% এবং EU বা European Unionএর ক্ষেত্রে ৬৩%। এছাড়া ২০০২-০৩ সালে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল ২১%। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য সহযোগী দেশ। কারণ ২০০২-০৩ সালে ভারতের মোট রপ্তানীর ৪২% ঘটেছে বাংলাদেশে। ঐ বছরে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আমদানির পরিমাণও সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া থেকে মোট আমদানির মাত্র ১১%।[১৮] তাই প্রাথমিক পর্বে মুক্ত বাণিজ্য প্রসঙ্গে বাংলাদেশের নেতিবাচক মনোভাব থাকলেও পরে SAFTAর প্রয়োজনীয়তা ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য সহযোগিতাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছিল।

এই সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে বলা হয়েছে যে, সন্ত্রাসবাদের যে কোন স্বরূপ বা ধাঁচই ভয়াবহ এবং কোন যুক্তিতেই তাকে সমর্থন করা যায় না। সন্ত্রাসবাদীরা রাষ্ট্রসংঘের মৌলিক নীতিকেই লঙ্ঘন করে চলেছে। দক্ষিণ এশিয়ার সামনে আজ সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ হল সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা। অন্যদিকে সার্কের নেতৃবৃন্দ ১০ দফা কর্মসূচী সম্বলিত সামাজিক সনদে স্বাক্ষর করেন। এই সনদে দারিদ্র দূরীকরণ, নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি ও জনসংখ্যা হ্রাসের মতো চিরাচরিত ও বহু চর্চিত বিষয়গুলি ছাড়াও বুনিয়াদী শিক্ষা, আবাসন ও নিরাপদ পাণীয় জল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, তীব্র লিঙ্গ বৈষম্য ও লিঙ্গভিত্তিক হিংস্রতা দূর করা, মহিলা ও শিশুদের অপুষ্টি ও রক্তাল্পতাজনিত সমস্যা, প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুরোধ প্রভৃতি বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে UNO-এর জনসংখ্যা সংক্রান্ত তহবিলের অন্যতম প্রবীণ সদস্য বাংলাদেশী নাগরিক ওয়াসিম জামান বলেন— প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও শিল্পায়ন দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে দারিদ্র্য, লিঙ্গবৈষম্য, শহর-গ্রামের অসাম্য, জনসংখ্যার চাপ হ্রাস করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরো বলেন দক্ষিণ এশিয়া বর্তমানে সব চাইতে লিঙ্গ উদাসীন অঞ্চল। ক্রমাগত কন্যাভ্রূণ হত্যা ও শিশুকন্যা নিখোঁজের সংখ্যা আনুমানিক ৬০ মিলিয়ান। শিক্ষার ক্ষেত্রেও দক্ষিণ এশিয়ায় মহিলারা অনেক পিছিয়ে আছেন পুরুষদের চাইতে।[১৯] যা ভারত ও বাংলাদেশের Common Problem বলা যায়। তাই উভয়দেশই সার্কের মঞ্চকে ব্যবহার করে এর থেকে সমাধানের উপায় অন্বেষণ করতে তৎপর হয়।

২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে সার্কের ত্রয়োদশতম শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রাকৃতিক তান্ডবে বিধ্বংসী সুনামি, প্রতিবেশী নেপালে রাজাকে গদিচ্যুত করা ও তারফলে চূড়ান্ত অস্থিরতা এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দ্রুত অবনতিতে সার্ক শীর্ষ বৈঠক দুবার স্থগিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এছাড়া, দক্ষিণ এশিয়ার ৭০ শতাংশ ভূখণ্ড জুড়েই ভারতের বিশাল উপস্থিতি, তার বিপুল

জনসংখ্যা ও বিরাট বাজার এমন এক ইতিহাস নির্দিষ্ট ভারসাম্যহীনতার জন্ম দিয়েছে, যা কোনদিনই তার নিকট প্রতিবেশী দেশগুলিকে স্বস্তি দিতে পারেনি। ভারতের ছোট ছোট প্রতিবেশী দেশগুলির এই "anxiety Syndrome' বহুক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট ভারত-বিরোধীতার পথে এগিয়েছে। অন্যদিকে আঞ্চলিক বৃহৎশক্তি হিসেবে ভারত দক্ষিণ এশিয়াকে তার স্বাভাবিক প্রভাব বলয় বলেই মনে করেছে। ভারত মনে করেছে "South Asia is India's business"। দক্ষিণ এশিয়ায় বৃহৎশক্তির হস্তক্ষেপকেও ভারত অবাঞ্ছিত মনে করেছে। এই নীতিকে অনেকে ভারতের 'Manroe Doctrine' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে, বিশেষত সেই সমস্ত দেশগুলির ক্ষেত্রে যারা ভারতের আঞ্চলিক বৃহৎশক্তির মর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম নয়। তবে জওহরলাল নেহরু বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক M.S.Rajan এই ধারণাকে পুরোপুরি মেনে নেননি। তিনি বলেছেন— "India is not at all opposed to its neighbours getting economic/ technical, not military assistance from the external powers as India itself as been offering to some of the smalles states."[২০] তাই একথা বলা যায় যে অতীতের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক বন্ধন সত্ত্বেও আঞ্চলিক সংহতির দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়া সব চাইতে পশ্চাদপদ।

ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনের আগে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক চূড়ান্ত তিক্ততার পর্যায়ে গিয়েছিল— বেআইনী অনুপ্রবেশ, বাংলাদেশ রাইফেলস্‌্রে জঙ্গীয়ানা, বাংলাদেশের ভেতরে সক্রিয় মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত, ভারতের উত্তরপূর্বের জঙ্গী নেতাদের বাংলাদেশে নিরাপদ আশ্রয়দান, তিস্তা ও অন্যান্য নদীর জলবন্টন সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে নিয়ে জাতিপুঞ্জের মহাসচিব কোফি আন্নান এই সমস্যাগুলিকে "Problem Without Passport" বলে উল্লেখ করেছেন।[২১]

সার্ক এর ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও মুক্ত বাণিজ্য, সন্ত্রাস দমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং জ্বালানী সুরক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই সম্মেলনে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরতে 'আশিয়ান' এর প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরা হয়। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বাধবিঘ্নকে অতিক্রম করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে জোটবদ্ধভাবে চলার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি— তাকে এককথায় 'ASEAN Way' বলা যেতে পারে। বস্তুত, আঞ্চলিক সংহতির ক্ষেত্রে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি রাজনীতির চাইতে অর্থনীতিকে গুরুত্ব দিলেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি রাজনীতিকে অর্থনীতির চাইতে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে V. Suryanarayan বলেছেন Unlike the cluster of bamboos which swing in unison, the political

elites of south Asia have become prisoners of their past and victims of domestic compulsions.[২২] এবং ঢাকায় সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাই বলেছেন দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যের পরিমাণ নগন্যই থেকে গেছে।

যাইহোক সার্কের ঘোষণাপত্রে যে বিষয়গুলি উঠে এসেছিল সেগুলি হলো— প্রথমতঃ কোন অবস্থাতেই সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করবেনা সার্কের দেশগুলি। সন্ত্রাস মোকাবিলায় কোন দ্বিচারিতা চলবে না। এই অঞ্চলের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতি ও সামাজিক উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে সার্ক দেশগুলি সন্ত্রাস দমনের প্রশ্নে তথ্য আদান প্রদান করবে।

দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ এশিয়ায় বড়ো দেশগুলি ছোট ছোট দেশগুলির নিরাপত্তার বিষয়টি জাতিপুঞ্জের সনদ মেনেই ব্যবস্থা করবে।

তৃতীয়তঃ দিল্লিতে 'বিপর্যয় মোকাবিলা কেন্দ্র' গঠনের ভারতীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চতুর্থতঃ, ২০০৫-২০১৫ এই দশ বছর 'দারিদ্র্য দূরীকরণ দশক' বলে পালিত হবে। আঞ্চলিক উন্নয়ন এর জন্য 'সার্ক উন্নয়ন তহবিল' গঠিত হবে।

পঞ্চমতঃ, ২০০৬ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে SAFTA চালু হবে। সাফটায় বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান ও মালদ্বীপকে স্বল্পোন্নত' দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও পাকিস্তান যেহেতু এগিয়ে সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক বাণিজ্যে শুল্কের হার ২০ শতাংশের মধ্যে আনতে হবে। এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে তা ২০০৮ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে শুল্কের হার ২০% থেকে ৫% এ আনতে হবে। সার্কের স্বল্পোন্নত দেশগুলি অর্থাৎ নেপাল, ভূটান, মালদ্বীপ ও বাংলাদেশ প্রথম পর্যায়ে ৩০% এর মধ্যে নিয়ে আসবে, দ্বিতীয় স্তরে আটবছরের মধ্যে ৫% এর নীচে নামিয়ে আনবে। 'সাফটা' চালু করার জন্য সার্ক-এর সদস্য দেশগুলি তাদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষ পণ্যকে চিহ্নিত করে একটি তালিকা প্রস্তুত করবে।

ষষ্ঠতঃ, আগামী শীর্ষ বৈঠকে অষ্টম সদস্য হিসাবে সার্কে আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্তির দাবী জানিয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান। অন্যদিকে চীনের অন্তর্ভুক্তির দাবী জানায় নেপাল ও বাংলাদেশ। 'সার্ক'-এর মধ্যে ভারতকে কোনঠাসা করা এবং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে Counter balance হিসাবে ভারতের বিরুদ্ধে চীনকে দাঁড় করানোই ছিল এই তৎপরতার মূল উদ্দেশ্য। এই সম্মেলনে চীনকে

সার্ক এর পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চীনের সঙ্গে 'পর্যবেক্ষক' হিসেবে জাপানের দাবীকে ঘোষণাপত্রে যুক্ত করে ভারত তার স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস চালিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারত যতই 'আসিয়ান' এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার পথে এগোচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তিকে কিছুটা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, চীনও তার পাল্টা চাল হিসেবে ভারতের স্বাভাবিক প্রভাব বলয় হিসেবে পরিচিত দক্ষিণ এশিয়ায় প্রবেশ করার প্রয়াস চালাচ্ছে।

'সাফটা'কে বাস্তবায়িত করার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতার অনীহা ও পরস্পর বিরোধী স্বার্থ। যেমন, বাংলাদেশ মৌলবাদী সন্ত্রাস দমন, অনুপ্রবেশ, মায়ানমার থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের পরিকল্পনা, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সড়কপথে যোগাযোগ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি পর্যাপ্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা না করলে ভারত ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দিতে উৎসুক হবে না। তাছাড়া বিশ্বায়নের যুগে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে যখন অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্য একাকী এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব, তখন পারস্পরিক ও আঞ্চলিক সহযেগিতা জোরদার করার যেকোন প্রচেষ্টাই লাভজনক। কাজেই সার্কের সাফল্যের মধ্যে নিহিত আছে এতে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের সাফল্য। বিশ্ব পরিস্থিতিতে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ যেভাবে বেড়েছে তাতে এধরনের সমস্যাসমূহের কোন একক সরকারের দমন করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানো দরকার। চোরাচালান, সীমান্ত বিরোধ, সন্ত্রাস, অস্ত্র চোরাচালান, জঙ্গীবাদ প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে একত্রে কাজ করতে পারলে এ ক্ষেত্রগুলোতে প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে ভারত ও বাংলাদেশের কথা বলা যেতে পারে। তাই সার্ক এ অঞ্চলের দেশগুলোর সাধারণ সমস্যা যেমন দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, চোরাচালান, জঙ্গীবাদ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণে এবং দেশগুলোর মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্কে উষ্ণতা সৃষ্টিতে ফলদায়ক ভূমিকা পালন করুক। সার্ক দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর সার্বিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখুক।

অনেক বিশেষজ্ঞ আরো উল্লেখ করেছেন যে, বর্তমান বাস্তবতায় এ অঞ্চলের জনগণের নিরাপত্তার অর্থ নিছক যৌথ বা পারস্পরিক সামরিক আত্মরক্ষা নয়। এরসঙ্গে জড়িত রয়েছে, প্রথমত, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রত্যেক জাতির জাতীয় পরিচিতির মর্যাদাময় সব সংরক্ষণ এবং দ্বিতীয়ত দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক সহযোগিতা এবং স্থিতিশীল শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যান।[২৩] সুতরাং ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় সুদূরপ্রসারী স্থিতিশীল কার্যক্রমের সূচনা করতে হবে যার ফলে সম্ভাব্য সকল বাধা ও প্রতিবন্ধকতাকে মোকাবিলা করে অর্থপূর্ণ

আঞ্চলিক সহযোগিতার পথে সার্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে সার্কের চতুর্দশ সম্মেলন শুরু হয় দিল্লিতে। সার্কের অষ্টম সদস্য হিসাবে আফগানিস্তান দিল্লি শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেয়। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া উপস্থিত ছিল পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসাবে। সার্ক প্রক্রিয়া থেকে রাশিয়ার বিযুক্তির কারণ এই যে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে রাশিয়া সার্ক এর মতো একটি দূর্বল আঞ্চলিক সংগঠনের চাইতে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (SCO) এর মতো একটি গতিশীল ও সম্ভাবনাময় আঞ্চলিক সংগঠনের মাধ্যমেই তার জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস চালাতে চাইছে। প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেলই রাশিয়ার ক্ষমতা প্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার; তাই কৌশলগত কারণেই মধ্য এশিয়াই এখন রাশিয়ার জ্বালানী কূটনীতির কেন্দ্রে অবস্থান করছে।

এই সময় নেপালে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে রাজা জ্ঞানেন্দ্রর ক্ষমতাচ্যুত হওয়া; শ্রীলঙ্কায় ভয়াবহ গৃহযুদ্ধসহ LTTE কর্তৃক বিমান ঘাটিতে বিমান আক্রমণ; বাংলাদেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার কোণঠাসা অবস্থা; পাক-আফগান সীমান্ত সন্ত্রাস সহ পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব ও মার্কিনী চাপ দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। এমতাবস্থায় সার্কের দিল্লি শীর্ষ বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে সার্ককে 'আরও গুরুত্বপূর্ণ' আঞ্চলিক সংস্থা হিসাবে গড়ে তোলার নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর ভাষণে প্রাধান্য পেয়েছিল বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সন্ত্রাস সংক্রান্ত বিষয়গুলি। দক্ষিণ এশিয়ার সব চাইতে শক্তিশালী দেশ হিসেবে ভারত তার 'পিছিয়ে থাকা' প্রতিবেশী দেশগুলিকে একতরফাভাবেই বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে প্রস্তুত। এজন্য ভারত অসম দায়িত্ব নেবে। রাখহরি চ্যাটার্জী ভারতের একতরফা সুবিধা দানের নীতিকে 'Passive good neighbourly relations' বলে বর্ণনা করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন— 'শুল্ক' ও 'ভিসা' এই দুটি ক্ষেত্রেই ভারত আগামীদিনে উদারনীতি মেনে চলবে। বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, নেপাল, ভূটান ও মালদ্বীপ— দক্ষিণ এশিয়ার এই চারটি দুর্বল দেশকে ভারত তার বাজারে শুল্কহীন পণ্য রপ্তানীর সুযোগ দেবে। অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী, রোগী ও সাংবাদিকদের ভারতে আসার ক্ষেত্রে ভিসা ব্যবস্থাকে শিথিল করা হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির রাজধানীর মধ্যে সরাসরি বিমান যোগাযোগ গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন।[২৪]

বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ফকরুদ্দিন আহমেদ শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারত বিরোধী শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করে বলেন যে সন্ত্রাসের মূল কারণগুলিকে নির্মূল করার উপর নজর দিতে হবে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সৌকত অজিজ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রকৃত শান্তি ফিরিয়ে আনা ও সদস্য দেশগুলির পারস্পরিক আস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেন। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি মহেন্দ্র রাজাপক্ষ সার্ককে 'কর্মকেন্দ্রিক' (action oriented) আঞ্চলিক সংগঠন হিসাবে গড়ে তোলার কথা সহ দক্ষিণ এশিয়ায় 'অভিন্ন মুদ্রা' চালু করার সাহসী ও আশাবাদী প্রস্তাব রাখেন। আফগান রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাই সন্ত্রাস দমন সহ তুর্কমেনিস্তান আফাগানিস্তান-পাকিস্তান- ভারত (TAPI) গ্যাস পাইপ লাইন সংক্রান্ত প্রকল্পটির উল্লেখ করেন।

সার্কের দিল্লী শীর্ষ বৈঠকে দক্ষিণ এশিয়াকে পরস্পর সংযুক্ত ও পরস্পর নির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তিত দক্ষিণ এশিয়ার ভিত্তি হবে পণ্য, পরিষেবা, ধ্যানধারণা ও জনগণের মুক্ত প্রবাহ। এক্ষেত্রে 'partnership with Prosperity' গড়ে তোলার কথা বলা হয়। সার্কের সমস্ত দেশ জল, খাদ্য, জ্বালানী ও পরিবেশ— এই চারটি বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন। 'সার্ক খাদ্যভান্ডার' ও দক্ষিণ এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একে 'উৎকর্ষ কেন্দ্র' হিসাবে গড়ে তোলা হবে অঙ্গীকার করা হয়। এ প্রসঙ্গে ইমতিয়াজ আহমেদ বলেছেন— South Asian University Could be a good starting Point. I mooted the idea with a seniour colleague of mine some 14 years ago. This would surely provided an environrnment for post-national discourses free from the constraints of the reason of the state.[২৫] তাছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নের জন্য দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন তহবিলকে ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া দিল্লি ঘোষণায় আঞ্চলিক সংযোগ রক্ষার জন্য SAARC Car Rallyর কথা বলা হয়। আফগানিস্তান থেকে মালদ্বীপ পর্যন্ত দ্রুত পরিবহন কাঠামো উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে যার ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাকৃতিক গ্যাস ও তৈল সমৃদ্ধ মধ্যএশিয়ায় সংযোগ স্থাপিত হয়। ভারত ইতিমধ্যে নেপাল ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি বা FTA স্বাক্ষর করেছে। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশের বাণিজ্যমহল দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিগুলিকে সমর্থন করেছে। বাংলাদেশের Centre for Policy Dialogue এর অধিকর্তা মুস্তাফিজুর রহমান মন্তব্য করেছিলেন—

'Any bilateral FTA should be SAFTA plus when a regional agreement should be WTO Plus.'[২৬]

আরো এই সম্মেলনে বলা হয় ২০০৮ সালটি হলো 'SAARC year of Good Governance' হিসাবে নির্ধারিত করা হয়েছে এবং ইরানকে 'পর্যবেক্ষক' রাষ্ট্রের মর্যাদাদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গ্রামের উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দেশজ পদ্ধতিতে জনগণের জীবনযাত্রার পরিবর্তন করার জন্য সার্কভুক্ত প্রতিটি দেশ কোন একটি গ্রামকে 'SAARC Village' হিসাবে গড়ে তুলবে।

অন্যদিকে সন্ত্রাসের তিনটি রূপ-যথা বিপ্লবী (মাওবাদী), মৌলবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী। এই তিনধরনের সন্ত্রাসবাদী ও জঙ্গীগোষ্ঠীগুলি পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমেই পরিপুষ্ট হয়েছে; অথচ এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে বৈধ জন চলাচল যথেষ্ট সীমিত থেকে গেছে। বস্তুত, সন্ত্রাস দমনে সার্ক কতদূর সফল হবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, এখানে কাজ করছে অবিশ্বাস ও অনিচ্ছা এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আরও সমস্যায় ঠেলে দেওয়ার ধূর্ত কূটনীতি। এছাড়া, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হলে সন্ত্রাসকে ফৌজি কায়দায় দমন করা সম্ভব নয়।

দিল্লী শীর্ষ সম্মেলনে পর্যবেক্ষক হিসেবে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে দুর্বল আঞ্চলিক সংগঠনটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। বিশ্লেষকগণ মনে করেছেন যে, এশিয়ার শক্তিশালী দেশগুলিকে এবং অঞ্চল বহির্ভূত শক্তিগুলিকে সার্কের ছাতার তলায় আনা সম্ভব হয়েছে। এরফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। তবে অতীতে জাপান সার্ককে অর্থনৈতিক সাহায্য দিলেও পারস্পরিক দ্বন্দ্বের জন্য সেই অর্থকে সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। সার্ক জাপান বিশেষ অর্থভান্ডারে বছরে ৫০,০০০ মিলিয়ন ডলার অর্থ দিয়ে জাপান এই অতীত উদ্যোগকে পুনরায় কার্যকরী করতে চেয়েছিল। দিল্লি সম্মেলনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এসেছে চীনের কাছ থেকেও। উল্লেখ্য, ঋণদান বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রভাব বৃদ্ধির নীতি চীন যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গেই অনুসরণ করেছে। চীন আফ্রিকার দূর্বল ও পশ্চাদপদ দেশগুলিকে শর্তহীন ঋণদান করে তার প্রভাবে রাখার চেষ্টা করছে। সুতরাং ভবিষ্যতে চীন সার্কের সদস্যপদ লাভ করলে তা ভারতের স্বার্থের পুরোপুরি অনুকূলে যাবে না। এ ব্যাপারে নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ যথেষ্ট সরব ছিল। কিন্তু এই অন্তর্ভুক্তির ফলে দক্ষিণ এশিয়া, যাকে ভারত তার নিজস্ব প্রভাব বলয় মনে করে, সেখানে ভারত-চীন কৌশলগত স্বার্থের সংঘাত দেখা দিতে পারে। তাই ভারতকে সচেতনভাবে এগোনোই শ্রেয়।

২০০৮ সালে সার্কের পঞ্চদশ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে। অস্ট্রেলিয়া ও

মায়ানমারকে পর্যবেক্ষকরূপে সংযুক্ত করে দাঁড়ায় ১০ এবং আগামী তিন বছর আর কোন রাষ্ট্রকে নতুন করে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা দেওয়া হবে না এটা ঠিক হয়।

এই সম্মেলনে স্থির হয় যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সমষ্টিগত এবং দৃঢ়ভাবে সংগ্রামের জন্য একটি আঞ্চলিক আইনগত কাঠামো (Regional legal Framework) গঠন করতে হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ এবং আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাই বলেন যে, এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে সব চাইতে মারাত্মক আঘাত তৈরি করেছে সন্ত্রাসবাদ। এছাড়া যে বিষয়গুলি আলোচিত হয় সেগুলি হল হিমালয়ের বাস্তুতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্তন; এবিষয়ে কলম্বো ঘোষণায় বলা হয়— "Climate justice: The Human Dimension of Climate Change" to come up with a rights based approach that would highlight the human impact when responding to the impacts of Climate Change.[২৭] এছাড়া উপকূলস্থ অঞ্চলগুলির সুরক্ষা, তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং সংকটকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য SAARC Disastor Management Centre গঠন ইত্যাদি। ঐ সময় কাবুলে ভারতীয় দূতাবাস আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়, তেমনি ভারতের মাটিতে জয়পুর, ব্যাঙ্গালোর এবং আমেদাবাদে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ এই ভয়াবহ ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানায়। এমনকী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানী কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসের ওপর আক্রমণের নিন্দা করেন।

কলম্বোয় অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ সম্মেলনে ৮ সদস্যরাষ্ট্রের স্বাক্ষরিত ঘোষাণাপত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসবাদ এবং অন্যান্য সংগঠিত অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের মোকাবিলায় আন্তঃদেশীয় সহযোগিতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া এশিয়ার জলসম্পদ, বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের জন্য জাতীয় গ্রিডগুলির সংযুক্তিকরণ এবং গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই সম্মেলনের অভিনব রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হলো নেপাল ও ভূটান উভয়েই রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ ঘটায়।

এরপর ২০১০ সালে ভূটানের থিম্পুতে সার্কের ষোড়শ শীর্ষ সম্মেলন আয়োজিত হয় এপ্রিল মাসে। সার্ক সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ বৈঠকের দুদিন আগে দিল্লিতে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ। আফগানিস্তানের শান্তি ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় নয়াদিল্লি যে স্থায়ী উপস্থিতি বজায় রাখতে চায় তা ভারতের প্রধানমন্ত্রী তুলে ধরেন। এবিষয়ে কারজাই বলেন— আল কায়দা বা অন্য জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত নয় এমন

তালিবানদের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করতে তারা উৎসাহী। প্রকৃতপক্ষে ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কাবুলে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ৯ জন ভারতীয় প্রাণ হারানোর পর এই প্রথম পর্যায়ের দুই দেশের বৈঠক। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, নয়া আফগান ও পাক নীতি দিল্লির উদ্বেগ ক্রমশ বাড়িয়ে তুলেছিল এবং আফগানিস্তানে আল কায়দা ও তালিবানদের দমন করার ক্ষেত্রে আমেরিকা পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানও আমেরিকার উপর চাপ দিচ্ছিল যাতে আফগানিস্তানের পুনর্গঠনে ভারতের ভূমিকা খর্ব করা যায়। তাই কারজাইয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর মনমোহন সিং বলেন— ‘‘কোন চাপের কাছে ভারত মাথা নত করবে না। আফগানিস্তানের উন্নয়ন এবং পুনর্গঠনের কাজে সে দেশের সরকার এবং মানুষকে সহায়তা করতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজ সে কথা কারজাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।[২৮]

এরপর সার্কের বক্তৃতা মঞ্চে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন— ‘‘যে কোন ধরনের সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় চরমপন্থা, জঙ্গীপনা ও সংগঠিত অপরাধের বিরোধীতা করে বাংলাদেশ সরকার। যারা ইসলামের নামে হিংসা ছড়ায় তাদের কোন দাবীই আমরা মেনে নেব না।’’[২৯] পাশাপাশি তিনি আরো স্পষ্ট ভাষায় জানান যে, বাংলাদেশের মাটিকে ব্যবহার করে অন্যত্র সন্ত্রাস ছড়াতে দেবে না তাঁর সরকার। হাসিনার এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে বাড়তি স্বস্তি দিয়েছিল ভারতকে।

থিম্পুতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে মনমোহন ও হাসিনা ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলিতে বৈঠক করেন। হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইসলামী জঙ্গীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চালানো হচ্ছিল। উত্তর পূর্ব ভারতের জঙ্গীঘাটিগুলি উচ্ছেদের জন্য অভিযান হয়েছে। ঢাকার সহযোগিতায় কয়েকজন কট্টরপন্থী জঙ্গী ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে এসেছে। সীমান্তে যৌথ নজরদারীর ফলে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। দুদেশের কূটনৈতিক যোগাযোগ ও এখন আগের চেয়ে অনেকটা মসৃণ হয়েছে। হাসিনার সঙ্গে আলোচনায় এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন মনমোহন সিংহ। তিনি জানান, বর্তমান পরিস্থিতিকে দীর্ঘমেয়াদী করাটাই এখন আসল চ্যালেঞ্জ। মনমোহনকে আস্বস্ত করে হাসিনা বলেছিলেন সন্ত্রাস এবং আন্তঃসীমান্ত নিরাপত্তার প্রশ্নে তিনি ভারতকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁর সরকার তা পালন করবে। মনমোহন সিং হাসিনার দাবী মেনে অন্তবর্তী তিস্তা চুক্তির বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার আশ্বাস দেন। তিনি বাংলাদেশ নেতৃত্বকে জানিয়েছিলেন যে, খুব শীঘ্রই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পরিকাঠামো উন্নয়নেরকাজ শুরু হবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থ গত মাসেই মঞ্জুর করা হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্তে বেড়া দেওয়ার বিষয়টিও

যাতে ত্বরান্বিত হয়, সে ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে দুপক্ষই। বৈঠকের পর ভারতের বিদেশসচীব নিরুপমা রাও বলেন ‘‘বাংলাদেশ নেতৃত্বের মতে শেখ হাসিনার সফল সফর শুধু দুটি দেশ বা দক্ষিণ এশিয়ার কাছেই নয়, গোটা বিশ্বের কাছে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যেসব দ্বি-পাক্ষিক প্রকল্পের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, খুশির কথা তার অনেকগুলি কাজই শুরু হওয়ার মুখে।’’[৩০]

সার্কের মঞ্চে দাঁড়িয়েই ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেছিলেন, ‘‘সন্ত্রাসবাদ এবং মৌলবাদ পরিত্যাগ করা আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। পারস্পরিক সন্মান এবং সহনশীলতাও নইলে দক্ষিণ এশিয়া এগোবে না।’’[৩১] তারপর একই মঞ্চ থেকে পাক প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানীর পাল্টা কটাক্ষ, আলাদা কোনও দেশ নয়, দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশই কমবেশী সন্ত্রাসবাদের শিকার। সুতরাং সবাইকে হাত মিলিয়েই এগোতে হবে। সেই সঙ্গে তাঁর আহ্বান, পারস্পরিক বিরোধের ফলে সার্কের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। তাই ভবিষ্যৎকে ইতিহাসের কাছে পণবন্দি হতে দেওয়া চলবে না।

প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ এশিয়ার এই মঞ্চকে কাজে লাগিয়ে ভারতকে সুসংহত আলোচনায় ফেরানোর জন্য চাপ তৈরি করতে মরিয়া ছিল ইসলামাবাদ। পাশাপাশি মুম্বাই হামলায় অভিযুক্ত আজমল কাসভকে ফেরত পাওয়ার জন্যও ভারতীয় নেতৃত্বের উপর চাপ তৈরি করা। ভারতীয় শিবির থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, ভারত বিরোধী সন্ত্রাস এবং পাকিস্তানের মাটিতে জঙ্গী পরিকাঠামো ধ্বংস করার প্রশ্নে জারদারি সরকারকে বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপ করতে হবে। মুম্বাই হামলায় অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। নইলে সুসংহত আলোচনার প্রশ্ন নেই। এ প্রসঙ্গে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ নাসির প্রথা বহির্ভূতভাবে বলেন— ‘‘ভারত-পাকিস্তান দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার পরিবেশ ফিরে এলে তা গোটা অঞ্চলের জন্যই শুভ হবে। অসুখী সংসারে কোনও উন্নয়ন হয় না। আমরা দুদেশের দূর্দান্ত আলোচনা কামানা করছি।’’[৩২] এইভাবে সার্কের ষোড়শ সম্মেলন হয়ে উঠেছিল ভারত-পাক বিরোধের চাপের কূটনীতি।

থিম্পুতে সার্ক শীর্ষ বৈঠকে রাষ্ট্রনায়কগণ তাদের ঘোষণাপত্রে যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেন সেগুলি হলো— সার্কের ২৫ বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে দক্ষিণ এশিয়ার সমস্ত দেশগুলির ছাত্র, যুব, গণমাধ্যম, বেসরকারীক্ষেত্র, চিন্তাবিদ, পুরসমাজ বা নাগরিক সমাজের মধ্যে যোগাযোগের সম্প্রসারণ ঘটানোর সিদ্ধান্ত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সাংসদদের জন্য “Conclave of SAARC

Parliamentarians” গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সার্ক অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সকলে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপর জোর দেন। পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবিলায় ব্যবস্থা গ্রহণ পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার এর ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়। সার্ক অঞ্চলের নীতি নির্ধারক ও যুব নেতাদের নিয়ে সার্ক যুব সম্মেলন হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাফটাকে কার্যকর করতে যে সমস্ত শুল্ক সংক্রান্ত বাধা আছে তার অবসান ঘটানো; শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে ছাত্র আদানপ্রদান; ২০১০-২০২০ সালকে “Decade of intra-regional Connectivity in SAARC”[৩৩] ঘোষণা করা হয়। এছাড়া ঘোষণাপত্রে সন্ত্রাসবাদ দমন সহ অবৈধ অনুপ্রবেশ ও চোরাচালন রোধ, মাদক ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী দ্রব্যাদি এবং নারী ও শিশুপাচার রোধে সকল সার্কভুক্ত দেশকে পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়। সার্ক দেশগুলির মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ইসলামাবাদে SAARC Energy Centre (SEC) তৈরি করা হয় এবং এই বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এইভাবে সার্কের ষোড়শ সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

২০১১ সালের নভেম্বর মাসে মালদ্বীপের আদুতে ‘সার্কের’ ১৭তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পড়শি মুলুকের মন জয়ের লক্ষ্যে মনমোহন সিংহ মুক্তবাণিজ্য নীতির কথা বলেন এবং সার্কের মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করেন যে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির জন্য ভারতের বাজারের দরজা আরো বেশী করে খুলে দেওয়া হবে। একইসঙ্গে প্রস্তাব দেন সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ আরও নিবিড় করার। এছাড়া তিনি প্রস্তাব দেন যে ঐ অঞ্চলের স্থল, জল ও আকাশপথে পরিবহন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং উদ্ভাবনী ডাক পরিষেবার মাধ্যমে যোগাযোগ বাড়াতে হবে।

সার্ক মঞ্চে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন— তুলনায় বেশী অনুন্নত দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির জন্য ভারতের বাজার আরও উন্মুক্ত করার কথা ঘোষণা করতে গিয়ে তিনি শূন্য শুল্ক পণ্যের সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলেন। তিনি জানান, দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (SAFTA) এর সব থেকে অনুন্নত দেশগুলির জন্য এই পণ্যের সংখ্যা এক ধাক্কায় ৪৫৫টি বাড়াচ্ছে ভারত। যে কারণে শুধু তাদের জন্য ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে সংবেদনশীল বলে চিহ্নিত পণ্যের সংখ্যা ৪৮০ থেকে কমিয়ে আনা হচ্ছে ২৫ টিতে। সাধারণত নানা বিধিনিষেধ কিংবা চড়া শুল্কের কারণে এই সংবেদনশীল পণ্যগুলি ভারতের বাজারে রফতানি করা কঠিন হয়। কিন্তু এবার শূন্য শুল্ক পণ্য হিসেবেই তা রফতানি করতে পারবে বাংলাদেশ, ভূটান, নেপাল ও মালদ্বীপ।

দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের প্রধান আর্থিক শক্তি হিসেবে তার নেতৃত্বের 'ব্যাটন' যে ভারত নিজের হাতে রাখতে চায়, মনমোহনের বক্তৃতায় তা স্পষ্ট। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, ইউরোপের আর্থিক সঙ্কট আর মার্কিন অর্থনীতির বেহাল দশার জেরে ফের ঘোরালো সমস্যায় বিশ্বের অর্থনীতি। যার আঁচ পড়ছে এশিয়ার উপর। তাই এই পরিস্থিতিতে আর্থিক বৃদ্ধির গতি অব্যাহত রাখার একমাত্র উপায় বিশ্বায়নের শর্ত মেনে তীব্র প্রতিযোগিতায় যুঝতে শেখা। আরও বেশী করে নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়ানো। এবং অবশ্যই সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মানুষের মধ্যে আরও বেশী যোগাযোগ বৃদ্ধি। এর জন্য একগুচ্ছ প্রস্তাব পেশ করেন মনমোহন। তিনি বলেন দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক বিমান পরিষেবা নিয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে আগামী বছর সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির প্রতিনিধিদের জন্য বৈঠক আয়োজন করতে তৈরি ভারত। রেল ও সড়কপথে আঞ্চলিক পরিষেবা চালুর বিষয়েও একমত হওয়া জরুরী বলে মনে করেন তিনি। সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে চান জলপথেও। সামান্য হলেও যা আছে শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও ভারতের মধ্যে।[৩৪]

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে ডাক ও টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থাও ঢেলে সাজার পক্ষপাতী প্রধানমন্ত্রী। তাঁর প্রস্তাব, টেলি সংযোগ উন্নত করে কলরেট কমানো ও দক্ষিণ এশীয় ডাক ইউনিয়ন গঠন। যার জন্য অস্থায়ী দফতর তৈরী ও কর্মীদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ভারত। জোর দেন সিনেমা, রেডিও টিভির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান বাড়ানোর উপর। ঘোষণা করেন দক্ষিণ এশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করার। মনমোহনের দাবী, ঐতিহ্যের কারণে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলির বিপুল সম্ভাবনা পর্যটন শিল্পেও। যা তুলে ধরতে আলোচনাচক্র ও চলমান প্রদর্শনী আয়োজনে উদ্যোগী হবে ভারত।

মালদ্বীপের আদু শহরে সার্ক সম্মেলনের পাশাপাশি হাসিনার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তিস্তার জলচুক্তি নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে মনমোহন বলেন, চুক্তির বিষয়টি সবপক্ষের কাছে সন্তোষজনক হওয়া দরকার। শুধু তিস্তা নয়, আরও যে সব নদী দুদেশের মধ্যে বয়ে চলেছে, সেগুলির জল ভাগভাগি নিয়েও মনোমালিন্য কাটাতে হবে। ভারত তাই সকলের সঙ্গে কথা বলেই বিষয়টি সমাধান করতে চাইছে। মনমোহন হাসিনাকে আশ্বাস দেন, যত শীঘ্র সম্ভব তিস্তার জলচুক্তি করতে তিনি বদ্ধপরিকর। জলবন্টন ছাড়াও বাংলাদেশের আরো পণ্যকে শুল্ক ছাড়ের আওতায় নিয়ে আসা, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সহযোগিতা, ঋণ সাহায্য সহ নানা বিষয়ে কথা হয় দুজনের। ট্রানজিট নিয়েও ভারত-বাংলাদেশ দুপক্ষই খানিকটা এগিয়েছে।[৩৫]

এই সম্মেলনে সার্কভুক্ত দেশগুলির সহযোগিতা বৃদ্ধির অন্য ক্ষেত্রগুলিতেও নজর পড়েছিল। দারিদ্র্য দূরীকরণ, জ্বালানী, জলসম্পদ সংরক্ষণ, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার মতো বিষয়ে উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলির সহযোগীতা অঞ্চলের জনসাধারণের পক্ষে সুফলপ্রসূ হতে বাধ্য। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরস্পরের কাছ থেকে শিখবার বা সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন আছে। মানব উন্নয়নের এই প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলিতে উপমহাদেশের পশ্চাদপদতা রাষ্ট্রপুঞ্জ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে উদ্বিগ্ন করে। আবার একথা সত্য যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে পরস্পরের আস্থা অর্জন করলে বিরোধের তীব্রতা হ্রাস পায় এবং বিরোধ নিষ্পত্তির আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। মালদ্বীপ সম্মেলনের ঘোষণাপত্রটি তারই ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি।

এই সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে শুল্ক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কথা বলা হয়। এছাড়া মালদ্বীপের কুলহুধূফুসিতে ২০১২ সালে একটি সার্ক ভ্রমণ ও যোগাযোগ বিষয়ক মেলা হবে। বাংলাদেশ-ভারত-নেপাল- আঞ্চলিক রেল ও সড়ক যোগাযোগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারত মহাসাগরে পণ্যবাহী জাহাজ ও জলপরিবহন বিষয়ে কথা হয়। খাদ্য ব্যাঙ্ক তৈরি; নারী ও শিশু পাচার ও তাদের দেহব্যবসার কাজে লাগানোকে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে বন্ধ করতে হবে; শৌচাগার ও পানীয় জলের উপরগুরুত্ব প্রদান করতে হবে; দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নের জন্য SAF (South Asia Forum)এর মাধ্যমে “Vision Statement”কে রূপায়িত করতে হবে।[৩৬] সর্বোপরি সার্ক মিডিয়া ডে চিহ্নিত করে দক্ষিণ এশিয়ার সহযোগিতার বাতাবরণকে প্রচার করতে হবে। এই ছিল আড্ডু শীর্ষ বৈঠকের সফল ফসল।

২০১৪ সালের ২৬-২৭শে নভেম্বর নেপালের কাঠমাণ্ডুতে সার্কের অষ্টাদশ শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অতি সম্প্রতি এই বৈঠকের শুরু থেকেই ছিল টানটান উত্তেজনা। সার্কভুক্ত দেশগুলির প্রধানরা তাকিয়েছিলেন মোদী-শরিফ দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের দিকে। প্রাথমিকপর্বে ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এবং পাকিস্তানের নিরাপত্তা উপদেষ্টা সরতাজ আজিজ শুভেচ্ছা বিনিময় করলেও সুষমা বিষয়টিকে ‘স্রেফ শিষ্টাচার’ বলে এড়িয়ে যান। বৈঠক প্রসঙ্গে সরতাজ আজিজ বলেন, “এমন কোনও পরিকল্পনা এখনও নেই। তবে অন্যপক্ষ যদি বৈঠকে উদ্যোগী হয়, তাহলে আপত্তি নেই।”[৩৭] একই কথা বলেন শরিফও। তাই ভারতের ঘোষিত ১৮তম সার্ক শীর্ষ বৈঠকের “শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বৃহত্তর আঞ্চলিক ঐক্য” তৈরির উদ্দেশ্য কীভাবে রূপায়িত হবে তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছিল চীনের তৎপরতায়। নেপালের উন্নয়নের জন্য আগামী চারবছর ১৫ লক্ষ ডলারেরও বেশী খরচ করার প্রতিশ্রুতি দেয় চীন। যার ফলে নেপালের অনেক কূটনীতিকই চিনের সদস্যপদ

পাওয়ার দাবীকে সমর্থন জানায়। পাকিস্তান প্রত্যাশিতভাবে চীনের পাশে ছিল। ভারত তা হতে দিতে চায় না। কারণ তাহলে সার্কভুক্ত দেশগুলির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় বসবে চীন। পাকিস্তানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৌশলগতভাবে ভারতকে কোণঠাসা করার প্রয়াস চালাবে।

এদিন অবশ্য সেই কূটনীতির মধ্যে ঢুকতে চাননি নরেন্দ্র মোদী। নেপালের সঙ্গে দশটি বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীল কৈরালার সঙ্গে কাঠমাণ্ডু দিল্লি বাস-পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এতদিন ১০০ টাকার বেশী নোট ভারত বা নেপালের মধ্যে চলতো তা তুলে দিয়ে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট নিয়েই দুদেশ যাওয়া আসা করা যাবে। তবে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা নিয়ে যেতে পারবেন দুদেশের নাগরিকই এই চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

কাঠমাণ্ডু সার্ক শীর্ষ বৈঠকের প্রথম দিনে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের আবহ থাকলেও দ্বিতীয়দিনে তা ধুলিসাৎ হয়ে যায়। প্রথম দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সঙ্গে করমর্দন দূরে থাক, মঞ্চে ওঠার পর যিনি নিজের প্রথম সার্ক শীর্ষ বৈঠকে বাংলাদেশের শেখ হাসিনা, শ্রীলঙ্কার মহিন্দ্রা রাজাপক্ষে, এমনকী আফগানিস্তানের নতুন রাষ্ট্রপতি আশরফ ঘনিকে শুভেচ্ছা জানালেন কিন্তু ভুলেও নওয়াজ শরিফের নাম ধরলেন না। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের সঙ্গে পাক রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাতের পরে দুদেশের বিদেশসচীব পর্যায়ের বৈঠক বাতিল করে দেয় ভারত। আর ২৬/১১ র ছ বছর পুর্তির দিন মোদী যে এ ব্যাপারে কোন সক্রিয়তা দেখাবেন না, এটাই ছিল প্রত্যাশিত। তাই পাকিস্তানের সঙ্গে দূরত্ব স্পষ্ট করে দিয়ে অন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীদের সৌজন্য দেখাতে কসুর করেন নি ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

সার্কভুক্ত দেশগুলির উন্নয়নে ভারত কীভাবে কাজ করতে চায়, এর পরেই মোদী চলে যান সেই প্রসঙ্গে। প্রতিবেশী দেশের মধ্যে রেল-রাস্তা বিদ্যুৎ ও ট্রানজিট যোগাযোগের মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশ যোগাযোগ দৃঢ় হয়েছে, শক্তিক্ষেত্রে ভারত-নেপাল সহযোগিতার নয়া যুগ তৈরি করতে চলেছে, দিনে দিনে জোরদার হচ্ছে ভারত ভূটান সম্পর্ক, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে সহজ হয়েছে ভারত-শ্রীলঙ্কা ব্যবসায়িক লেনদেন, দূরত্ব এবং প্রতিবন্ধকতা বাধা হয়নি আফগানিস্তান-ভারতের সম্পর্ক তৈরীতে, ভারত-পাকিস্তানের রেল-বাস যোগাযোগ সাহায্য করছে দুদেশের মানুষকে— এইসব উদাহরণ দিয়ে মোদী বোঝাতে চেয়েছেন দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নেতৃত্বের রাশটি তিনি নিজের হাতেই রাখতে চান।[৩৮]

পাশাপাশি ২৬/১১ র ছ-বছর পূর্তিতে সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া বন্ধ করতে মোদী বার্তা দিয়েছেন সব দেশকে। কিন্তু নওয়াজ শরিফ তাঁর বক্তব্যে এমন কোনও প্রসঙ্গই রাখেননি যাতে সন্ত্রাস দমনে পাকিস্তানের উদ্যোগ চোখে পড়ে। তাই সব মিলিয়ে সার্ক সম্মেলনে তেমন ইতিবাচক কোনও বার্তা দিতে পারল না ভারত বা পাকিস্তান। তাছাড়া মোদী সার্কের মঞ্চ থেকে সার্কভুক্ত দেশগুলির সুবিধায় উপগ্রহ উৎক্ষেপন, মুক্ত বাণিজ্য, সহজে বাণিজ্যিক ভিসা-এমন নানা প্রতিশ্রুতির আশ্বাস দিলেও পাকিস্তানের নেতিবাচক আবস্থানে ফিকে হয়ে গিয়েছিল সবই। যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত চুক্তির মধ্যে 'মোটর ভেহিকলস্ প্যাক্ট' সহ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে প্রথমদিন সায় দেয়নি পাকিস্তান। প্রতি দেশের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং সহজে পণ্য পরিবহন জোরদার করতে যেখানে সব দেশ সক্রিয়, সেখানে পাকিস্তানের এই অবস্থান হতাশ করেছিল। কারণ শুধুএকটি দেশের আপত্তিতে এই প্রকল্প রূপায়ন ধাক্কা খেয়েছিল।[৩৯]

তবে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের দমবন্ধ আবহাওয়া শেষে একটু স্বস্তির বাতাস পাওয়া গিয়েছিল। যে মুহূর্তের দিকে তাকিয়ে ছিল গোটা বিশ্ব। সংঘাতের আবহের মধ্যেও সম্মেলনের শেষ দিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ হাসিমুখে করমর্দন করেছিলেন। শুধু করমর্দন নয়, মোদী হেসে কথা বলতে বলতে এক সময়ে শরিফের কাঁধে হাতও রাখেন। এ প্রসঙ্গে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র সৈয়দ আকবরউদ্দিন বলেন— "ভারত সব সময়েই পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তি বজায় রেখে চলতে চায়। আমরা অর্থপূর্ণ আলোচনা চাই। যদি এই করমর্দনের পর সেই পরিসর তৈরি হয়, আমরা তাকে অভিনন্দন জানাব। কিন্তু জোর দিতে হবে অর্থপূর্ণ আলোচনার উপরেই।"[৪০] কিন্তু এটাও সত্যি যে, প্রতিবেশী দেশের প্রতি শত্রু মনোভাবাপন্ন হয়ে বেশি দিন চলা মুশকিল। তাছাড়া আগামী বছরে ভারতে আসার কথা মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার। তাই এহেন পরিস্থিতিতে দুই পড়শি দেশের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতার আবহ নষ্ট হওয়া সমীচীন নয়। অন্যদিকে ভারতকে আগ বাড়িয়ে শরিফ সৌজন্য দেখাতে গেলে তাঁকে পাকগুপ্তচর সংস্থা ISI ও দেশের সেনাবাহিনী তাঁকে ছেড়ে কথা বলবে না। তাছাড়া সার্ক সম্মেলনে কয়েকটি চুক্তি পাকিস্তান স্বাক্ষর না করায় সার্কের মধ্যেও পাকিস্তানের অবস্থান নিয়ে আপত্তি উঠেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র রাজনীতির কথা ভেবে দুজনে দুদেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই শান্তিপ্রক্রিয়াকে শেষমেশ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পাকিস্তান শক্তিসংক্রান্ত চুক্তিতে সই করতে রাজী হয়। ১৮তম সার্ক সম্মেলনের শেষ দিনে আশার আলো বলতে এটাই। ফলে সার্কের প্রাসঙ্গিকতা নতুন করে উন্মোচিত হয়। তবে

একথা সত্য যে, সার্কের তিরিশ বছরের ইতিহাসে তার সদস্য আটটি দেশ এই সংগঠন থেকে খুব বেশী যে উপকৃত হয়েছে, এমন নয়।

কাঠমাণ্ডুতে সার্ক শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে তিস্তা ও স্থলসীমা চুক্তির দ্রুত রূপায়ণ নিয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে বসেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী বলেন, কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারবেন বলে তিনি আশাবাদী। এতদিন বিরোধীতা করে আসা তৃণমূলের সিলমোহর পড়েছে এবং বিদেশ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে অনুমোদিত হয়েছে স্থলসীমা চুক্তি সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিলের খসড়াটি। খাগড়াগড় বিস্ফোরণের পর যেভাবে দুই দেশ বোঝাপড়া করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে চলেছে, সে প্রসঙ্গ দুই প্রধানমন্ত্রীর আলোচনায় উঠে আসে। মোদী বলেন, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে উন্নয়নের বড় প্রতিবন্ধক সন্ত্রাস। তা প্রতিরোধে ঢাকা-দিল্লি সমঝোতা আরও দৃঢ় করা হবে। সার্ক দেশগুলির প্রয়োজন একটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপনের যে প্রস্তাব মোদী সার্ক মঞ্চে দিয়েছিলেন, হাসিনা তাকে সমর্থন করেন। এইভাবে সার্কের মঞ্চে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী নতুন বার্তা বহন করতে সক্ষম হয়।

সার্কে ১৮তম সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে বলা হয় দক্ষিণ এশিয়াতে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বৃহত্তর আঞ্চলিক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। South Asian Economic Union এর মাধ্যমে মুক্তবাণিজ্য এলাকা, কাস্টমস ইউনিয়ন, যৌথ বাজার, যৌথ অর্থনৈতিক ও মুদ্রা ইউনিয়ন চালু করতে হবে। সাফটা মন্ত্রী পরিষদ ও সাফটা বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে সচল রাখতে হবে। দ্বীপ রাষ্ট্রগুলির উন্নয়নে গুরুত্ব দিতে হবে। দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে আঞ্চলিক প্রকল্পগুলি রূপায়ন; 'মোটর ভেহিকালস্ প্যাক্ট' এর মাধ্যমে তিনমাসের মধ্যে ঐ অঞ্চলের পরিবহন মন্ত্রীদের বৈঠকে বসতে হবে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য; শক্তি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে সহযোগিতা তৈরি, দারিদ্র্য দূরীকরণ; কৃষি ও খাদ্যের নিরাপত্তা; প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার জন্য SAARC Enviornment and Disaster Management Centre এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা; যক্ষ্মা ও এডস্ রোগ প্রতিরোধের জন্য কাঠমান্ডুতে STAC স্থাপন; উক্ত অঞ্চলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ থেকে কারিগরী শিক্ষার প্রসারে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ; নারীও শিশু শোষণ রোধ, উদ্বাস্তু শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, টেলিব্যবস্থায় শুল্কহ্রাস, সন্ত্রাস প্রতিরোধ সহ সাংস্কৃতিক বিনিময় তথা দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্রের প্রসার ঘটাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়। এইভাবে ঘোষণা সার্কভুক্ত দেশগুলির মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করে।

উপরোক্ত সার্ক সম্মেলনগুলির পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে দক্ষিণ এশিয়ায় সার্ক ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের একটি প্রতিকী মঞ্চ হিসাবে যথেষ্ট সফল। তবে বিগত প্রায় তিন দশক ধরে দক্ষিণ এশিয়ার মতো একটি সমস্যা জর্জরিত এবং নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত অঞ্চলে আন্তঃরাষ্ট্র সহযোগিতার কেন্দ্রস্থল হিসেবে সার্ক এখনও সক্রিয় রয়েছে। অন্যান্য আঞ্চলিক সংগঠনের তুলনায় দেরীতে শুরু করেও এই সংগঠন নানা ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা প্রমান করেছে। প্রথমত, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সম্পর্কের বিকাশের ক্ষেত্রে যদি দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাই যে, সার্কের আঞ্চলিক বাণিজ্য অর্থাৎ সার্কভুক্ত দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের পরিমাণ বিশ্বের মোট বাণিজ্যের ৫%। এক্ষেত্রে আমদানির পরিমাণ মাত্র ০.৮২%। এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে বলা যায় যে সার্কভুক্ত রাষ্ট্রগুলি বাণিজ্যিক আদান প্রদান খুব একটা বৃদ্ধি করতে পারেনি। একদিকে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ধারাবাহিক চাপ, অন্যদিকে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় অভিন্ন বাজার নীতি, মুক্ত বাণিজ্যের পরিসরকে আরো বৃদ্ধি করতে হবে। এলাকার মধ্যে চাহিদাভিত্তিক যৌথ উৎপাদন এবং সুষ্ঠু ও কার্যকরী পরিচালনার জন্য একাধিক দেশের উৎপাদন উপকরণ (যেমন, বনজ সম্পদ, তড়িৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাস, শ্রমশক্তি, উপযুক্ত প্রযুক্তি) এবং জ্ঞানের বিনিময় এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশকে সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, নদনদীর জলবন্টন, তথ্যপ্রযুক্তির আদান প্রদান, উপগ্রহ ভিত্তিক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং মারাত্মক রোগের সংক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য নানাবিধ যৌথ কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। আমরা সার্কের সম্মেলনগুলি পর্যবেক্ষণ করে উপলব্ধি করি যে সামাজিক কল্যাণ, সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ে আঞ্চলিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সাফল্যের সঙ্গে কার্যকরী হয়েছে যা ইতিবাচক পদক্ষেপ বলা যায়।

তৃতীয়ত, ভারত উপমহাদেশে সার্কের উদ্ভবকাল থেকে যে পরিমাণ সংঘর্ষ ও সামরিক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে— অন্তত দুটি বড়ো মাপের যুদ্ধ এবং প্রায় প্রত্যেক দেশেই রাজনৈতিক অস্থিরতা সত্ত্বেও সার্ক সংগঠন অটুট রয়েছে। বিশেষত ১৯৯৮ সালে ভারতের পোখরান-II বিস্ফোরণ ও তার জবাবে পাকিস্তানে পরমাণু বিস্ফোরণ এ অঞ্চলে গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশ এর সমালোচনা করে। তবে উভয় দেশ এ পর্যন্ত যে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে এসেছে তাতে বিধ্বংসী কোন যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়নি।

চতুর্থতঃ আন্তর্জাতিক দুনিয়ার প্ররোচনা এবং আভ্যন্তরীণ বিরোধী রাজনৈতিক দলের চাপে ভারতের বিরুদ্ধে নেপাল, বাংলাদেশ বা শ্রীলঙ্কায় মাঝে মাঝে নেতিবাচক মনোভাব মাথাচাড়া দেয়। এই সমস্ত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি অংশ অনেক সময় নিজেদের স্বার্থে এবং কৌশলগত কারণে ভারত বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করে। তবে সামগ্রিকভাবে এইসব রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংযম ও সহযোগিতার মনোভাব যেভাবে প্রতিফলিত হয় তাতে আশান্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

পঞ্চমত, সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে পর্যবেক্ষক রাষ্ট্ররূপে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ানের অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক রাজনীতির দৃষ্টিতে অবশ্যই সার্কের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেছে। এর মধ্যে বেশ কিছু রাষ্ট্র অর্থনৈতিক সাহায্যপ্রদান করে সার্ককে আরও শক্তিশালী করেছে। চিনের সদস্যপদকে কেন্দ্র করে একটি সংশয়ের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। কারণ আমরা আগেই দেখেছি যে, চীনের সদস্যপদ কখনোই ভারতের স্বার্থের অনুকূলে থাকবে না। তবে এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে যদি যথার্থই রাজনৈতিক সদিচ্ছাকে মূলধন করে রাষ্ট্রগুলি উদ্যোগী হয় তাহলে একটি আঞ্চলিক সংগঠনরূপে সার্কের গুরুত্ব ও উজ্জ্বলতা অবশ্যই বাড়বে। বস্তুতপক্ষে দক্ষিণ এশিয়ার যে অঞ্চলটিকে আমরা সার্ক অঞ্চল হিসাবে ধরি অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ায় দীর্ঘকাল ধরে ছিল ভারতের সংস্কৃতি সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সুগভীর প্রভাব। সার্ক এর অন্তর্গত অঞ্চলটির প্রায় পুরোটাই ছিল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এতদঅঞ্চলে যে ভারতের স্বাভাবিক নেতৃত্ব (Natural Leadership) থাকবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।[৪১] কিন্তু এই নেতৃত্বকে অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত কর্তৃত্বদের সাথে সমগোত্রীয় করে দেখা হয়েছে। বিশেষত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে ভারত বুঝি বা সার্কের উপর কর্তৃত্ব করে চলবে। ড. রাধারমণ চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে বলেছেন— এ ধরনের ভীতি থেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের আঁতাত গড়ে উঠেছে। চিন ও সুযোগের ব্যবহার করে বাংলাদেশ ও নেপালের সাথে বিশেষ সহযোগিতার সম্পর্কসূচক নানাবিধ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। যা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককেও প্রভাবিত করে।

অন্যদিকে হিংসার রাজনীতি ও সার্কের দুর্বলতার একটি বড় কারণ। বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের জনগোষ্ঠীর বা নৃকুল গোষ্ঠী (Ethnic groups) সমূহের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ ও বিভেদমূলক মানসিকতা ও তার থেকে সৃষ্ট সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের আশ্রয় ক্ষেত্ররূপে বিভিন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ভূখণ্ড ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। বলাবাহুল্য ভারত এক্ষেত্রে রীতিমত ভুক্তভোগী। এ প্রসঙ্গে ভারতের গোয়েন্দা দপ্তর ২০০৭ সালে বিদেশমন্ত্রকের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করেছিল তাতে বলা হয়— ‘‘আলফার জন্য

গোপনে অস্ত্র আসছে ইউনান প্রদেশ থেকে। এই অস্ত্র আসছে বাংলাদেশ ও মায়ানমার হয়ে।"[৪২] তাই ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে নানবিধ জঙ্গী গোষ্ঠীর আশ্রয়স্থল হল বাংলাদেশ, মায়ানমার ও ভূটান। স্বাভাবিকভাবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নটি উঠে আসে।

এই প্রসঙ্গে আমরা আরও দেখি যে দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা সংক্রান্ত চাহিদা ও ধ্যানধারণা এতই বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ যে সমগ্র অঞ্চলের জন্য যে একটি অভিন্ন নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারণা গড়ে উঠবে তা সম্ভব হয়নি। সুতরাং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় সংহতি ও ঐক্যের একটি অর্থপূর্ণ পরিবেশ আজও তৈরি হয়নি। তাই এ প্রসঙ্গে শ্রীকান্ত পরাঞ্চলে বলেছেন— "The development of a Vastly complex Pattern of interregional balancing that has torn Asia with contradictions, Conflicts and in compatibilities goes to show that the search for national security in Asia cannot be made in a collective fashion."[৪৩] যার মূল কথা হল এশিয়ার অন্তর্গত দেশগুলির মধ্যে এতরকম স্ববিরোধীতা, সংঘাত ও সঙ্গতিহীনতা আছে যে জাতীয় নিরাপত্তার সন্ধানে এরা কখনই যৌথভাবে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে না।

আবার দেখা যায় যে যথাযথ রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব ও সম্পদের অপ্রতুলতা সার্ক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের প্রধান বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। তদুপরি দ্রুত বিশ্বায়ন ও বাজার একত্রকরণের প্রেক্ষাপটে সার্কের ধীরগতির ফলেই দক্ষিণ এশিয়ায় আজও ব্যাপক দারিদ্র্য এবং অনুন্নয়ন দূরকরা সম্ভব হয়নি। কাজেই সার্কের তৃতীয় দশকে ক্রান্তিকালে অন্তত দুটি ক্ষেত্রে বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার। ইতিমধ্যে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কার্যকরী ব্যবস্থা এবং সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা উন্নতি করণ।[৪৪] এগুলি অবশ্য বলা যত সহজ কার্যকরী করা তাই আরো কঠিন। তাই সার্কের উন্নয়ন কার্যক্রম ও রূপান্তর প্রক্রিয়া নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার পণ্ডিবর্গ, নীতি নির্ধারক এবং সুশীল সমাজের সদস্যবর্গের ভবিষ্যৎ ভাবনা শুরু করা দরকার।

সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনায় সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ শনাক্ত করতে হবে এবং সক্রিয় বিবেচনায় রাখতে হবে। তাহলে সকল সদস্যের স্বার্থের নির্বিরোধ সহাবস্থান নিশ্চিত করা যাবে। নতুন করে বিশ্বাস, ভুল বুঝাবুঝি বা অবিশ্বাসের বীজ গজাবে না। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থা এবং জীবনমানের দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। এক্ষেত্রে অগ্রসরমান সদস্য দেশগুলো বাংলাদেশের মতো পিছিয়ে পড়া সদস্য দেশকে সহযোগিতার একতরফা ছাড় দিতে রাজি না হওয়াই স্বাভাবিক।

সদস্যদেশের সরকার অবশ্যই নিজ নিজ দেশের জনগণের জন্য কাজ করতে চাইবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। সার্কের স্বার্থ তার প্রথম অগ্রাধিকার হবে না যদি তা সরাসরি তার জনগণের স্বার্থে কাজ না করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তা হলে সে পিছিয়ে পড়া দেশের পণ্যের বাজারে নিজের প্রভুত্ব কায়েম করবে ঠিকই, কিন্তু নিজের বাজারে বিপরীতমুখী পন্য প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করবে। এটি লাভালাভির সূত্র অনুসরণ করে। এসব কারণে বিগত তিনদশক যাবৎ সার্ক অসফল থেকেছে। সংস্কৃতি, ক্রীড়া, গণমাধ্যমসমূহ সীমিত ক্ষেত্রে যৎকিঞ্চিৎকর বিনিময় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলেও দারিদ্র্যমোচন এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্য বলয় বা SAFTA বাস্তবায়ন করা পুরোপুরিভাবে সম্ভব হয়নি। সার্ক চার্টারে প্রতিবছর শীর্ষ সম্মেলন বা সামিট করার কথা থাকলেও নানা অজুহাতে তা হয়নি।

সম্ভাব্য সহযোগিতার আর একটি ক্ষেত্র দুর্যোগ মোকাবিলা ও ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। বন্যা, ভূমিকম্প, খরাসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ কৃষি ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একযোগে অভিন্ন স্বার্থে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। আঞ্চলিক ও অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা আর একটি সম্ভাব্য অভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়। পর্যটন শিল্প বিকাশে যৌথভাবে কাজের সুযোগ আছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের বিষয়টিও অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। মোটামুটিভাবে, অভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অভিন্ন শ্রমবাজার, অভিন্ন পণ্যবাজার, অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থা, যোগাযোগ ও পরিবহন সহ নানাক্ষেত্রে একযোগে সাধারণ স্বার্থে সার্ক কাজ করতে পারে।

তবে কাজ করার ক্ষেত্র থাকলেই চলবে না। সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য প্রতিটি সদস্য দেশের সক্রিয় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ জরুরী বিষয়। সকল সম্ভাবনা ও সুযোগ একযোগে কাজে লাগালে এ অঞ্চলের ব্যাপক মানুষ উপকৃত হবে; তাদের জীবনমান উন্নত হবে, আঞ্চলিক সমৃদ্ধি আসবে। মনে রাখা প্রয়োজন, দূরবর্তী বড়ো সুযোগ অপেক্ষা নিকটবর্তী ছোট দেশগুলোর দ্বারস্থ হওয়ার চেয়ে নিকটবর্তী প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সময়ের দাবী। পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতে দেশে দেশে অঞ্চলে অঞ্চলে সম্পর্ক নতুন করে মূল্যায়ণ করা উচিত।

একথাও অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ। যেমন, অনেক সদস্যদেশ একই পণ্য উৎপাদনকারী, একই বাজারে একই পণ্য রপ্তানিকারী। তৈরি পোশাকশিল্প রপ্তানিতে আমরা অনেক সদস্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করি। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে আমরা প্রতিযোগিতায় অংশ নেই সদস্য দেশের পণ্যের

সঙ্গে। মানবসম্পদ রপ্তানিতেও মধ্যপ্রাচ্যসহ আমদানীকারক দেশে সদস্য দেশের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা হয়। এছাড়া বস্ত্র, মৎস, চা, পাট, চামড়াসহ বিবিধ খাতে আমরা আন্তঃসদস্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হই। ফলে উৎপাদক হিসেবে বিভক্তির কারণে জোটবদ্ধ আমদানিকারক বা ক্রেতার কাছে উৎপাদক স্বীয় স্বার্থ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। কাজেই একই পণ্য উৎপাদনকারী সদস্য দেশগুলো অভিন্ন রপ্তানি প্লাটফর্মের মাধ্যমে, উপকৃত হতে পারে। সার্কের কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নে ও কর্মকান্ড বাস্তবায়নে এসব স্পর্শকাতর বিষয়গুলোও সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট দিকগুলো গোচরে রাখতে হবে। স্বার্থের বাইরে কোন জোটই হয়না, টিকে থাকে না। এটাই মুক্ত বাজার অর্থনীতির অনতিক্রম্য সূত্র।[৪৫]

সার্কের চেতনাকে শুধুই আবেগ নির্ভর রাখলে সার্কের অস্তিত্ব নাম সর্বস্ব থাকবে। তাই সার্কের সম্ভাবনা অর্থনৈতিক সহযোগিতায়, প্রবৃদ্ধিতে। তাই সার্কের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে হলে বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে এবং সদস্য দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে সার্ককে আঞ্চলিক সহযোগিতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে হবে। সার্কের ভেতর উন্নত যেসব দেশকে SAFTA-এর ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছুটা ছাড় দিতে হবে, পরিনামে সেসব দেশ এর সোনালী ফসল অবশ্যই ঘরে তুলতে সক্ষম হবে। দ্বিধান্বিত সদস্য দেশকে বিষয়টি গভীরভাবে পুর্নঃমূল্যায়ণ করতে হবে। টেকসই আঞ্চলিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গড়ার বিকল্প নেই। একই পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ক্রেতা সংঘের জিম্মায় না থেকে, সার্ক (SAARC) তেল রপ্তানিকারক জোট (OPEC) এর মতো কাজ করতে পারে।

উপরোক্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দক্ষিণ এশিয়ার সহযোগী সংগঠন সার্ক এর মূল্যায়ণ সম্ভব হয়েছে ঠিকই কিন্তু সার্ককে মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে তা সন্দেহ নেই। প্রথমত, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে উভয়দেশ যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়নে ভারতের অনুদান প্রদান, ঋণপ্রদান, শুল্ক ও অতিশুল্ক হ্রাস, ভারতের কোম্পানীগুলির বাংলাদেশে বিনিয়োগ যথেষ্ট বার্তাবাহী পরিবেশ তৈরি করে।

দ্বিতীয়ত, ঢাকা-আগরতলা এবং ঢাকা কলকাতা বাস যোগাযোগ, কলকাতা-ঢাকা রেল যোগাযোগ নতুনভাবে People to People Contact কে বাস্তবায়িত করেছে।

তৃতীয়তঃ সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে উভয় দেশ এই মঞ্চকে ব্যবহার করে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করেছে। এছাড়া সন্ত্রাসবাদী বন্দী প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রেও উভয়দেশ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

যা সার্কের ঘোষিত নীতিকে রূপায়িত করার পদক্ষেপ বলে গণ্য হয়।

চতুর্থতঃ উভয় দেশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটানোর জন্য ছাত্রছাত্রী বিনিময় তাদের স্কলারশীপ প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ, সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের জন্য যৌথ উদ্যোগে চলচিত্র নির্মাণ, সাংবাদিক যাতায়াত বৃদ্ধি, ICCR-এর মাধ্যমে রবীতীর্থ তৈরি, বুদ্ধিজীবীদের বা নীতি নির্ধারকদের নিয়ে সেমিনার প্রভৃতি ব্যবস্থা করে উভয় দেশ। ফলে সার্কের ঘোষিত নীতিকে বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগী দুই দেশ।

পঞ্চমতঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে নারী ও শিশু পাচার হয়ে ভারতে আসে বা মাদক চোরাচালন হয়ে ভারতে আসে। এগুলি বন্ধ করা বা এবিষয়ে দুই দেশ সার্কের ঘোষিত নীতিকে মেনে প্রতিরোধ করার চেষ্টা চালায়।

ষষ্ঠতঃ সার্কের সদস্য উভয়দেশ তাই সার্কের মঞ্চে থেকেও উভয়দেশ ASEAN বা BIMSTEC-এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অগ্রগতি সুনিশ্চিত করতে চায়। তাই উভয়দেশ উক্ত সংগঠনগুলির সঙ্গে কোন না কোনভাবে যুক্ত হয়েছে।

সপ্তমত, দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের আগমনকে প্রতিহত করতে চায় ভারত। যাতে তার নিরাপত্তা স্বার্থ বিঘ্নিত না হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ-চীন যোগাযোগ এই সংগঠনের প্রাসঙ্গিকতাকে প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখীন করে তোলে।

এ প্রসঙ্গে সার্কের মঞ্চ কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তা বলতে গেলে দেখা যায় যে— "Another scholar, however, is in favour of adding more tracks like, Track-III refering to the business community; track-IV refreing to citizen to citizen exchange programms of all kinds, and track-V refering to the media.[৪৬]

এছাড়া ভারত ও বাংলাদেশ যদি সার্কের মঞ্চকে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চায় তার কয়েকটি সম্ভাব্য পথ হলো—।

১। Use of such initiatives occasionally to explore alternatives for conflict management at a non-governmental level;

২। Used as informal channels for exploring policy options without committing

governments;

৩ । Influencing Public discussion of regional issues;

৪ । Prompted government action by calling public attention to escalating problems;

৫ । Lowered barriers between officials and citizens, especially on economic issues;

৬ । Created new connections among research institutes and among NGOs in the region;

৭ । Served as formative influence ground on individuals who would later go into leading national roles.[৪৭]

তবে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ভারতের প্রভূত্ব বাংলাদেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অসম বিকাশ হিসাবে দেখলে দেখা যায় যে কয়েকটি সমস্যা থেকেই যায়— যেমন ভারতে ও বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দলের বাড়বাড়ন্ত নীতিনির্ধারকদের মাথাব্যাথার কারণ। তাছাড়া— (1) The continuing influence of the school of thought viewing Indias security in military terms and aspriration to power in the image of the superpowers and not as a great Asian Power cooperating with other Asian Power for peace and prosperity of Asia;

(II) Slow progress in the development of the democratic process in many of the neighbouring countries and the divergence in regime interest becoming a veritable source of mutual suspicion and tension;

(III) The mismatch between India rapidly growing power (military and Economic) on the one hand, and her foreign policy orientation and management potential in the enlightened use of this power on the other, causing instances of strain and tension in bilateral realtions with neighbours;

(IV) Spillover effect on bilateral relations, on Indias suspicion of some of here internal problems being fomented by her neighbours.[৪৮]

(V) The form of insecurity has emerged from transnational challenges to security emerging from drug trafficking, enviormental pollution, rapid deplection of water resources,

loss of bio-diversity wealth, energy resources depletion, its cumulative impact on the society and state system in South Asia.[৪৯]

উপরোক্ত সমস্যাগুলি থাকলেও সমাধানের সম্ভাব্য পথ খুঁজতে হবে উভয় দেশকে এবং সার্কের প্রাতিষ্ঠানিক গুরুত্বকে বাস্তবায়িত করতে হবে।

এক্ষেত্রে দুটি দেশ পারস্পরিক সহযোগিতা ও স্বার্থকে রক্ষা করতে চারটি নীতি মেনে চলেছে। সেগুলি হলো (১) রপ্তানি নির্ভর বাণিজ্যের উন্নয়ন; (২) সন্ত্রাসবাদী আক্রমনের মোকাবিলা করা; (৩) আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্থায়ীত্ব ও বিকাশ; (৪) বৈরীতামুক্ত সহযোগিতার সুস্থ বৈদেশিক সম্পর্ক।[৫০] এবং এভাবেই দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের আগ্রাসনকে প্রতিহত করে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েই সার্কের মাধ্যমে পৃথিবীতে গঠনমূলক সহযোগিতার মাধ্যমে এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে যার লক্ষ্য হবে সুদূরপ্রসারী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

এই দুটি দেশ পারস্পরিক ক্ষেত্রে উভয়দেশের জনগণের মানোন্নয়নের জন্য বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার পথকে দৃঢ়তর করতে চলেছে। এই দুটি দেশ সংযুক্ত হলে উভয় দেশের জনগণের জীবনে গুণগত মান বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা গড়ে তোলা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়ার সমৃদ্ধি এবং উভয়দেশের বহু সংস্কৃতি সম্পন্ন সমাজের প্রাকৃতিক মেধাকে বহুমুখী কর্মশক্তিসম্পন্ন করে তোলা সম্ভব হবে। যার প্রকৃত অর্থ our relations, characterised by a strategic cooperative partnership for peace and prosperity.[৫১] এভাবেই দক্ষিণ এশিয়াতে প্রতিবেশী রাষ্টসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার মাধ্যমে বিদেশনীতির নীতিগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ভারত বিশ্ব রাজনীতিতে তার নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে তৎপর। এই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্কের পুর্ণমূল্যায়নে সে আগ্রহী। ক্ষমতা ও বহুপাক্ষিকতা ভারতের বিদেশনীতির লক্ষ্য হলেও অর্থনীতি ও সামরিক স্বার্থের দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাস্তবমুখী বিদেশনীতি রূপায়নে সচেষ্ট। তাই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কও এর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিশ্বায়নের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও যোগাযোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করাই উভয়ের আশু লক্ষ্য। তাই সার্ক একটি শক্তিশালী কাঠামো যাকে ব্যবহার করে উভয়ে এগিয়ে চলেছে এবং চলবে। তাই সার্ক আজ দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবিচ্ছেদ্য বাস্তবতা।

তথ্যসূত্র

১. Hassaanuzzaman Al Masud. – 'Political and Security roles of SAARC in the twenty first century : A Bangladesh Perspective' in Dipankar Banerjee (ed.) – *SAARC in the twenty first century : Towards a Cooperative future*, India Research Press, New Delhi,2002, p. -49.

২. Bajpai Kanti – 'Bangladesh and SAARC : Origins and Expectations' in S.R. Chakraborty (ed.) – *Foreign Policy of Bangladesh*, Haranand Publications, New Delhi, 1994, p. -244.

৩. Jamir Mohammad – 'Philosophy and relevance of SAARC' in *Sachitra Bangladesh*, Vol. -26, No. -14, 30 November, Habib Press Ltd.,Dhaka, 2005, p. -15.

৪. Mohasin Mohammad –'Tritiya dasake SAARC : Lakhya o Pratyasa' in *Sachitra Bangladesh*, Vol. -26, No.- 14, 30 November,Habib Press Ltd, Dhaka, 2005, p. -18.

৫. Op. cit. ,no.-1, p. -51.

৬. Chakraborty Radharaman (ed.) – Samakalin Antarjatik Samparka, Paschimbanga Rajya Pustak Parsad, Kolkata,1999, p. -99.

৭. Charter of South Asian Asssociation for Regional Cooperation, SAARC Secretariat, Kathmandu,1986.

৮. Declaration of SAARC Summits 1985-1998, Information and Media Division, SAARC Secretariat,Kathmandu,2001, pp. -37-38.

৯. SAARC, Source : http:/www.saarc.sec.org./ , p. -7

১০. Ghosh Anjana – Thanda Yuddha uttar Antarjatik Samparka Sankot o Prabanata, Progressive Publishers, Kolkata, 2003, p. -201.

১১. Ibid.

১২. Op.cit.,no.-2, p.-254.

১৩. Op.cit. ,no. -10, p. -205.

১৪. Kalam Abul –'CBMs and security cooperation in South Asia : Chinese Perspective' – This paper presented at the International Conference on CBM and Security Cooperation in South Asia : Challenges in the new Century, Organised by BIISS and The German Embassy, Dhaka, 3rd -5th November,2001.

১৫. Op.cit. ,no.-13, pp. -212-213.

১৬. Agreement on South Asian Free Trade Area (SAFTA), SAARC Secretariat, Kathmandu, 2004, pp. -1-22.

১৭. Prof. Chakraborty Tridib –'SAARC Expands its wings : Insinuations in the new global order' in *World focus*, No. -341, New Delhi, May 2008, p. -202.

১৮. Op.cit. ,no. -15, p. -216.

১৯. Ibid.

২০. Rajen M.S. – 'Indian foreign policy in the 21st Century' in *Jadavpur Journal of International Relations*, Vol. -03, Department of International Relations, Jadavpur University, Kolkata, 1997.

২১. Op.cit. ,no. -19, p. -223.

২২. Suryanarayan V. – 'Indonesia's role in ASEAN : An Indian Perspective' in Baladas Ghosal (ed.) – *ASEAN and South Asia : A Development Experience*, Sterling Publishers Pvt. Ltd.,New Delhi, 1998,pp. -113-114.

২৩. Op.cit. ,no. -4, p. -20.

২৪. Op. cit. ,no. -21,pp. 233-234.

২৫. Ahamed Imtiaz – 'Bangladesh and India : In the context of SAARC and the emerging global scenario' in *Indian foreign policy Journal*, Vol. – 2 , No. -1, Jan-Mar 2007, Cambridge University press india pvt. Ltd, New Delhi, 2007, p. -71.

২৬. Frontline, 20th April 2007.

২৭. Declaration of the 15th SAARC Summit, Colombo, 2nd -3rd August,2008.

২৮. Anandabazar Patrika, 27th April ,2010.

২৯. Anandabazar Patrika, 29th April, 2010.

৩০. Anandabazar Patrika, 30th April, 2010.

৩১. Op.cit., no.-29.

৩২. Ibid.

৩৩. Declaration of the 16th SAARC summit, no. – 27, Thimpu, 28th-29th April, 2010.

৩৪. Anandabazar Patrika, 11th November2011, p.-5.

৩৫. Ibid. ,p. -6.

৩৬. Declaration of the 17th SAARC summit,no. -16, Addu, 10th-11th November,2011.

৩৭. Anandabazar Patrika, 26th November2014, p. -5.

৩৮. Anandabazar Patrika, 27th November2014, p. -6.

৩৯. Ibid.

৪০. Anandabazar Patrika, 28th November 2014, p.-5.

৪১. Bose Sutapa and Jalal Ayesha (eds.) – Modern South Asia : History Culture and Political economy, Oxford University Press, New Delhi, 1999, p. -260.

৪২. Anandabazar Patrika, 7th October 2007.

৪৩. Sen Baniprasad – Samakalin Antarjatik Samparka-Bisoy Binyas o Byakhya, Mitram, Kolkata, 2010, pp. -260-261.

৪৪. Khan Abdur Rab - 'SAARC arthanaitik o samajik khetre Vavishat Bhavana' in Sachitra Bangladesh, Habib Press Ltd.,Dhaka, 2005, p. -5.

৪৫. Dr. Mukul Ibrahim – ' SAARC –Possibilities and Challenges' in *Sachitra Bangladesh*, Habib Press Ltd.,Dhaka,2005, pp. -33-34.

৪৬. Montville Joseph V – 'The Arrow and the Olive branch : A case for Track two diplomacy' in John w. Macdonald and Diane B Bendahmane (eds.) – *Conflict Resolution : for track two diplomacy, Institute for Multi Track Diplomacy*, Washington DC, 1995, p. -4.

৪৭. Behera Navanita Chadha and Evans Paul M and Rizvi Gowher –'Beyond Boundaries : A Report on the state of non –official dialogue on peace,security and cooperation' in *South Asia*, Centre for Asia Pacific Studies, Canada, 1997, pp. -32-36.

৪৮. Hug Muhammad Shamsul – Bangladesh in International Politics –the dialemas of the weak states, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1993, p. -124.

৪৯. Pandit Santishree D. – 'Can democracy be designed in South Asia – the politics of institutional choices' in A. Subramanyam Raju (ed.) – *Reconstructing South Asia : An Agenda*, Gyan Publishing House ,New Delhi ,2007, p. -85.

৫০. Panda Snehalata – 'Sino – Indian Relations in a new Perspective' in *Strategic Analysis*, Vol. -27, No. -1 (Jan-Mar 2003), The Institute for Defence Studies and Analysis, New Delhi, 2003, p. -6.

৫১. Bhattyacharya Sanjoy – 'India and China : New directions' in Atish Sinha and Madhup Mohta (eds.) – *Indian foreign policy challenges and opportunities*, Academic Foundation, New Delhi, 2007, p. -701.

পঞ্চম অধ্যায়

'পূবে তাকাও নীতি' ও ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনায় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ভারতের 'পূবে তাকাও নীতি'র সার্বিক গুরুত্ব যথেষ্ট তাৎপর্যবাহী। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার সূত্রপাত ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক এক নতুন অধ্যায়ের সুত্রপাত ঘটিয়েছিল। বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক পররাষ্ট্রনীতিতে যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল তারই একটা অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে ওঠে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং তৎসন্নিহিত পূর্ব এশিয়া। সামরিক শক্তির পরিবর্তে আর্থিক স্বার্থটি বড় হয়ে ওঠায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র বা বাজার হিসেবে মনে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল। যার সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৬৭ সালের ৫ই আগস্ট ব্যাংককে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ— ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড নিয়ে তৈরি হয় আশিয়ান (ASEAN— Association of South-East Asian Nations)। ভারতকে এই গোষ্ঠীতে পেতে আগ্রহী ছিল সবাই, কিন্তু ভারত তখন আগ্রহ দেখায়নি।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং তার পরবর্তী পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ভারতের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে 'পূবে তাকাও নীতি' ছিল এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। আশির দশকের প্রথমার্ধ থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে ভারতের পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তো বটেই, তাছাড়া কাম্পুচিয়া কেন্দ্রিক মতপার্থক্য নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ চীন-আমেরিকার সখ্য এবং দেং জিয়াও পিং এর হাত ধরে চীনের অর্থনৈতিক সংস্কারের বিষয়ে ভারত যেমন সতর্ক ছিল তেমনই ইরাক-ইরান যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব ভারতের কাছে অনেকটাই হ্রাস হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন দিক থেকে কৌশলগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আশির দশক থেকে ভারত— ASEAN সম্পর্কে গঠনমূলকভাবে ইতিবাচক মোড় নিতে আরম্ভ করে। ১৯৮০-র শেষদিকে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বাণিজ্যের পরিমান ছিল ৬ বিলিয়ন ডলারের মতো। তাই সোভিয়েতের পতনে ভারত তার বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে খানিকটা ধাক্কা খায়। এই দেশটিই ভারতকে পণ্যের বিনিময়ে তেল ও অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করতো। ফলতঃ ভারতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা ও বজায় রাখার জন্য বিদেশী মুদ্রার উপর

চাপ বাড়তে থাকে। রপ্তানী বাণিজ্য থেকে আয় বৃদ্ধি করা এবং অন্যান্য উৎস থেকে বিদেশী মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে আবশ্যিক হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ভারতীয় নীতিনির্ধারকগণ এ বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন যে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) গঠিত হতে যাচ্ছে যেখানে ভারত ও একজন স্বাক্ষরকারী দেশ এবং যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শুল্ক হার কমাতে হবে, অবসান ঘটবে আমদানি কোটার। একমেরুকরণ বিশ্বের চাহিদার প্রেক্ষিতে ১৯৯১ সালের ২৪ শে জুলাই নরসীমা রাও এর অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিংহ সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করার কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান যে শিল্পে লাইসেন্স প্রথা তুলে দেওয়ার সাথে সাথে বিদেশী বিনিয়োগকেও উৎসাহ দেওয়া হবে।[১] কারণ উক্ত সময়ে ভারতের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি যেভাবে বিশ্বায়িত অর্থনীতির প্রেক্ষিতে দুর্বল হয়ে পড়েছিল সেখানে আশিয়ান ছিল মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রতীক। ASEAN-এর নেতৃত্বে দক্ষিণ পূর্ব এশিয় অঞ্চল তখন শিল্প সমৃদ্ধ। লগ্নি পুঁজি ও বাণিজ্যের প্রশ্নে তাদের দিকে না তাকানো সে সময় ভারতের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই অর্থনৈতিক উদারীকরণের পরবর্তীকালেই 'পূবে তাকাও নীতি' গৃহীত হয়।

এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে দেখা যায় যে— These were the Circumstances that Compelled Policy-makers in New Delhi to undertake concerted moves, firstly, to allay the fears in Southeast Asia and Secondly, to wriggle out of the negative image that had got built up. A Combination of events involving the end of the cold War, a new Government in New Delhi under the leadership of P.V.Narshima Rao, Indias domestic economic crisis and the subsequent liberalization of the Indian economy came in quite handy to put in place a new policy framework. Although Rao has been credited for the look East Policy, the roots of such policy could be traced to the initatives by the Indian Navy in the late 1980s. Economic Exigencies and Political Complulsions later were added incentives to look at southeast Asia afresh.[২]

তাছাড়া ভারতের এই পূবে তাকাও নীতি' বলতে বোঝায়— "Look East Policy"a multi-faceted and multi-pronged approach to establish Strategic links with as many individual countries as possible, evolve closer political links with ASEAN and develop strong economic bonds. Secondly, it was an attempt to carve a niche for India in the larger Asia-Pacific economic and strategic landscape. Finally, the Look East Policy was also meant to showcase India's economic potential for investment and trade.[৩]

প্রকৃতপক্ষে নরসীমা রাওয়ের প্রধানমন্ত্রীত্বের কাল থেকে ‘পূবে তাকাও নীতিকে’ আনুষ্ঠানিকভাবে বিদেশনীতির অগ্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই ‘পূবে’ বলতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিল্পোন্নত দেশগুলিকে বোঝায়, এশিয়ার নবোদিত শার্দূল হিসাবে যাদের পরিচয় পাশ্চাত্য অর্থনীতির নজর কেড়ে ছিল। কিন্তু দূর প্রাচ্যে পৌঁছতে হলে যে আগে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মতো নিকট প্রাচ্যের দরজা উন্মুক্ত করা প্রয়োজন, তা রাওয়ের উত্তরসূরীরা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু উপলব্ধি বিদেশনীতির অভিমুখ পরিবর্তনে সফল হয়নি। কারণ ভারত-পাকিস্তান বা আফগানিস্তানকে নিয়ে যতটা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়েছে ততটা বাংলাদেশ বা মায়ানমার বা ভুটানকে কাছে টানার প্রয়াস দেখায়নি।

তাই এক্ষেত্রে ভারতের ‘পূবে তাকাও নীতি’র সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কতটা সঙ্গতি বজায় রেখেছে তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান ভারতের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এটা এখন সর্বজনবিদিত। বিশেষত দু-দশকের বেশী সময় ধরে কার্যকরী থাকা ভারতের ‘পূবে তাকাও নীতি’র (Look East Policy) প্রেক্ষিতে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সার্বিক উন্নতির জন্যও প্রতিবেশী দেশ হিসাবে বাংলাদেশের সহযোগিতা ভারতের একান্ত কাম্য। এখানে উল্লেখ্য যে, উত্তর-পূর্ব ভারত লাগোয়া দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ-নেপাল-ভূটান ছাড়াও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মায়ানমার ও থাইল্যান্ডকে নিয়ে যে ‘The Bay of Bengal Initiative for Multisector Techinical Cooperation’(BIMSTEC) নামক আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক সংগঠনটি ১৯৯৪ সালে তৈরি হয়েছিল তার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক কার্যকলাপের জন্য ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকাটা আবশ্যিক। এটা দু দেশের বিদেশনীতি বিশেষজ্ঞরা অনুভব করলেও দুদেশের সরকারের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক চাপান উতোর কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারতের দাদা সুলভ আচরণ সে পথে অন্তরায় হয়েছে বারবার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ‘পূবে তাকাও’ নীতির অংশ হিসাবে ভারত মায়ানমারের কাছ থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির যে পরিকল্পনা করেছিল বাংলাদেশ সরকারের অসহযোগীতা ও ভারত সরকারের কূটনৈতিক ব্যর্থতার জন্য, আজ তা সুদূর অতীত। মায়ানমার থেকে ভারতে গ্যাস আমদানির জন্য পরিকল্পিত পাইপলাইনটি যেহেতু বাংলাদেশের ভূখন্ডের মধ্যে দিয়ে এসে উত্তর-পূর্ব ভারতে ঢোকার কথা ছিল সেহেতু বাংলাদেশের সম্মতির প্রয়োজন ছিল, যার উপর ভিত্তি করে ভারত-মায়ানমারের মধ্যে গ্যাস আমদানি সংক্রান্ত চুক্তিটি হতে পারে। ভারতের জায়গায় আজ মায়ানমারের সঙ্গে চীনের আগামী তিরিশ বছরের জন্য গ্যাস সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়

যে, মায়ানমারের যে গ্যাস ফিল্ড থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের কথা বলা হয়েছিল, ওই ব্লকের কুড়ি শতাংশের অংশীদার ভারতের রাষ্ট্রীয় সংস্থা 'তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন' (ONGC) এবং দশ শতাংশের অংশীদার 'গ্যাস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড' (GAIL) হওয়া সত্ত্বেও ভারতের এই ব্যর্থতা। অতএব শুধুমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যই নয়, ভারতের 'পূবে তাকাও নীতির' সাফল্যের জন্যও বাংলাদেশের সহযোগিতা ও বাংলাদেশের ভূখণ্ডকে ব্যবসা বাণিজ্যের খাতিরে ব্যবহার করার সুযোগ ভারতের কাছে অত্যন্ত জরুরী। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রাথমিক অবস্থান সম্পর্কে বলতে গেলে দেখা যায় যে— Bangladesh has set strict pre conditions for allowing the one-billon dollar Myanmar-India gas Pipeline to Pass through its territory. Dhaka wants India to agree on giving it transit facility to Nepal, access to hydro-electricity from Nepal and Bhutan and reduction of trade imbalance for Bangladesh to approve of the tripartite pact on the Gas Pipeline.[8] আরো বলা যায় Therefore, this willingness of Bangladesh to allow India access to its river and Bay of Bengal Ports and extend railway links right up to the International fringe line provides the land-Locked northeastern states with an opportunity to look forward to developing close economic ties with the South-East Asian Countries.[৫] এ প্রসঙ্গে মায়ানমার থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পর্কে উল্লেখ্য যে— All this happened despite the fact that Indias ONGC Viedesh Ltd (OVL) and GAIL (India) Ltd, hold 30% Participating interest in this block. Anyhow, Myanmmar Could not be expected to have waited indefinitely for India and Bangladesh to resolve their mutual differences over a project based on sound economic logic but delayed becasue of domestic poilitical compulsions.[৬]

অন্যদিকে চীন-মায়ানমার ঘনিষ্ঠতার প্রেক্ষিতে সুচির ন্যাশনাল লীগকে সমর্থন করে এলেও ৯০-এর মাঝামাঝি থেকে সামরিক সরকারের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে উদ্যোগী হয় ভারত। ভারত জানতো যে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক গ্যাস বা তেল আমদানির ক্ষেত্রে নয়, এশিয়ার অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে চীনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো মায়ানমার। ফলতঃ ভারত কেবল বাণিজ্যের সাথে সাথে উভয়ের সীমান্তে শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে উদ্যোগী হয়নি বরং 'পূবে তাকাও নীতিকে' হাতিয়ার করে মায়ানমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে চেয়েছে। যাইহোক, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগের, বিশেষ করে সড়ক বা রেল পথে যোগাযোগের মাঝখানে রয়েছে মায়ানমার। এই 'Strategic Location'এর কারণেই প্রধানত পূবে তাকাও

নীতিতে মায়ানমার গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়া আছে মায়ানমারের প্রাকৃতিক সম্পদ যার টানে চীন, আমেরিকাসহ অনেক দেশই এ দেশে আরও বেশী বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।

এরই সূত্র ধরে ভারতের তরফ থেকে অনেকগুলি কাজ চলছে মায়ানমারে। যেমন— (১) কালদান-মাল্টিমোডাল প্রজেক্ট— এই প্রকল্প শেষ হলে বন্দর ও সড়কপথে মায়ানমার হয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাওয়া অনেক সহজ হবে। যা বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। (২) ভারতের আধা-সরকারি সংস্থা টেলিকমিউনিকেশনস কনসালট্যান্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড মায়ানমারের ৩২টি শহরে হাইস্পিড ডেটা সংযোগ করার কাজ শেষ করেছে, (৩) ONGC ও GAIL এবং এসার কাজ করছে তেল আর গ্যাস প্রকল্পে; (৪) রেল পরিবহনের উন্নতি আর কোচ, ইঞ্জিন আর যন্ত্রাংশ তৈরীর কাজ করছে রাইটস্; (৫) NHPC যুক্ত রয়েছে একাধিক হাইড্রোইলেকট্রিক প্রকল্পে; (৬) উন্নতমানের ট্রাক কারখানা তৈরীর কাজ করছে টাটা মোটরস্; (৭) ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টার খোলা হচ্ছে একাধিক জায়গায়; (৮) এছাড়াও আছে চালকল তৈরি, বাগানের আনন্দ মন্দিরের মেরামতি, একাধিক হাসপাতালের উন্নতি, ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক স্কুল নতুনভাবে গড়ে তোলা প্রভৃতি।[৭]

এবারে আসা যাক ভারত-মায়ানমারের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের পরিমাণ কতটা সে বিষয়ে। ১৯৮০-৮১তে এর পরিমাণ ছিল ১.২৪ কোটি মার্কিন ডলার, আর ৩০ বছর পর ২০১০-১১তে তা বেড়ে হয়েছে ১০৭.০৯ কোটি মার্কিন ডলার। ভারত মায়ানমার থেকে আমদানি করে মূলত বিনস, ডাল ও বিবিধ বনজ সম্পদ, আর রপ্তানি করে স্টীল সামগ্রী আর ওষুধ। দুই দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ নিম্নোক্ত আকারে দেখলে দেখা যায় যে—

ভারত-মায়ানমার বাণিজ্যের পরিমাণ (কোটি মার্কিন ডলারে)

বছর	ভারতের রপ্তানি	ভারতের আমদানি	মোট বাণিজ্য
২০০৬-০৭	১৪.০০	৭৮.১৯	৯২.১৯
২০০৭-০৮	১৮.৫৪	৮০.৯৯	৯৯.৫৩
২০০৮-০৯	২২.১৬	৯২.৯০	১১৫.০৬
২০০৯-১০	২০.৮০	১২৮.৯৯	১৪৯.৭৯
২০১০-১১	১৯.৪৮	৮৭.৬১	১০৭.০৯
২০১১-১২	২১.৭৭	৭৬.৩৩	৯৮.১০

Source: Myanmar Central Statistical Organisation

ভারত-মায়ানমার সম্পর্ক পূবে তাকাও নীতির একটি বাস্তব প্রতিফলন। তাই একে দীর্ঘস্থায়ী রূপ দিতে গেলে বাংলাদেশের 'Transit facility' আবশ্যক। যা এখনো দ্বি-পাক্ষিক টানাপোড়েনে আটকে রয়েছে। তা সত্ত্বেও মায়ানমারের প্রাকৃতিক গ্যাস যাতে বাংলাদেশের মাধ্যমে পাওয়া যায় সে বিষয়ে ভারত সচেষ্ট ভূমিকা পালনে উদ্যোগী। তার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এভাবে— Exports of natural Gas from Bangladesh could thus, prove to be crucial in meeting regional energy requirements in Southern and Eastern asia in near future. India, for instance, has already taken the initiative in this regard. The Gas Authoriy of India Limited (GAIL) is Currently negotiating with Bangladesh Companies like, Mohona Holdings and Bamco Energy as well as, transnational concerns like the unocal and cairn Energy for a transnational pipeline from Myanmar and Bangladesh to the Eastern States of India and Andra Pradesh.[৮] Another Proposal being considered by Unocal is to link Myanmar with the gas fields in Southern Bangladesh enroute to Haldia in West Bengal (India).[৯]

তাই ভারত-বাংলাদেশ-মায়ানমার ত্রিপাক্ষিক উদ্যোগ যদি কার্যকরী হয় তাহলে ভারতের পূবে তাকাও নীতি একটি যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করবে। তার সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কও ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হবে। সম্ভাবনার দিকটি হলো বাংলাদেশ যদি ভারতের প্রস্তাব মতো মায়ানমার হতে সে দেশের মধ্য দিয়ে গ্যাস পাইপ লাইন ভারতের ভূখন্ডে আনার অনুমতি প্রদান করে এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের "Seven Sister States" গুলোর সাথে সরাসরি যোগাযোগের জন্য 'transit'এর অনুমতি প্রদান করে তা হলে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটতে পারে। ভারতের যে পূর্বাঞ্চলিয় সাতটি রাজ্য রয়েছে এগুলো বাংলাদেশের ভূমি দ্বারা মূল ভারত থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন। এই সাতটি রাজ্য হলো ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল। এ রাজ্যগুলিতে একদিকে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে এবং সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এসকল সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এ অবস্থায় বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন করার জন্য ও দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত-বাংলাদেশের ওপর দিয়ে এই সাতটি রাজ্য বা Seven Sister-এ যাওয়ার ট্রানজিট দাবী করছে দীর্ঘদিন ধরে। বাংলাদেশ এ প্রস্তাব খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলেও তিস্তা জটে তা আটকে রয়েছে। যদিও অতি সম্প্রতি স্থল সীমান্ত চুক্তির বাস্তবায়ন এই সমস্যার সমাধানে খানিকটা সক্ষম হবে কিন্তু পুরো সমাধান সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের চিটাগাং বন্দর ও ভারতের হলদিয়া, পারাদ্বীপ প্রভৃতি

বন্দরগুলো যদি এক দেশ অপর দেশের জন্য উন্মুক্ত করে দেয় তাহলে দ্বি-পাক্ষিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ভারত ব্যবহার করতে আগ্রহী কারণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি থেকে সমুদ্র পথে পণ্য ঐসকল বন্দরে এলে সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আনা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার। এতে ভারতের 'পূবে তাকাও নীতি' অনেকটাই বাস্তবায়িত হবে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে— Several Studies have indicated the Potential development of Bay of Bengal growth Triangle with its apex at Chittagong Port in Bangladesh and extending South West to Calcutta, Madras, and Colombo, and the south eastern arm extending though north-east India into yangon, Thailand and other south-east asian countries.[১০] এভাবে বন্দর ব্যবহার উন্মুক্ত হলে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের প্রসার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেছিলেন— Hasina dismissed criticism on allowing India's access to the Chittagong and Mongla Ports and said: "These are our resources. We can't shut our sources."[১১] তৃতীয়ত, বিমস্টেক (BIMSTEC)কে ব্যবহার করে বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড অক্ষ বা জোট ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে 'transit facility'কে কার্যকর করতে সক্ষম হবে। যার ফলশ্রুতি সম্পর্কে বলতে হয়— Thus, better ties with Bangladesh would refresh relations with a new promise and engage Bangladesh Proactively to secure a violence-free north-east and peaceful borders in the east. In other words, to give Indias nearly two decades of officially declared look East Policy a renewed life, New Delhi must take Dhaka as a co-passenger of its look East Train.[১২] যাকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'Opened a new door' বলা যেতে পারে। এবং বিমস্টেক হলো দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মধ্যে একটি যোগাযোগের সেতু স্বরূপ। যার মূল উদ্দেশ্য হলো— People to People contact has also been identified as a field of cooperation.[১৩] ফলতঃ ভারতের পূবে দেখা নীতি আত্মরক্ষামূলক স্বার্থ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত কৌশলগত প্রশ্নে এক নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে উন্নতি ঘটলে, বাণিজ্যিক লেনদেন ও বিনিয়োগ সমৃদ্ধ হলে, নাগরিকদের যাতায়াত বাড়লে পশ্চিমবঙ্গের কোন ক্ষতি বা বৃদ্ধি নেই। আবার আছেও। পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া যত উন্নত হবে এবং নয়া দিল্লি যত বেশী পূর্বমুখী হবে, পশ্চিমবঙ্গের সুযোগও সেই অনুপাতে বাড়বে। বাণিজ্যের সুযোগ, শিল্পের সুযোগ, যাতায়াতের সুযোগ, এক কথায় সমৃদ্ধির সুযোগ। এবং কলকাতা যে পূর্বের পথে সিংহতোরণ তা প্রমাণিত হবে।

যাইহোক ভারত-বাংলাদেশ দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের মূল্যায়নে বোধ হয় স্বাভাবিকভাবেই আর একটি দেশের নাম এসে পড়ে। সে দেশটি হল চীন। ধীরে ধীরে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে চীনের বন্ধুত্ব ভারতের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত, চীনের 'String of Pearl' নীতির বাস্তব রূপায়নের জন্য চীন যে সব পদক্ষেপ নিয়েছে ভারতের পক্ষে সেগুলি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বিশেষ করে শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপালের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য চীনের আর্থিক অনুদান দেওয়া ভারতের বাড়তি চিন্তার কারণ হয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরের সংস্কার ও তৎসংলগ্ন যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চিনের আর্থিক সাহায্য যে, সে দেশে চিনের প্রভাব অনেকাংশে বাড়িয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, চিনের এই 'String of Pearl' কূটনীতি আসলে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতকে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে রাখার একটা কৌশল। স্বাভাবিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার একটা বৃহত্তর দেশ হিসাবে ভারত যে এতে উদ্বিগ্ন তা বলাই বাহুল্য।

তবে প্রতিবেশী হিসাবে বাংলাদেশের যেমন ভারতকে প্রয়োজন, ভারতের তেমনই বাংলাদেশকে প্রয়োজন। আসলে বাস্তবে আমরা তো আমাদের প্রতিবেশীদের নিজের ইচ্ছানুসারে মনোনয়ন করতে পারি না, ভৌগলিক অবস্থানের নিরিখেই তারা আমাদের প্রতিবেশী হয়। এ অবস্থায় কোন দেশের সঙ্গে কেমন ধরনের নীতি নেওয়া হবে তার একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক। সেই পারস্পরিক সম্পর্কের আবার সু-সময় ও দুঃসময়ের পর্ব থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার চল্লিশ বছরের মাথায় কি তবে দু-দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের সুদিন উপস্থিত?

অন্যদিকে কৌশলগত প্রশ্নে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ভারত পিছিয়ে থাকবেই, কেননা চীনের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে রয়েছে ভারতের আধিপত্যকামী ভূমিকা সম্পর্কে এই অঞ্চলের রাষ্ট্রবর্গের এক জাতীয় মানসিক ভিতি যেখানে 'গুজরাল ডকট্রিন'ও পরাজয় স্বীকার করেছে। অর্থাৎ ভারতের নিরাপত্তাজনিত স্বার্থের দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সমান গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি ভারতের অনুকূলে না হলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট ইতিবাচক। দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের ভূমিকার প্রেক্ষিতে নিতান্তই আত্মরক্ষার জন্য ভারতের উচিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় যতটা সম্ভব কৌশলগত স্বার্থরক্ষা করা— ফলতঃ কৌশলগত স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় পূবে তাকাও নীতির প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে— যা প্রয়োজন তা হলো, এই নীতির ধারাবাহিকতা যথাযথভাবে বজায় রাখা।

অতএব, দক্ষিণ পূর্ব এবং দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়াতে আঞ্চলিক রাজনীতির প্রচলিত সমীকরণে রদবদলের সম্ভাবনা দেখা দিলেও তার সুযোগ নিতে গেলে নয়া দিল্লির সতর্ক অথচ দৃপ্ত পদক্ষেপ জরুরী। কথা দিয়ে সময়ে কথা না রাখতে পারলে প্রতিবেশীদের মন জয় করা দুরুহ। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে পাওয়া প্রতিশ্রুতি রূপায়ন হল কিনা, নজর দেওয়া দরকার সেই দিকেও। বাস্তব হল, নিজে গণতন্ত্রী হলেও নয়াদিল্লি তার প্রতিবেশী অগণতান্ত্রিক শাসকদের সঙ্গে বহুক্ষেত্রে বেশী স্বচ্ছন্দবোধ করেন। তাছাড়া, ভারতের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি সংকটের নিরিখে এবং জ্বালানী ক্ষেত্রে চীন ও ভারত প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠায় ভারতের আর্থিক বিকাশের ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে গেলে ভারতীয় কূটনীতিকে অচিরেই আরো অনেক বড় পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন— The first and foremost task, therefore, would be to make the ‘look East” Policy more result oriented focussing on the identified mutual agenda and sustaining the relationship through periodic visits at the highest Political and ministerial levels.[১৪]

পরিশেষে একথা বলা প্রয়োজন যে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে স্থায়ী ও সুস্থ রূপ দিতে প্রয়োজন— প্রথমতঃ আঞ্চলিক শান্তি ও সুস্থিতি স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ; দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি; তৃতীয়তঃ ভারত-এশিয়ান নয়া সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উভয়দেশের জনগনের মধ্যে যোগযোগ বৃদ্ধি তথা উভয় দেশের যুবক, সাংবাদিক, শিক্ষক-অধ্যাপক, ব্যবাসায়ী, সরকারী আধিকারিক ও শিল্পীদের মধ্যে যৌথ উদ্যোগ ও বিনিময় পরিকল্পনা গ্রহণ। তবেই পূবে তাকাও নীতির প্রেক্ষাপটে সম্পর্ক ঐতিহাসিক রূপ লাভ করতে পারে। যা সম্ভবপর হবে কয়েকটি শর্তের প্রেক্ষাপটে। সেগুলি হলো— First is the signaling of Political will at home on transforming India’s regional policies; second is the importance of institutionalising routine high level engagement with the neighbours; third, beyond the political will, India must find ways to bring synergies to the whole range of domestic institutions that have stakes in a productive relationship with the neighbours.[১৫]

এভাবে সম্পর্কের ধারাবাহিক অগ্রগতি থাকলেও ভারত-বাংলাদেশ-আশিয়ান— বিমস্টেক সংযুক্ত দক্ষিণ এশিয়া তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য থেকে ভ্রমণ পিপাসু জনগণের সংযোগ সাধন যেমন ঘটাতে সক্ষম হবে তেমনি কৌশলগত দৃষ্টিতে ভারতের পূবে তাকাও নীতি ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। তাই বহুত্ববাদী বিদেশনীতির প্রেক্ষিতে উভয় দেশকে যে নীতি মেনে চলতে

হবে তা হল এক দেশ অন্যদেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, আলোচনার পথ প্রশস্ত করবে যা সমৃদ্ধি, সুরক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার নতুন বাতাবরণ তৈরি করতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র

১. Chattopadhyay Annek- “Thanda yuddha uttar Antarjatik Samparka’, Paschimbanga Rajya Pustak Parsad, Kolkata, 2005, p. 115.

২. Naidu G.V.C.- “India and South-East Asia: An Analysis of the look East Policy” in P.V.Rao (ed.) *India and ASEAN Partners at summit*, KW Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 2008, p. 140

৩. Ibid, p. 140

৪. News Behind the News, 21st March, 2005.

৫. Prof. Chakraborty Tridib- “Seikh Hasina’s India Mssion : From Distance to Proximity”in *world focus*, No. 362, Feb 2010, New Delhi, 2010, p. 40.

৬. Ibid.

৭. Nag Nirmalya- “Myanmar: Past, Present, Future”in *Yojana*, Sep 2012, Central Information and Broadcasting Division, New Delhi, 2012, p. 43

৮. Lama Mahendra P, “Economic Reforms and the Economic sector in South Asia: Scope for cross Border Power Trade”, in *South Asian Survery*, Vol. 7, No. 1, Jan-June 2000, Sage Publication, New Delhi, 2000, p. 21.

৯. Ibid.

১০. Chakraborty Shantanu- “Cooperatin in South Asia- The Indian Perspective”, K.P.Bagchi & Company, Kolkata, 2008, p. 109.

১১. The Statesman, 14th Jan, 2010.

১২. Op.cit, No. 5, p. 40

১৩. Khan Abdur Rob (ed.)- “Towards BIMSTEC-Japan Comprehensive Economic cooperation- Bangladesh Perspective”BIISS, Dhaka, 2012, p.1

১৪. Sahai Paramjit- “Summitry in India-ASEAN Relations”in P.V.Rao (ed.)- *India and*

ASEAN Partners at Summit, KW Puslishers Pvt Ltd. New Delhi, 2008, p. 95.

১৫. Raja Mohan C.— "India's Neighbourhood Policy: Four Dimensions" in *Indian foreign affairs journal*, Vol. 2, No. 1, Jan-Mar 2007, Cambridge University Press India Pvt. Ltd., New Delhi, 2007, p.10.

উপসংহার

প্রাথমিকভাবে উপসংহারে গবেষণা প্রকল্পে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর খোঁজা আবশ্যক। গবেষণা প্রকল্পে উত্থাপিত প্রথম প্রশ্ন কোন আমলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি উন্নত ও গঠনমূলক হয়েছে? এক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে গিয়ে NDA ও UPA আমলের সামগ্রিক তুলনা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে NDA আমলে বাংলাদেশের ভারতবিরোধী অবস্থানসহ বহুমুখী সম্পর্কে সমস্যার ব্যাপ্তি বা তিক্ততা লক্ষ্য করা যায়। ফলে UPA আমলে তা খানিকাট কাটিয়ে উঠে সামগ্রিক দিক থেকে সম্পর্ককে উন্নত ও গঠনমূলকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হয় দুই দেশ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ট্রানজিট সমস্যা মিটে গেলে ভারতের উত্তর পূর্বে অবস্থিত সাতটি রাজ্য কতটা উপকৃত হবে? এক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ট্রানজিট সমস্যা বর্তমানেও মেটেনি। উত্তরপূর্ব ভারতের 'Seven sister states' গুলোর সাথে সরাসরি যোগাযোগের জন্য 'transit' বা 'স্থলপথ পরিবহন' এর ব্যবহার করতে বাংলাদেশ অনুমতি প্রদান করলে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটতে পারে। এই রাজ্যগুলিতে একদিকে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ যা সুষ্ঠু যোগাযোগের অভাবে সম্পদের যথাযথ ও দ্রুত ব্যবহার করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন করার জন্য ও দ্রুত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত-বাংলাদেশের ওপর দিয়ে সাতটি রাজ্য বা Seven sister State এ যাওয়ার ট্রানজিট দাবী করছে দীর্ঘদিন ধরে। সম্যসা খতিয়ে দেখার অশ্বাস দিয়েছে বাংলাদেশ। ফলে সমস্যা যদি মিটে যায় ভারত সত্যিই উপকৃত হবে।

তৃতীয় প্রশ্ন ভারত-মায়ানমার গ্যাস পাইপ লাইন বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে হওয়া আদৌ কি সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে 'পূবে তাকাও নীতির অংশ হিসাবে ভারত-মায়ানমারের কাছ থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির যে পরিকল্পনা করেছিল বাংলাদেশ সরকারের অসহযোগিতায় ও ভারত সরকারের কূটনৈতিক ব্যর্থতার জন্য, আজও তা সুদূর অতীত। মায়ানমার থেকে ভারতে গ্যাস আমদানির জন্য পরিকল্পিত পাইপলাইনটি যেহেতু বাংলাদেশের ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে এসে উত্তর পূর্ব ভারতে ঢোকার কথা ছিল সেহেতু বাংলাদেশের সম্মতির প্রয়োজন ছিল, যার উপর ভিত্তি করে ভারত-মায়ানমারের মধ্যে গ্যাস সরবরাহের চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে।

চতুর্থ প্রশ্ন শক্তিক্ষেত্রে (Power Sector) উভয় দেশের অবস্থান কিরকম? শক্তিক্ষেত্রে উভয়

দেশের অবস্থান সহযোগিতামূলক। ২০১০ সালে ভারতের Power Grid Corporation of India Ltd (PGCIL) ও Bangladesh Power Development Board (BPDB) র মধ্যে ৩৫ বছরের বিদ্যুৎ সরবরাহ চুক্তি হয়েছে। খুলনাতে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শিল্প গড়ে তোলার জন্য ভারতের NTPC ও বাংলাদেশের BPDB চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। আশুগঞ্জের মাধ্যমে পালটানা বিদ্যু প্রকল্পে জ্বালানী সরবরাহের জন্য MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ পাঠাতে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে ৪০০ কেভির সাবস্টেশন তৈরি করেছে PGCIL। বাংলাদেশের দিকে সাবস্টেশনটি হয়েছে ভেড়ামারায়। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রকের এক কর্তার কথায় এই মুহূর্তে বাংলাদেশ ১৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নিতে পারছে। ২০১৪ সালে ভারত পালটানা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে চুক্তি হয়।

পঞ্চম প্রশ্নটি হলো সীমান্ত সমস্যা সমাধানে উভয় দেশ কতটা বদ্ধপরিকর? এক্ষেত্রে স্থলসীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যকর হওয়ার পর ছিটমহল সমস্যা অনেকটাই মিটে গিয়েছে। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের সীমানায় অবস্থিত দক্ষিণ তালপটি বা নিউম্যুর দ্বীপ নিয়ে উভয়ের মধ্যে সমস্যা বিদ্যমান। সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়া, বে-আইনি অনুপ্রবেশ, চোরচালান বা পাচার, সীমান্ত সন্ত্রাস প্রভৃতি এখনও বিদ্যমান। এবিষয়ে উভয়ে বহু পদক্ষেপ নিলেও সমস্ত সমস্যার নিরসন সম্ভব হয়নি।

ষষ্ঠ প্রশ্ন সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে উভয়দেশের বাস্তবধর্মী অবস্থান কি? সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে ভারতের অবস্থান হলো একে প্রতিহত করতে হবে এবং নির্মূল করার দিকে এগোতে হবে। উভয়দেশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপনা করলেও বাংলাদেশের সমরতন্ত্রী মৌলবাদী সমাজ বিভিন্ন সময় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং বাংলাদেশকে সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘরে পরিণত করে। বাংলাদেশের মাটিতে উত্তরপূর্বের জঙ্গীদের আশ্রয়দান, জামাতে ইসলামী, জামাতুল মুজাহিদ্দিন, আলকায়দা প্রভৃতির বাড়বাড়ন্ত ভারতের আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান ISI র মাধ্যমে বাংলাদেশ হয়ে ভারতে সন্ত্রাস চালানোর চেষ্টা করে। আরবের ব্যাঙ্কগুলি বাংলাদেশের জঙ্গীদের অর্থসাহায্য করে ফলে বাংলাদেশ 'Cocoon of terror' -এ পরিণত হয়েছে। যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করছে বাংলাদেশ। তবে দুই দেশের সদর্থক ও কৌশলগত নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

সপ্তম প্রশ্ন বাংলাদেশ কি ভারতের উপর নির্ভরশীল? এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বহুমাত্রিকভাবে

ভারতের উপর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি দিক থেকে বাংলাদেশ অবশ্যই ভারতের উপর নির্ভরশীল।

অষ্টম প্রশ্ন ছিল শিশু, নারী ও মাদক পাচার ও চোরাচালানের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ এগিয়ে। তাই এটা কি রদ করা সম্ভব? এ প্রসঙ্গে বলা যায় বাংলাদেশের জনগণের দারিদ্র্য, সামাজিক অসাম্য ও লিঙ্গ বৈষম্য, অশিক্ষা, সচেতনতার অভাবের দরুন আন্তর্জাতিক পাচারচক্র শিশু ও নারীদের উন্নত জীবন যাপনের লোভ দেখানো, কাজ পাইয়ে দেওয়ায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফুঁসলিয়ে নিয়ে এসে এবং পরে তাদের উপর যৌন শোষণ, দেহব্যবসায় বাধ্য করা, গৃহবন্দী করে শ্রম করতে বাধ্য করা ও নানা অত্যাচার শুরু হয়। UNICEF-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিমাসে ৪০০ শিশু ও নারী শেষ দশবছরে ভারতে পাচার হয়ে এসেছে। এবং প্রায় ২০০০০০ যুবতী পাকিস্তানে বিক্রি হয়েছে। এইভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে নারী ও শিশু পাচার নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি ভয়াবহ সমস্যা। মাদক চোরাচালানের ক্ষেত্রে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলি বাংলাদেশকে করিডর হিসাবে ব্যবহার করে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা মাদক পাচারের বা স্মাগলিং এর কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হয়। চট্টগ্রাম বন্দর এলাকা দিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বে মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড এবং ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত এলাকা মারফৎ দিল্লী ও মুম্বাইতে বে-আইনী মাদক প্রবাহ অব্যাহত। বাংলাদেশ থেকে তাজাকিস্তান হলো মাদক চোরাচালানের পথ এবং আফগানিস্তান থেকে বিশ্বের ৭৭% মাদক বা আফিং পাচার হয় বিদেশে।

প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা, সমুদ্র বন্দর ও বিমান বন্দরগুলির নমনীয় তল্লাসী ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণভাবে দায়ী। তাই উভয়দেশের যৌথ পদক্ষেপ হলো Confindence Building Measures (CBM)। এতদসত্ত্বেও SAARC এর ঘোষিত নীতি এই ইস্যুতে পুরোপুরি কার্যকর হয়নি। ফলে এই সমস্যা পুরোপুরি রদ করা সম্ভব নয়।

পরের প্রশ্নগুলি হলো 'Noman Lands' গুলো বর্তমানে কিভাবে ব্যবহৃত হয়? ছিটমহল অঞ্চলে যারা বাসিন্দা তাদের নাগরিকত্ব কোন দেশের? এবং সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে জীবনযাপন করে? বর্তমান স্থলসীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যকর হওয়ার ফলে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির প্রাসঙ্গিকতা হ্রাস পেয়েছে। কারণ ছিটমহল বিনিময় হওয়ায় ফলে ছিটমহলের বাসিন্দাদের নাগরিকত্ব সুনিশ্চিত হয়েছে। ফলে তারা তাদের দেশের সংবিধান স্বীকৃত অধিকার পেয়েছে এবং সুস্থ জীবনযাপনে রত হয়েছে।

পরবর্তী প্রশ্ন ছিল বিগত দুই দশকে ভারত ও বাংলাদেশে যে নির্বাচন হয়েছে সেক্ষেত্রে উভয়দেশের নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহার কতটা সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী? এ প্রসঙ্গে বিসদ তথ্য সংগৃহীত না হওয়ায় যথাযোগ্য উত্তর বা বিশ্লেষণ সম্ভব নয়।

পরবর্তী প্রশ্ন ছিল বাংলাদেশের ধর্মীয় মৌলবাদী সংবিধান পরিবর্তিত হয়ে সম্প্রতি ধর্মনিরপেক্ষ হলেও বৌদ্ধ হিন্দু খ্রিস্টান পরিষদের পক্ষে তা কতটা কার্যকর?

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে খালেদাজিয়া সরকারের আমলে সংখ্যালঘুরা নিরাপদে থাকতে পারেনি। ২০০১ সালে বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ প্রসঙ্গে শাহরিয়ার কবির বলেছিলেন— ''এবার নির্বাচনের আড়াই মাস আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বগ্রহণের দিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সারা দেশে হিন্দু অধ্যুষিত জনপদসমূহে যে নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ঘটনাবলী আমরা প্রত্যক্ষ করেছি নিঃসন্দেহে তা বাংলাদেশকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মতো একটি মনোলিথিক ইসলামিক দেশে পরিণত করার সুদুরপ্রসারী চক্রান্তের অর্ন্তগত''। এছাড়া বাংলাদেশের সমরতন্ত্রী মৌলবাদী সমাজ হিন্দুবৌদ্ধ খ্রীস্ট্রানদের ওপর নির্যাতন ও অত্যাচার চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে হাসিনার সরকার সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকালপালন করেছে ও করে চলেছে।

পরের প্রশ্ন উদ্বাস্তু সমস্যাকে ভারত কিভাবে দেখছে? ভারত— বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক অন্যতম দিক নির্ধারণকারী সমস্যা হল উদ্বাস্তু বা অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে সমস্যা। ঐতিহ্যগতভাবে ভারতে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু আগমন ধারাবাহিকভাবে প্রমাণিত। এই উদ্বাস্তু আগমন বা অনুপ্রবেশের পেছনে রয়েছে উভয় দেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বাতাবরণ তথা সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ধর্ম ও বর্ণগত এবং ভাষাগত অভিন্নতা ও যোগ। তাই দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগত অনুপ্রবেশকারী বা উদ্বাস্তুর সংখ্যা ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভীতির কারণ তথা উদ্বেগজনক। এ প্রসঙ্গে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এক জনস্বার্থ সংক্রান্ত মামলায় রায় দিতে গিয়ে বলেছিল ''বাংলাদেশী উদ্বাস্তুরা ভারতীয় অর্থনীতি তথা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভীতির বা উদ্বেগের, এই সমস্যা যদি অতিসত্ত্বর সমাধান না করা হয় তবে তা দেশের পক্ষে অধিকতর মন্দ অবস্থার সৃষ্টি হবে।''

অন্যদিকে ভারতে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যগুলির রাজনৈতিক দলগুলি মূলতঃ শাসকদলগুলি তাদের ভোটের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য রেশন কার্ডও ভোটার পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করে। ফলে উদ্বাস্তু বা অনুপ্রবেশকারীরা রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বা বৈধতা পায় যা ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জনসংখ্যাবৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম। মহারাষ্ট্র সরকার এই উদ্বাস্তুদের চিহ্নিত করে ফেরৎ পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। ফলতঃ ভারতের সমাজ-অর্থনীতি ও রাজনীতিতে এর প্রভাব পড়তে বাধ্য যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

পরের প্রশ্ন ছিল সম্পর্কের নিরিখে উভয় দেশের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষিত হচ্ছে তো? এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে উভয় রাষ্ট্র উভয়ের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় তৎপর। কিন্তু ভারতের বৃহৎ আকার বাংলাদেশীদের কাছে ভীতির কারণ। দুই, ভারতের বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসানো বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জর সম্মুখীন করেছে। তিন, জলবন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য বাংলাদেশের অসন্তোষ বৃদ্ধি করেছে। চার, উদ্বাস্তু বা অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, শিশু ও নারী পাচার, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বাড়বাড়ন্ত দুই দেশের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ এবং নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে চলেছে। পাঁচ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রের সঙ্গে যে সন্ধি বা চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে তা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করছে।

পরের প্রশ্ন হলো ভারত-বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক People to People Contact তৈরি করতে কতটা বদ্ধপরিকর? এক্ষেত্রে উভয়দেশের মধ্যে ছাত্র বিনিময় ও গবেষণা ক্ষেত্রে উন্নয়ন, বাংলাদেশের শিক্ষক ও প্রযুক্তিকর্মীদের প্রশিক্ষণ, রেল ও বাস যোগাযোগ বৃদ্ধি, ICCR ও. IGCC তৈরির মাধ্যমে সঙ্গীত, নৃত্যকলা ও নাটক পরিবেশনা, রবীন্দ্রনাথের ১৫০তম জন্মদিবস উৎযাপন, বাংলাদেশ কর্তৃক ভারতকে 'পদ্মা ও চপলা' নামক নৌকা উপহার, সর্বোপরি দুইদেশের সাংবাদিক, চলচ্চিত্র পরিচালক, বুদ্ধিজীবীদের বিনিময় গভীর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

পরের প্রশ্ন হলো ভারত ও বাংলাদেশ উভয়ে SAARC কে কিভাবে ব্যবহার করে? এই দুটি দেশ পারস্পরিক ক্ষেত্রে উভয় দেশের জনগণের মানোন্নয়নের জন্য বন্ধুত্ব সহযোগিতার পথকে দৃঢ়তর করতে সার্ককে ব্যবহার করে। উভয়দেশের জনগণের গুণগত মানবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে নতুন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা গড়ে তোলা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়ার সমৃদ্ধি এবং উভয় দেশের

বহুসংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজের প্রাকৃতিক মেধাকে বহুমুখী কর্মশক্তিসম্পন্ন করে তোলাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এটাকে দক্ষিণ এশিয়াতে ভারত ও বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নত করার মাধ্যমে বিদেশনীতির নীতিগত পরিবর্তন সূচিত করতে পেরেছে।

পরের প্রশ্ন হলো BIMSTEC এর মতো আঞ্চলিক সংগঠনে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারতকে কতটা সাহায্য করবে? প্রথমত, বিমস্টেকের মাধ্যমে ভারতকে বাংলাদেশ সহযোগীতা করতে চায়নি। তার প্রথম উদাহরণ হলো মায়ানমার থেকে বাংলাদেশ হয়ে ভারতে গ্যাস পাইপলাইন আনার অনুমতি দেয়নি বাংলাদেশ। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম সংগঠন হলো বিমস্টেক, যার মাধ্যমে ভারত তার 'পূবে তাকাও নীতি'কে বাস্তবায়িত করতে চায় তা বাংলাদেশের প্রতিবন্ধকতায় সম্ভব হয়নি। তৃতীয়ত, ভারত-মায়ানমারের মধ্যে বাংলাদেশের ট্রানজিট ব্যবহার খুবই জরুরী, যার দরুন বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটতে পারে। তা বাংলাদেশ দেয়নি। ফলে ভারতের উত্তরপূর্বসহ মায়ানমারের সঙ্গে যোগাযোগ ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়।

পরের প্রশ্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশ ভারতকে কতটা সমর্থন করে? আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশ ভারতকে কখনও সমর্থন করেছে। কখনও বিদ্বেষ উগরে দিয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবে চড়াই উতরাইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের অবস্থান প্রতীয়মান হয়েছে। যেমন পোখরান-II কে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মঞ্চে সমর্থন করলেও জলবন্টনের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে UNO র ট্রাইবুনালে অভিযোগ জানিয়েছে বাংলাদেশ। তাই এক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার জাতীয় স্বার্থরক্ষায় মিশ্র অবস্থান গ্রহণ করে।

পরের প্রশ্ন উভয় দেশ উভয়ের আশাপূরণ করতে কতটা সক্ষম? তবে প্রতিবেশী হিসাবে বাংলাদেশের যেমন ভারতকে প্রয়োজন, ভারতেরও তেমনি বাংলাদেশকে প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের প্রতিবেশীদের নিজের ইচ্ছানুসারে মনোনয়ন করতে পারিনা, ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখেই তারা আমাদের প্রতিবেশী হয়। এ অবস্থায় কোন দেশের সঙ্গে কেমন ধরনের নীতি নেওয়া হবে তার একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা থাকা দরকার। সেই পারস্পরিক সম্পর্কের আবার সুসময় ও দুঃসময়ের পর্ব থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার চল্লিশ বছরের মাথায় কি তবে দুদেশের পারস্পরিক সম্পর্কের সুদিন উপস্থিত? এক্ষেত্রে সীমান্ত সমস্যা, জলবন্টন সমস্যা, সন্ত্রাসবাদকে কেন্দ্র করে সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, নারী শিশু ও মাদর পাচারকে কেন্দ্র করে সমস্যায় উভয়ে উভয়ের আশাপূরণ করতে পারেনি। কিন্তু বহু বিষয়ে উভয়দেশ সদর্থক গঠনমূলক সম্পর্ক নির্ধারণ করেছে। ফলে সব আশা পূরণ করতে

কোন পক্ষই পারেনি।

অন্তিম প্রশ্ন ছিল ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গণ প্রজাতন্ত্রী চীন ও পাকিস্তান কি দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে? প্রথমত, তিনটি দেশই মনে করে ভারত বাংলাদেশের ওপর আধিপত্যকারী ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের ভারতবিরোধী অবস্থান বাংলাদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালায়।

তৃতীয়ত, দক্ষিণ ভারতে চীনের প্রভাববৃদ্ধি উদ্বেগের কারণ। তাই 'String of Pearl' এর মাধ্যমে ভারতকে ঘিরে ফেলার চক্রান্ত ভারতকে সতর্ক ও কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

চতুর্থত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ভারতের উপর অধিক কার্যকর হলেও বাংলাদেশের প্রতি দৃষ্টি আছে। তবে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

পঞ্চমত, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে USA বা PRC র ভূমিকা বা দৃষ্টিভঙ্গী মূলত বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের ভূমিকার প্রেক্ষিতে নিতান্তই আত্মরক্ষার জন্য ভারতের উচিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যতটা সম্ভব কৌশলগত স্বার্থরক্ষা করা।

সামগ্রিকভাবে উপরোক্ত অধ্যায়গুলির বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনার মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা (NDA) ও সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা (UPA) আমলের তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে উভয় সরকারের আমলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক, সামরিক সম্পর্কগুলির উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হয়। এছাড়া উভয়দেশের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা কতটা সমাধান হয়েছে তার আলোচনাও আবশ্যিক। এইভাবে বহুমুখী সম্পর্কের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বহুত্ববাদী, বহুসংস্কৃতিসম্পন্ন, যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোকে উভয় রাষ্ট্র কিভাবে দেখছে তার রূপরেখা নিম্নোক্ত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

১।রাজনৈতিক সম্পর্ক : জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকারের আমলে রাজনৈতিক সফরের ক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায় যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন মোট ০৭ জন বাংলাদেশের মন্ত্রী ও সচীব। অন্যদিকে ভারত থেকে বাংলাদেশ গিয়েছেন ভারতের ০৬ জন মন্ত্রী ও সচীব। যার মধ্যে ১৯৯৯ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর ঢাকা সফর ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চারটি চুক্তি উভয় দেশ স্বাক্ষর করে— (i) ১৯৯১

সলে ঢাকা কোলকাতা বাস পরিষেবা চুক্তি; (ii) ২০০১ সালে যাত্রীবাহী রেল পরিষেবা চুক্তি; (iii) ঢাকা-আগরতলা বাস পরিষেবা চুক্তি, (iv) ২০০২ সালে মাদক চোরাচালন রোধ চুক্তি। আবার যৌথ বৈঠক হয়েছে ১১টি এছাড়া উভয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানগণ ১৯৯৯ সালে ডারবানে একটি বৈঠক করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায় যে ১৯৯৮-২০০৪ সাল পর্যন্ত দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক সম্পর্ক একটা সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল।

কিন্তু ১৯৯৮-২০০৪ এই সময়সীমাতে NDA সরকারের আমলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে দুটি সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে প্রাথমিক পর্বে ১৯৯৮-২০০১ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনা ওয়াজেদ এর সরকার ভারতের সঙ্গে কৌশলগতভাবে সহযোগী প্রতিবেশী হিসাবে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিল। ভারত-বিরোধী জঙ্গী শিবির ধ্বংস করা, অনুপ চেটিয়াকে গ্রেপ্তার করা, ইসলামী মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও দমন করা হাসিনার সদর্থক বিদেশনীতির সাফল্য। পরবর্তীকালে ২০০১-২০০৪ সাল পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়া ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়নে যতটা না তৎপর ছিলেন তার থেকে ভারত বিরোধী অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে মৌলবাদের হাত শক্ত করেছিলেন। বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জঙ্গীদের নিরাপদ আশ্রয় প্রদান, আলকায়দাসহ ইসলামিক দুনিয়ার জঙ্গী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহদান ও আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ, পাকিস্তানমুখী বিদেশনীতি নির্ধারণ, অস্ত্র-মাদক চোরাচালানের স্বীকৃতি প্রভৃতির মাধ্যমে BNP জোট সরকার পাকিস্তানমুখী বিদেশনীতি ও ভারত বিদ্বেষী অবস্থানকে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

তাই উক্ত সময়ে ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকারের অবস্থান ছিল— প্রথমতঃ বাংলাদেশ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হওয়ার দরুণ তার সঙ্গে কৌশলগত ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সচেতনতা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ভারতের বিদেশমন্ত্রী যশবন্ত সিংহ বাংলাদেশ সফরে গিয়ে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সম্পর্ক স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ করে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তৃতীয়তঃ ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে উচ্চপর্যায়ের তীক্ষ্ণ প্রখরতা ও সতর্কতার সহিত কাজ করতে বলা হয়েছিল। চতুর্থতঃ উক্ত সময়ের দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সমাধানে ভারতের NDA সরকার শক্তিশালী সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। পঞ্চমতঃ বাংলাদেশ সম্পর্কে কঠোর বাস্তববাদী বিদেশনীতি অনুসরণ ছিল NDA সরকারের লক্ষ্য। দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে বাংলাদেশের ওপর ভারতের নজর ছিল সন্দেহজনক অবস্থানে। তা সত্ত্বেও কৌশলগত সমঝোতার প্রশ্নে বাজপেয়ীর সরকার সুদৃঢ়

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ঐতিহ্য ও পরম্পরা বজায় রেখেছিল। ভারত তার নিকটতম প্রতিবেশীর উপর 'ভারতীয় আধিপত্যকে' অপ্রত্যক্ষভাবে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

❖ অন্যদিকে সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা সরকারের .(UPA) আমলে রাজনৈতিক সফরের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায় বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন ৪৩ জন মন্ত্রী ও সচীব ও বিভিন্ন পদাধিকারী এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী এসেছেন ৪ বার, অন্যান্য মন্ত্রীরা ২৪ জন, সচীব ০৩ জন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ১ জন এবং রাষ্ট্রপতি-০১ জন, স্পীকার-২জন ও বিরোধী দলনেত্রী এসেছেন ১বার। আর ভারত থেকে বাংলাদেশে গিয়েছেন মোট ৩১ জন মন্ত্রী, সচীব ও বিভিন্ন পদাধিকারী। তারমধ্যে প্রধানমন্ত্রী গিয়েছেন ২ বার, অন্যান্য মন্ত্রীরা ২৩ বার, সচিব-২ বার ও রাষ্ট্রপতি গিয়েছেন ১ বার। এছাড়া যৌথ বৈঠক হয়েছে ৪২ টি এবং বিদেশে রাষ্ট্রনায়ক পর্যায়ের বৈঠক হয়েছে ৭ বার এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল প্রায় ১৮টি। সামগ্রিকভাবে তাই UPA সময়কালে ভারত-বাংলাদেশ রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল গঠনমূলক সহযোগিতার অধ্যায়।

উক্ত সময়কালে UPA -I সরকারের সময় প্রথমদিকে বাংলাদেশে খালেদা জিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল সন্দেহের আবহে প্রবাহিত। এই সময় ফারাক্কার জল ছাড়া নিয়ে অস্থিরতা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করা বা অসমের আলফা নেতা অনুপ চেটিয়াকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়া নিয়ে টালবাহানা, অনুপ্রবেশ সমস্যার সমাধানে অনীহা, উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনগুলির নেতাদের বাংলাদেশে আশ্রয় দান এবং ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ শিবির চালানো— সবকটি ব্যাপারই ইঙ্গিত করেছিল যে সম্পর্কের তাঁর বেশ উঁচুতে বাঁধা। পরবর্তীসময়ে ভারত অস্থিতিশীল প্রতিবেশী বাংলাদেশের তদারকী সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক দায়িত্বশীলতার পরিচয় ভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে তৎপর হয়। শেষপর্যায়ে হাসিনার সঙ্গে UPA সরকারের রাজনৈতিক সম্পর্ক একটা চরম মাত্রা লাভ করে। পাকিস্তান বা চিনের মতো দেশ যাতে বাংলাদেশকে ব্যবহার করতে না পারে, তারজন্য দুই দেশের রাজনৈতিক ঐক্যকে স্থায়ী রূপ দেওয়াটা মনমোহন সরকারের লক্ষ্যে পরিণত হয়।

প্রকৃতপক্ষে সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা (UPA) সরকারের আমলে বাংলাদেশ সম্পর্কে অবস্থানটি ছিল খুবই সদর্থক। প্রথমতঃ ভারত বাংলাদেশকে 'Most favoured Nations' -এর বা 'সর্বোচ্চ সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ' এর মর্যাদা দিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, ভারত তার অভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব বজায় রেখে প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে শান্তি ও মৈত্রীর রাজনৈতিক সম্পর্ককে সুসংহত করতে চেয়েছিল। তৃতীয়তঃ

দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে বহুমুখী ও বহুমাত্রিক করে তুলেছিল ভারত। চতুর্থতঃ ভারতের বহু প্রত্যাশা বাংলাদেশের কাছে থাকলেও তা সবটা পূরণ হয়নি এ বিষয়ে ভারত নমনীয় অবস্থান নিয়েছিল। পঞ্চমতঃ বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাকে বজায় রাখতে UPA সরকার সক্রিয় পদক্ষেপ বা ভূমিকা নিয়েছিল। ষষ্ঠতঃ ভারত-বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে 'Federal Diplomacy' বা যুক্তরাষ্ট্রীয় কূটনীতির ব্যবহারকে দৃঢ়তর করেছিল। সপ্তমতঃ ভারত 'গণতান্ত্রিক শান্তি' বা 'Democratic Peace' এর ধারণা অর্থাৎ উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে। এই তত্ত্বকে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছিল। অষ্টমতঃ 'Track-II diplomancy' কে কাজে লাগিয়ে দ্বিপাক্ষিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিল ভারত। নবমতঃ পাকিস্তান বা চীনের প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করে ভারতমুখী বিদেশনীতি প্রনয়নে বাধ্য করেছিল যার ফলে ভারত তার আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে জি পার্থসারথীর বক্তব্য হলো— 'has to be strong enough to withstand Changes in government on both sides'. [১] যারফলে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে গড়ে উঠেছিল।

২।অর্থনৈতিক সম্পর্ক : জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকারের সময় ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য ঘাটতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। জাতিরাষ্ট্র সমূহের সংহতির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের মাধ্যমে করা যেতে পারে। কিন্তু ভারত-বাংলাদেশ শান্তি প্রক্রিয়ায় বাণিজ্যিক লেনদেনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তা দ্বি-পাক্ষিক সেতুবন্ধনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক হিসেবে অনেকাংশেই দেখা দেয়নি। বাংলাদেশ এখন অন্যান্য দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়িয়ে নেওয়ায় এ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আবার ভারতের ব্যবসায়ীগণও বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য করার উৎসাহ হারাচ্ছে সে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত 'হরতাল ভিত্তিক রাজনীতির কারণে'। ফলতঃ বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। এই বাণিজ্য ঘাটতি নিম্নোক্ত আকারে দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

UPA আমলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ধারা (মিলিয়ান ডলারের হিসাবে)

সাল	বাংলাদেশ কর্তৃক আমদানীযোগ্য	বাংলাদেশ কর্তৃক রপ্তানীযোগ্য	বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি ও ঘাটতির পরিমাণ
১৯৯৮-৯৯	১২৩১.৬১	৫৯.৭৯	-১১৭১.৮২

১৯৯৯-২০০০	৮১৭.৩৭	৬৪.৮৮	-৭৫২.৪৯
২০০০-২০০১	১১৭১.৩	৬২.২৮	-১১০৯.০৫
২০০১-২০০২	১০২২.০০	৫০.২৮	-৯৭১.৭২
২০০২-২০০৩	১৩৫৭.৭৯	৮৩.৬১	-১২৭৪.১৮
২০০৩-২০০৪	২০৯২.৬৩	৮৯.৩২	-২০০৩.৩১

উপরোক্ত টেবিলের তথ্য প্রমাণ করে যে NDA সরকারের আমলে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য ঘাটতির বা ভারসাম্যের ধারাবাহিক রূপটি কিরকম তা হলেও উক্ত সময়ে মোট বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১.৫ বিলিয়ান ডলার। যারফলে NDA আমলে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের গ্রাফটি কখনও নিম্নমুখী আবার কখনও উর্দ্ধমুখী। তাই সামগ্রিকভাবে কোন আশাব্যঞ্জক পথ প্রস্তুত হয়নি এইসময়। বরঞ্চ আমদানি রফতানির ধারাবাহিক টেবিল দেখলে বোঝা যাবে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ অর্থনৈতিক সমস্যাকে তুলে ধরে। ১৯৯৮-২০০৪ সালের ধারাবাহিক টেবিলই তার প্রমাণ।

অন্যদিকে ১৯৯৯ সালে বাণিজ্য ঘাটতি দূর করতে উভয় দেশ “India-Bangladesh Protocol on inland transit and Trade” পুনর্বহাল করে। যার দরুণ স্থিরীকৃত হয় যে নারায়ণগঞ্জ, শ্রীরাজগঞ্জ, খুলনা ও মংলা পোর্ট উভয় দেশ পণ্য পরিবহনের জন্য ব্যবহার করতে পারবে। ১৯৯৮ সালে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় ONGC বাংলাদেশের ১৫টি গ্যাসের কূপ উন্নয়নের বা খননের অনুমোদন পাওয়াকে কেন্দ্র করে। ২০০১ সালে ভারত বাংলাদেশ থেকে তেল ও গ্যাস আমদানীর প্রত্যাশাকে কার্যকরী করতে খালেদা জিয়াকে সমর্থন করে কিন্তু তা ব্যর্থ হয় এবং বাংলাদেশে হিন্দু বিদ্বেষও জামাত প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ফলে অর্থনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় হওয়ার থেকে ধাক্কা খায়। পরে ‘ইন্ডিয়া ইকনমিক ফোরামে’ বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী ভারতে আসেন অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও বিকাশের পথকে প্রশস্ত করতে তবে তা তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক সম্পর্কে। ২০০২ সালে বাংলাদেশের দাবী অনুযায়ী ১২১টি পণ্যের মধ্যে ৩৯টি পণ্যের উপর থেকে ভারত শুল্ক প্রত্যাহার করে যাকে Duty Free Access বলে। ২০০৩ সালে ‘যৌথ অর্থ কমিশনের’ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকাতে এবং এই বৈঠক থেকে ভারত বাংলাদেশকে ২০০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করে। স্বাভাবিকভাবে NDA সরকারের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খানিকটা সুবিধাজনক অবস্থান গ্রহণ করে।

প্রকৃতপক্ষে NDA আমলে ভারত-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা বা বৈষ্যমের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে— দক্ষিণ এশিয়ার ‘ভূ-অর্থনৈতিক’ গুরুত্বের নিরিখে আঞ্চলিক

অর্থনৈতিক সহযোগীতার বাতাবরণ সৃষ্টি করাও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্ক এর একটি নির্ধারক হিসাবে ভূমিকা পালন করে। কারণ ভারত হলো বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য সহযোগী দেশ। আরো বলা যায় যে "Bangladesh is Indias sixth largest Customer."[২] তা সত্ত্বেও ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সমস্যার পেছনে কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় প্রথমতঃ- ভারত দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সূচনা করার ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যাপক বাণিজ্যিক ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। এই বাণিজিক ঘাটতির পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রক্রিয়া। দ্বিতীয়তঃ ভারতের বৈচিত্র্যময় উৎপাদন সম-শুল্ক ও শুল্কহীন দ্রব্যের আদমানী রপ্তানীর ক্ষেত্রে বাধা দূর করার জন্য উভয় দেশের সদিচ্ছার অভাব সমস্যা সৃষ্টি করেছে। তৃতীয়তঃ শুল্ক বা শুল্কহীন দ্রব্যের রপ্তানী ও আমদানীর ক্ষেত্রে বাধা দূর করা সম্ভব হয় সার্ক-এর দ্বাদশ সম্মেলন থেকে যার ফলে তৈরি হয় 'দক্ষিণ এশিয় মুক্ত বাণিজ্য এলাকা' কিন্তু বাংলাদেশ এরপরে ও রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছু বাধানিষেধ আরোপ করে। যা পূর্বে NDA সরকারের সময় দেখা যায়। চতুর্থতঃ ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘ সীমান্ত অঞ্চল হল দারিদ্র পীড়িত ফলে বে-আইনী আমদানী রপ্তানী হল নিত্যদিনের ঘটনা। বাংলাদেশ ভারত থেকে ৯৬% জিনিস বে-আইনীভাবে আমদানী করে যেটা ভারতের ক্ষেত্রে পাঁচভাগের তিনভাগ জিনিস রপ্তানীযোগ্য। যার ফলে সরকারী স্তরে সমস্যা থেকেই যায়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়—. The Substantial, informal and unrecorded trade carried across the India-Banglaesh boder is more quiasi legal in nature, and is offten described as "informal" rather that illegal, since there is wide participation of local people is the border areas. Informal trade of this kind often involves large numbers of local people individually transporting small quantities either physically a or through bicycle rickshws, also know as 'bootleg' smuggling. Another kind of informal trade, termed 'technical' smuggling, involves explicit illegal practices such as under invoicing, misclassification and bribery.[৩] পঞ্চমতঃ ভারতকে বাংলাদেশ 'transit' এর সুবিধা দেয়নি বা গ্যাস রপ্তানী করতে অস্বীকার করে ফলে ভারতের অবস্থান ছিল খুবই অসন্তোষজনক। ষষ্ঠতঃ ভারত SAARC ও BIMSTEC -এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে তৎপর হয়েছিল। সপ্তমতঃ বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা চুক্তি ভারতের NDA সরকারকে সতর্ক ও সদর্থক বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়তে সাহায্য করেছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকারের সময় বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সুস্থির ছিলনা। ভারতের জাতীয় অর্থনীতির উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপরও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল।

❖ সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা সরকারের (UPA) আমলে ভারত-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাণিজ্য ঘাটতিকে পুরোপুরি সমাধান করতে পেরেছিল তেমন নয় তবে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক একটা মাত্রা লাভ করেছিল। যা উভয়দেশের স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে সক্ষম হয়। UPA সরকারের সময় উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়নের প্রভাবে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক কেবলমাত্র আঞ্চলিক স্তরে আবদ্ধ না থেকে আন্তর্জাতিকতা লাভ করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্কে ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান। যা নিম্নোক্ত ধারাবাহিক টেবিলই তার প্রমাণ।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ধারা (মিলিয়ান ডলারে)

সাল	বাংলাদেশ কর্তৃক আমদানীযোগ্য	বাংলাদেশ কর্তৃক রপ্তানীযোগ্য	বাণিজ্যিক ভারসাম্য
২০০৪-০৫	২০২৫.৭৮	১৪৩.৬৬	-১৮৮২.১২
২০০৫-০৬	১৮৬৮.০০	২৪১.৯৬	-১৬২৬.০৪
২০০৬-০৭	২২২৬.০৫	২৮৯.৪২	-১৯৩৬.৬৩
২০০৭-০৮	৩৩৮৩.৯৪	৩৫৮.০৮	-৩০২৫.৮৬
২০০৮-০৯	২৮৪৩.০০	২৭৬.৫৮	-২৫৬৬.৪
২০০৯-১০	৩২১৩.৭০	৩০৪.৬৩	-২৯০৯.০৭
২০১০-১১	৪৫৬৯.২০	৪১২.৫১	-৪০৫৬.৬৯
২০১১-১২	৪৭৫৫.০০	৪৯৮.৪২	-৪২৫৬.৫৮
২০১২-১৩	—	৫৩৬.০৯	—

তাছাড়া ২০১১-১২ সালে UPA সরকারের আমলে ভারত-বাংলাদেশ মোট বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩.২ বিলিয়ান ডলার। যা NDA সরকারের সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই এগিয়েছিল।

অন্যদিকে UPA আমলে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন করতে ভারতে আসেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী সইফুর রহমান। যাকে UPA আমলের

অর্থনৈতিক সম্পর্কের সূচনা বলা যেতে পারে। পরবর্তীকালে ২০০৫ সালে বাংলাদেশের মোহনা হোল্ডিংস, কোরিয়ার দেয়্যু ইন্টারন্যাশনাল ও ভারতের ONGC এই তিনটি কোম্পানী মিলে ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাস আনার যে পরিকল্পনা করেছিল তার বিনিময়ে বাংলাদেশ যে শর্ত আরোপ করে তা ভারতের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই স্বাভাবিকভাবে Exchange Policy Burgaining Policy তে রূপান্তরিত হয়। ২০০৬ সালে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি ও অবৈধ পাচার ও মাদক চোরাচালান রোধ চুক্তি হয় এবং ঐ বছর আগরতলাতে শুল্কহীন ও শুল্কযুক্ত পণ্যের আমদানী রপ্তানী নিয়ে যৌথ বাণিজ্য গোষ্ঠীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যারফলে বাণিজ্যিক সম্পর্কে সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। যা প্রতিফলিত হয় ভারতের টাটা গ্রুপের বিনিয়োগ ভাবনাকে কেন্দ্র করে। টাটাগ্রুপ বাংলাদেশে ইস্পাতশিল্প, শক্তি ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্র এবং পেট্রোরসায়ন শিল্পে ২.৮ বিলিয়ান মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেয়। এছাড়া বাংলাদেশ ২০০৬ সালে ৭৬৩ টি দ্রব্য, ২০০৭ সালে ৭৪৪ টি দ্রব্য, ২০০৮ সালে ৪৮০টি দ্রব্য, ২০১০ সালে ৪৭টি দ্রব্য, ২০১১ সালে ৪৬টি দ্রব্য শুল্কহীনভাবে ভারত থেকে আমদানী করতে পেরেছিল। এইভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্কে মধুযামিনীর সূত্রপাত প্রবাহিত হয় ধারাবাহিকতায়।

২০০৮ সালে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় ভারত ২৮০০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয়। ২০০৯ সালে বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশ সফর করেন ও মূলত দুটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন— (১) বাণিজ্য চুক্তি, (২) দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ অগ্রগতি ও নিরাপত্তা চুক্তি। ২০১০ সালে বিদ্যুৎক্ষেত্রে উভয়দেশ MOU স্বাক্ষর করে এবং BCCI ঢাকা যায় বিদ্যুৎক্ষেত্রে, পোলট্রি, কারিগরী শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, যোগাযোগ পরিকাঠামো উন্নয়ন, রসায়ন শিল্প, ঔষধ, প্লাস্টিক ও বস্ত্র শিল্পের বিনিয়োগের জন্য। ঐ বছর ভারতের PGCIL ও বাংলাদেশের BPDB ৩৫ বছরের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ চুক্তি করে। তৎসঙ্গে চিটাগাং ও খুলনাতে যৌথ উদ্যোগে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ শিল্প গড়ে তোলার জন্য NTPC ও BPDB -র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২০১১ সালে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুপক্ষ 'Most Favourd Nation' বা 'বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ' এর মর্যাদা দেয়। যার বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায় ২০১২ সালে আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্পের জন্য ভারত ২০০ কোটি টাকা খরচ করতে সম্মত হয়। এবং পূর্বে বাংলাদেশকে দেওয়া ১০০ কোটি ডলার ঋণের ২০ কোটি টাকা ফেরৎ দিতে হবে না তারসঙ্গে বাকী ৮০ কোটি ডলারের জন্য সুদের হার ১.৭৫% থেকে ১% এ নামিয়ে আনে ভারত। এছাড়া বাংলাদেশ পালটানা বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য আশুগঞ্জ বন্দর ব্যবহার করতে দিলে ৫০০ MW বিদ্যুৎ বাংলাদেশকে দেওয়া হবে স্থিরীকৃত হয়। ২০১৩ সালে

সীমান্তে SEZ গড়ার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ; পদ্মার উপর সেতু নির্মাণের জন্য ভারত কর্তৃক ২০ কোটি ডলার ঋণ প্রদান; রামপালে মৈত্রী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তুলতে ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ কোম্পানী ও NTPC এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ পর্ষদ যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী ভারতে আসেন সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় করে তোলার জন্য। অনুরূপভাবে ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বাংলাদেশে গিয়ে ক্ষুদ্র প্রকল্পের জন্য ভারত সরকার ৬০ কোটি টাকা বাংলাদেশকে অনুদান হিসাবে প্রদান করবে ঘোষণা করেন। তারসঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে উভয়দেশ উদ্যোগ গ্রহণ করবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐবছর ভারতের বাণিজ্যিক গোষ্ঠীগুলি ১৬টি SEZ গড়ার কথা ঘোষণা করে যার মূল উদ্দেশ্য বাণিজ্য ঘাটতি কমানো। এছাড়া দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য, পরমাণু ক্ষেত্র, মহাকাশ গবেষণায় সহযোগিতা, রেল ও বাস যোগাযোগ বাড়ানোর ব্যাপারেও উভয়দেশ সিদ্ধান্ত নেয়।

উপরিউক্ত তথ্যের মাধ্যমে একথা পরিষ্কার যে সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা আমলে ভারত-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্পর্ক NDA আমলের থেকে একটা পৃথক জায়গায় পৌঁচেছিল। এর পেছনে যে কারণগুলি বিদ্যমান তা জানা প্রয়োজন। প্রথমতঃ ভারতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের প্রভাব কার্যকরী হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ভারত আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং নিজের বৃহৎ প্রতিবেশীত্বের অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে ব্যাপক অনুদান বাংলাদেশকে দিয়েছিল। তৃতীয়ত, সার্ক এর মাধ্যমে শুল্কব্যবস্থার সীমিতকরণ ও প্রত্যাহার ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্ককে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেছিল। চতুর্থতঃ চীন ও মায়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠায় ভারত উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং প্রায় বাধ্য হয়েই অর্থনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে প্রভাব বজায় রাখতে তৎপর হয়। পঞ্চমতঃ UPA সরকারের আমলে অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে Track-II ও Track-III diplomacy র প্রয়োগ সর্বোচ্চ পর্যায়ে যায়। যার ফলে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্ক সহযোগিতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। এপ্রসঙ্গে বলা যায়— This is no doubt a Track-Two common people initiative undertaken by India, under the UPA Phase-II period, to foster better relations with its Neighbours. [8] UPA সরকারের আমলে ভারতের বিদেশনীতিতে বাণিজ্যের প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রসারে অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়— "The inoperatives of our foreign policy have not changed. Emphasizing the idea of establishing greater connectivity in South Asia to promote the movement of goods, services, investment and technology would be essential, so that Indias growth provided the

engine of progress for its neighbours"[৫] ষষ্ঠতঃ UPA আমলে ভারতের 'পুবে তাকাও নীতি'র সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করেছিল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতির ওপর। কারণ ভারত চেয়েছিল বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে উত্তর পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে। যার মাধ্যমে 'গুজরাল ডকট্রিন' বা প্রসারিত প্রতিবেশীত্বের নীতি কার্যকর হবে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়— "We have articulated a policy in our neighbourhood that emphasises the advantages of building networks of inter-connectivity, trade, and investment so that prosperity can be shared and so that the region can benefit from indias rapid economic growth and rising prosperity. We want to create an enviornment with our neighbours that enables us to work together to fulfil our common objectives of economic development.[৬] এভাবে UPA আমলে ভারত-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক উভয়দেশের সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষকে তুলে ধরে।

৩। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক : ভারত ও বাংলাদেশ পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার এক ও অভিন্ন পীঠস্থান। দক্ষিণ এশিয়ার দুটি প্রভাবশালী রাষ্ট্র হিসাবে আন্তজাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব অপরিসীম অভিন্ন হৃদয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য ও পরম্পরা, ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রাম, প্রথা রীতি-নীতি, শিল্প ও সাহিত্য, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি একসূত্রে গ্রথিত করেছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক। এইভাবে বহুমুখী সম্পর্ক উভয় রাষ্ট্রের উত্তরণে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। তাই স্বাভাবিকভাবে NDA ও UPA সরকারের আমলে এর বিচ্যুতি ঘটেনি।

ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা সরকারের আমলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ১৯৯৯ সালে কোলকাতা-ঢাকা বাস পরিষেবার সূচনা দুই দেশের মানুষের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছিল। তারসঙ্গে ঐ বছর ভারত শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশী ছাত্রদের স্কলারশীপ প্রদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। ভারতের শিল্পীরা ঢাকাতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পরিচালনা করতে শুরু করে। মূলতঃ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, শিল্পকলা প্রদর্শনী ও সংগীতানুষ্ঠান যা উভয় দেশের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে তুলে ধরে। ২০০০ সালে ভারত ১০০ জন বাংলাদেশী ছাত্রকে ভারতে পড়াশোনা করার অনুমতি প্রদান করে এবং ICCR এর পক্ষ থেকে বহু ছাত্রকে বৃত্তিপ্রদান করা হয়। এছাড়া সাংস্কৃতিক বিনিময় ও গণমাধ্যম পরিবেশনার ক্ষেত্রে উভয় দেশ সদর্থক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানীয় জল আর্সেনিগ্রস্ত হয়ে পড়ায় উভয় দেশ তা প্রতিকারের ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এভাবে সম্পর্কের ধারাবাহিকায় তাল কাটে ২০০১ সালে

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর ব্যাপক অত্যাচার ও আক্রমণকে কেন্দ্র করে। উভয়দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সংহতি বিনষ্ট হয়। এই ঘটনাকে ভারত ভালো চোখে নেয়নি এবং উদ্বেগ প্রকাশ করে। পরবর্তীসময়ে সরকারী ও বেসরকারী স্তরে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বৃদ্ধি ও বহু বাংলাদেশী ছাত্রকে ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার জন্য অনুমতি প্রদানসহ বৃত্তিদান সম্পর্কের স্বাভাবিকতায় সাহায্য করেছিল। তবে তা আরও স্বাভাবিক হয় ২০০৩ সালে ঢাকা-আগরতলা বাস পরিষেবার সূচনাকে কেন্দ্র করে। ঐ বছর বাংলাদেশের স্কুল শিক্ষকদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও বঙ্গোপসাগরের উদ্ভূত প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলারজন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রকল্প গ্রহণ করে ভারত।

উপরিউক্ত তথ্যের মাধ্যমে বোঝা যায় NDA আমলে বাংলাদেশের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল গঠনমূলক। কিন্তু দুই গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ধারায় বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায় খালেদা জিয়ার আমলে বাংলাদেশের ভারতবিরোধী অবস্থান ও সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণকে কেন্দ্র করে। কারণ বাংলাদেশের সমরতন্ত্রী মৌলবাদী সমাজ বাংলাদেশে তাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে আন্তর্জাতিক ভারত বিরোধী গোষ্ঠীর সাহায্য ও জঙ্গী ভারত বিরোধীতার রাজনীতি দিয়ে। ফলে ঐ আমলে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে নানা আদানপ্রদান সত্ত্বেও ভারত-বাংলাদেশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক একটা নির্দিষ্ট সীমানায় আবদ্ধ থেকে যেতে বাধ্য হয়। ভারত তার স্বাভাবিক প্রভাববলয় হিসাবে বাংলাদেশের প্রতি যে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ করেছিল তা বাংলাদেশ অনেক সময় তিক্ততায় পর্যবসিত করে। তিক্ততা অর্থাৎ পরস্পর বৈরীতা লক্ষ্য করা যায়। তাই এক্ষেত্রে বলা যায় যে বৃহৎ ভারতের বাংলাদেশকে নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। কিন্তু বাংলাদেশ কখনওই ভারতের বিষয়ে উদাসীন ছিলনা, থাকতেও পারবেনা। কারণ তার নিজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ভারতের ঘটমান পরিবর্তনগুলি দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। তাই NDA আমলে দুপক্ষের আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব এবং ভারসাম্য দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছিল বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক চালচিত্রের অনেকখানি। দুদেশের বহিঃসম্পর্কেও তার প্রভাব পড়ে। যাকে এককথায় বলে 'Policy of dealing Peacefully with conflict'. [৭]

❖ সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা (UPA) সরকারের আমলে ভারত-বাংলাদেশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক একটা স্তরে উন্নীত হয়। যাকে সদর্থক ও গঠনমূলক বোঝাপড়া বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান ছিল Prosperthy Neighbour' Policy. Such a Policy would ensure better security for all and gurantee more interaction at the civil society, media, cultural, parliamentarians, and non-governmental organisation level, following the concept of Track-II diplomacy. [৮] যা নিম্নোক্ত

তথ্যে উঠে আসে।

এরই সূত্রধরে ২০০৫ সালে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী খন্দকার মোসাফর হোসেন ভারতে আসেন ভারত সরকার ও WHO এর আয়োজিত 'মাতৃত্ব শিশু প্রসব ও শিশুর স্বাস্থ্যবিষয়ক' কর্মশালায় যোগদানের জন্য। যার ফলে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও কল্যানকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় উভয় রাষ্ট্র। ঐ বছর ১০০ বাংলাদেশী ছাত্রের জন্য অতিরিক্ত বৃত্তি প্রদান, ৬০০ জন বাংলাদেশী শিক্ষককে তথ্য ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৬২ টি কম্পিউটার প্রদান করার কথা ঘোষণা করে ভারত সরকার। যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়কে সূচিত করে। ২০০৭ সালে বাংলাদেশের সাইক্লোন বিধ্বস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার 'অপারেশন সহায়তা' প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০০০০ টন চাল, ২০০০০ প্যাকেট তৈরি খাওয়ার, ১০০০০ কম্বল, ৪০০ তাবু, ২৪০০০ কেজি ঔষধ, ১০০০০ মেট্রিক টন গম ও ১০০০ মেট্রিক টন পাউডার দুধ পাঠায় এবং ঐ প্রকল্পের তদারকীর জন্য বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশ সফর করেন। এইভাবে বাংলাদেশকে ত্রাণ ও অনুদান প্রদান সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বার্থকে তুলে ধরে। ২০০৮ সালে বিমান পরিষেবা বৃদ্ধির জন্য চুক্তি করে উভয় দেশ। এছাড়া কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস' ট্রেন চলাচলের বাস্তবায়ন হয়। ফলে উভয়দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে— "Maitree Train between Dhaka and Kolkata had been a significant leap forward symbolizing cooperative interests of the two neighbours.[৯] তবে ধারাবাহিকভাবে ঐ বছর বাংলাদেশের সিডার বিধ্বস্ত গ্রামে ভারত ত্রাণ পাঠায় এরসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত ও নাট্যকলা বিভাগের জন্য কলাভবন নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়। যা সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে তুলে ধরে। ২০১০ সালে দিল্লির রাষ্ট্রপতিভবনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে 'ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার' তুলে দেন ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রতিভা দেবী সিং পাতিল। এই পুরস্কার প্রদানের অর্থ শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ ও উন্নয়নে শেখ হাসিনার অবদানকে স্বীকার করে নেয় ভারত।

ঐ বছর উভয় দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময় কেন্দ্র ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত হয় যার নাম হয় 'ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' (IGCC) । এই কেন্দ্রে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম, নতুন পুস্তকের প্রকাশ, নৃত্যকলা ও সঙ্গীত প্রদর্শনী ও প্রতিযোগীতা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী পালনের সম্মিলিত প্রস্তুতি শুরু হয়। ২০১১ সালে উভয় দেশ যৌথ বিবৃতি দেয় যে পর্যটন বিভাগের সহায়তায় ভারত ও বাংলাদেশ একটি 'টেগোর সার্কিট' তৈরি করবে যার মূল নাম হবে 'রবিতীর্থ'। এর

সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে গীতাঞ্জলীর মূল সংস্করণটির অবিকল সংস্করণ প্রকাশ করবে সংস্কৃতিমন্ত্রক। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের রবীন্দ্রভবনের মানোন্নয়ন, শ্যাম বেনেগাল কমিটির প্রস্তাবিত ছয়টি রবীন্দ্র চলচ্চিত্রের ডিভিডি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয় উভয় দেশ। ঐ বছর বাংলাদেশ ৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধীর অবদানের জন্য সনিয়া গান্ধীর হাতে 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা' পদক তুলে দেয় এবং (১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদল্যায়ের শিক্ষা ও সহযোগীতা ক্ষেত্রে MOU স্বাক্ষরিত হয়। (২) ভারতের দূরদর্শনের সঙ্গে বাংলাদেশ টেলিভিশনের MOU স্বাক্ষর হয়। (৩) দুই দেশের মৎস উৎপাদন, অরণ সংরক্ষণ ও ব্যাঘ্র সংরক্ষণ (সুন্দরবন অঞ্চলে) এবং জাতীয় ইনস্টিটিউটগুলির মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে বহুমুখী ও বহুসংস্কৃতিসম্পন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য সূচিত হয়। ২০১২ সালে বাংলাদেশের তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ ভারতে আসেন বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে দুটি নৌকা 'পদ্মা ও চপলা' উপহার দেওয়ার জন্য। ফলে ঐতিহ্য ও পরম্পরা নতুনভাবে উন্মোচিত হয়।

২০১৩ সালে ভিসার নিয়মবিধি শিথিল করে ভারত— 'ভিসা আইন শিথিল চুক্তির মাধ্যমে' যা 'People to People Contact' কে বাড়িয়ে দেয় এবং দুই দেশ অভিন্ন হৃদ্যতার পরিবেশকে গড়ে তুলতে তৎপর হয়। ঐ বছর বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু কলকাতায় আসেন বাংলাদেশী সিনেমাগুলি যাতে ভারতের মাল্টিপ্লেক্স হলগুলিতে চলে সে ব্যাপারে কথা বলেন এবং যৌথ উদ্যোগে সিনেমার স্টুডিও ও ল্যাবরেটরি ও কলাকুশলীদের প্রশিক্ষণের উপর জোর দেন। ২০১৩ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অনুরূপভাবে ভারত ও বাংলাদেশের গান্ধীবাদী মহিলা সমাজকর্মী ঝর্ণাধার চৌধুরীকে 'পদ্মশ্রী' সম্মান দেয়। ফলে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ ও বিকাশকে অব্যাহত রাখতে উভয়দেশ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তা প্রমাণিত হয়। ২০১৪ সালে মৈত্রী এক্সপ্রেসের বাতানুকূল কামরা সংযোজন ও যাত্রার সময় কমানো হয়। ঢাকা-শিলং-গুয়াহাটি বাস চলাচল করবে স্থিরিকৃত হয় তৎসহ কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা বাস-পরিষেবা শুরু হয়। এছাড়া বোধগয়াতে বৌদ্ধদের 'হোলি রোবস ইয়োলো' অনুষ্ঠানে হাজির হন বাংলাদেশ সংসদের সাংসদ হাসানুল হক ইনু। ঐ বছর ITEC প্রকল্পে বাংলাদেশের ১৮৫ জন ভারতে পড়াশোনা করার জন্য আসেন। তাই সামগ্রিকভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে উন্নতিলাভ করে।

প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা সরকারের আমলে ভারত-বাংলাদেশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক যে পর্যায়ে গিয়েছিল তা হলো— প্রথমতঃ

এই দুটি দেশ পারস্পরিক ক্ষেত্রে উভয়দেশের জনগণের মানোন্নয়নের জন্য বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার পথকে দৃঢ় করতে পেরেছিল। দ্বিতীয়তঃ এই দুটি দেশের জনগণের জীবনের গুণগত মানবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা গড়ে তোলা, শিল্প, সাহিত্য, ক্রীড়ার সমৃদ্ধি এবং উভয়দেশের বহুসংস্কৃতি সম্পন্ন সমাজের প্রাকৃতিক মেধাকে বহুমুখী কর্মশক্তি সম্পন্ন করে তুলেছিল। তৃতীয়তঃ UPA আমলে 'People to People Contact' উভয় দেশের মানুষের মধ্যে অভিন্ন হৃদয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়কে গড়ে তুলেছিল। চতুর্থতঃ ভারত গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। কারণ ভারত হোল—India has the protential to occupy the undisputed first position among all the knowledge producing centres in the world. [১০] এরফলে বাংলাদেশী ছাত্রদের বৃত্তিপ্রদান থেকে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান সবটাই নয়া সংযুক্তিকে তুলে ধরতে সক্ষম।

পঞ্চমতঃ ভারত তার অতীত ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে মেনে নিয়েই বাংলাদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটিয়েছিল। যার দরুন সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য রক্ষা করতে স্বক্ষমতা অর্জন করে।

ষষ্ঠতঃ UPA আমলে Track-III র মাধ্যমে People to People contact or Exchange Policy কে কাজে লাগানো হয়েছিল। তেমনি Track-V এর মাধ্যমে Media বা গণমাধ্যম সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

৪। **সামরিক সম্পর্ক :** ভারতের নিকটতম ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রহিসাবে বাংলাদেশের উপস্থিতি ভারতের নিরাপত্তা বলয়ের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সামরিক সম্পর্ক উভয়দেশের মধ্যে থাকবে এটাই আশাব্যঞ্জক। তাই ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা (NDA) সরকারের সময় ১৯৯৯ সালে MILAN-99 এ বাংলাদেশ পোর্টব্লেয়ারে নৌ মহড়ায় অংশগ্রহণ করে। সেইসময় বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সচিব মহঃ ইদ্রিস আলি ও সৈন্যবাহিনীর ডিজি ভারতে আসেন এবং তার ঠিক পরেই ভারতের নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল ভি ভরতন তিনটি নৌ জাহাজ নিয়ে যৌথ নৌ মহড়া শুরু হয়। পরে BSF ও BDR ডিজি পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় নয়াদিল্লিতে। ফলে সামরিক সহযোগিতার গৌরচন্দ্রিকা এই আমলে হয়েছিল।

২০০১ সালে BSF ও BDR সম্মুখ সমরে ভারতের ১৬ জন সৈন্য প্রাণ হারায়। ভারত এইসময় তীক্ষ্ণ সতর্কতার সহিত উচ্চপর্যায়ের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উক্ত সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট ভূমিকা

পালন করে। এই ঘটনায় বাংলাদেশ সৈন্যবাহিনীর গোপন ষড়যন্ত্রের ও আক্রমণের শিকার হয় ভারতীয় সৈন্য। যা সামরিক সম্পর্ককে তিক্ততায় পর্যবসিত করেছিল।কিন্তু ২০০৩ সালে উভয়দেশের সৈন্যবাহিনীর উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে স্থিরীকৃত হয় যে উভয়দেশ সীমান্ত পাহারার সময় সমন্বয় বজায় রেখে সীমান্তের অপরাধ দমন করবে। যার ফলশ্রুতিতে তৈরি হয় Confidence building Measures (CBM) গড়ে তোলার উদ্যোগ। এপ্রসঙ্গে বলা যায়—This is expected to enhance confindence building Measures (CBM) building the two Militaries. [১১] পরবর্তীকালে ২০০৩ সালে BSF ১৬২ জন বাংলাদেশীকে সীমান্তে আটক করেছিল যারা পাকিস্তান যাওয়ার উদ্দেশ্যে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন করে তুলেছিল।

এক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশ তাদের বিতর্কিত বিষয়গুলিকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে প্রতিরক্ষা সমঝোতায় এগোলেও এর নেপথ্যের কূটনৈতিক হিসাব নিকাশ উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতের স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এ পদক্ষেপের লক্ষ্য হল— (১) ভারতের নিজস্ব কৌশলগত নিরাপত্তা বলয়কে রক্ষা করতে তৎপর হওয়া।

২) পাকিস্তান ও চীনের সামরিক প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত রাখা। কারণ চীন বাংলাদেশকে সামরিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে ভারতের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে চায়।

৩) ভারত সামরিক দিক থেকে বাংলাদেশের ন্যায় অনেক বৃহৎশক্তির অধিকারী। তা সত্ত্বেও সীমান্তে অনুপ্রবেশরোধ, মাদক ও শিশু ও নারী পাচার ও চোরাচালান রোধ, বে-আইনী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ তথা আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচার রোধ সহ সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করার জন্য সামরিক সহযোগিতার পথকে প্রশস্ত করেছিল।

৪) ভারত বাংলাদেশের উপর তার আধিপত্য বজায় রাখতে বাংলাদেশী সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া ও ক্রীড়া বিষয়ে পারস্পরিক আদান প্রদানের উপর জোর দেয়। এবং ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে সামরিক সহযোগিতাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

❖ অন্যদিকে সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা সরকারের আমলে সামরিক সম্পর্ক একটা গঠনমূলক মাত্রালাভ করে। দুটি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ২০০৪ সালে সীমান্ত সুরক্ষা, অপরাধ দমনে যৌথ পাহারা, সীমান্তে শান্তি ও

সুস্থিতি বজায় রাখতে BSF ও BDR ডিজি পর্যায়ের বৈঠক করে। ২০০৫ সালে BDR ত্রিপুরার ধোলাই জেলায় বাঙ্কার খনন করছে এবং সাবরুম উপজেলায় হেলিকপ্টার আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে বলে BSF দাবী করে এবং পরবর্তীসময়ে BDR ও চোরাচালনকারীদের সমন্বয়ে ভারতের BSF এর অ্যাসিস্টান্ট কমান্ডার জীবনকুমারকে খুন করা হয়। ফলে সামরিক সম্পর্ক ও কৌশলগত নিরাপত্তা খানিকটা ধাক্কা খায়। এই পরিস্থিতির অবসান ঘটে ভারতের বাংলাদেশ সীমান্তে সৈন্য মোতায়েনের মাধ্যমে। আরো স্বাভাবিক হয় ২০০৮ সালে সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও বলিষ্ঠ করাকে কেন্দ্র করে ভারতের সেনানায়ক দীপক কাপুরের ঢাকা সফরের ফলে। ২০১১ সালে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদম্বরম ও বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনের উপস্থিতিতে দুইদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধানরা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষা ও অপরাধ দমনের জন্য সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২০১২ সালে ভারতের প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী এম এস পাল্লাম রাজু ঢাকা সফর করেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান সূচক সম্মান গ্রহণ করার জন্য। যারফলে সামরিক সংযুক্তির বিকাশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। যা চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করে 'নৌসহযোগিতা ২০১৪' যৌথ মহড়ার মাধ্যমে। পূর্ব চীনসাগরে ভারত, পাকিস্তান, চীন, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ব্রুনেই যৌথ মহড়া শুরু করে ভারত তার আই এন এস শিবালিক ছাড়াও আরো আঠারোটি রণতরী নিয়ে নৌমহড়ায় অংশগ্রহণ করে। এই নৌ মহড়ার উদ্দেশ্য ছিল দুর্ঘটনায় পড়া জাহাজের রসদ ফুরিয়ে যাওয়া বিপন্ন জাহাজ তল্লাসি করে তার যাত্রীদের বা আরোহীদের রক্ষা করা, জলদস্যুদের হামলা ঠেকাতে তৎপর হওয়া, জাহাজ ছিনতাই হলে তা উদ্ধার করে ছিনতাই কারীদের আটক করা, দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে নজরদারী চালানো এককথায় সমুদ্র পথগুলি নিরাপদ করে তোলাই এর আসল লক্ষ্য। এই যৌথ মহড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আলাদা তাৎপর্য বা গুরুত্ব অর্জন করেছিল। ভারত বিরোধী অক্ষের দেশগুলির মহড়ায় অংশগ্রহণ নিরাপত্তা কৌশলকে যথেষ্ট প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন করে তুলেছিল।

যাইহোক UPA আমলে ভারত-বাংলাদেশ সামরিক সম্পর্ক NDA আমলের থেকে যথেষ্ট উন্নত ও পরিকল্পনাপ্রসূত ছিল। এর নেপথ্যের কারণগুলি হলো— (১) ভারত তার সীমান্তের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে তৎপর হয়েছিল। (২) বাংলাদেশ চীনের সামরিক সহযোগিতা যেমন— In 2006 China Supplied 65 artilery guns, 114 missiles and related systems to Bangladesh. Most of the tanks (T-59, T-62, T-69, T-73), armoured personnel carries (APCS), artilery pieces, small arms and personal weapons in Bangladesh army are of Chinise origin. [১২] তাছাড়া চীনের পিপলস

লিবারেশন আর্মি বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ভারতের নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান করতে ‘Pamper’ ও ‘pressurize’ করে। ফলতঃ ভারত একে প্রতিহত করার জন্য সাগর দ্বীপে গভীর সমুদ্র বন্দর ও মিসাইল উৎক্ষেপন কেন্দ্র গড়ে তুলতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। (৩) চীনের চট্টগ্রাম বন্দরে ‘military basing rights’ পাওয়ার জন্য তৎপরতা তথা পাকিস্তানের গদর বন্দর, মায়ানমারের সিতুয়ে এবং শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দরে প্রভাব বৃদ্ধি বা “Strategic encirclement of India’ কে ভারত ভালো চোখে নেয়নি ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছে। (৩) সামরিক সম্পর্ক উন্নত করে ভারত বাংলাদেশের মনে ভারত সম্পর্কে যে ভীতি আছে যার থেকে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা বাংলাদেশ করছে, তাকে প্রতিহত করা বা বিচ্যুত করাই ছিল উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগীতা ভারতের অনুকূলে থাকায় চীনের সুপ্ত বাসনাকে প্রতিহত করতে ভারত সক্ষম হয়। তবে NDA ও UPA কোন আমলেই ভারত-বাংলাদেশ সামরিক সম্পর্ক তেমন সুস্থির হয়নি। আঞ্চলিক নিরাপত্তা স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভারত তার সামরিক অবস্থানকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

৫। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নয়নে সার্ক একটি মঞ্চ :

সার্ককে ব্যবহার করে ভারত এবং বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্রই সম্পর্ককে মজবুত ভীতের উপর গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। NDA আমলে সার্কের ০৩টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল অন্যদিকে UPA আমলে ০৬টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে উভয় সরকারের আমলে এই আঞ্চলিক সংহতির প্রয়াস বহুমুখী ও বহুমাত্রিক প্রকার লাভ করে। সার্ককে মঞ্চ করে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে তা সন্দেহ নেই। দুই আমলেই সার্কের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সদর্থক। তাই উভয় আমলে কিছু সাদৃশ্য সম্পর্ককে তুলে ধরে। প্রথমতঃ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে উভয়দেশ সচেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়নে ভারতের অনুদান প্রদান, ঋণ প্রদান, শুল্ক ও অতিশুল্ক হ্রাস, ভারতের কোম্পানীগুলির বাংলাদেশে বিনিয়োগ যথেষ্ট বার্তাবাহী পরিবেশ তৈরি করে। দ্বিতীয়ত, ঢাকা-আগরতলা এবং ঢাকা কলকাতা বাস যোগাযোগ, কলকাতা-ঢাকা রেল যোগাযোগ নতুনভাবে People to people contact কে বাস্তবায়িত করেছে। যা সার্কের ঘোষিত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তৃতীয়ত, সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে উভয় দেশ এই মঞ্চকে ব্যবহার করে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করেছে। এছাড়া সন্ত্রাসবাদী বন্দী প্রত্যার্পণের ক্ষেত্রেও উভয়দেশ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যা সার্কের ঘোষিত নীতিকে রূপায়িত করার পদক্ষেপ বলে

গণ্য হয়। চতুর্থতঃ উভয়দেশ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটানোর জন্য ছাত্রছাত্রী বিনিময় ও তাদের স্কলারশীপ প্রদানের ব্যবস্থা করা, গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ, সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের জন্য যৌথ উদ্যোগে চলচ্চিত্র নির্মাণ, সাংবাদিক যাতায়াত বৃদ্ধি, ICCR এর মাধ্যমে রবীতীর্থ তৈরি, বুদ্ধিজীবীদের বা নীতি নির্ধারকদের নিয়ে সেমিনার প্রভৃতি ব্যবস্থা করে উভয় দেশ। ফলে সার্কের ঘোষিত নীতিকে বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগী দুই দেশ। পঞ্চমতঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে নারী ও শিশুপাচার হয়ে ভারতে আসে বা মাদক চোরাচালানের পথ হিসাবে ভারত ও বাংলাদেশ ব্যবহৃত হয়। ফলে সার্কের ঘোষিত নীতিকে মান্য দিয়ে উভয়দেশ এগুলিকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। ষষ্ঠতঃ ভারত ও বাংলাদেশ সার্কের সদস্য তাই উভয়ে সার্কের মঞ্চে থেকেও ASEAN বা BIMSTEC -এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অগ্রগতি সুনিশ্চিত করতে চায়। তাই উভয়দেশ উক্ত সংগঠনগুলির সঙ্গে কোন না কোন ভাবে যুক্ত হয়েছে। সপ্তমতঃ, দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের আগমনকে প্রতিহত করতে চায় ভারত। যাতে তার নিরাপত্তা স্বার্থ বিঘ্নিত না হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ-চীন যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা এই সংগঠনের প্রাসঙ্গিকতাকে প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখীন করে তোলে। অষ্টমতঃ সর্বোপরি দুই দেশ সার্কের মঞ্চকে যেভাবে ব্যবহার করেছিল তা হলো— 'Another scholar, however is in favour of adding more tracks like, Track-III refering to the business comunity; Track-IV refering to citizen to citizen exchange programms of all kinds; and Track-V refering to the media." [১৩]

সামগ্রিকভাবে NDA ও UPA আমলে ভারত ও বাংলাদেশ সার্ককে ব্যবহার করে সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলেও কিছু বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ মুক্ত বাণিজ্যের প্রসার ঘটলেও বাণিজ্য আদান-প্রদান কোন আমলে তেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ নদনদীর জলবন্টন, তথ্য প্রযুক্তির আদান প্রদান, উপগ্রহভিত্তিক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়গুলিতে যৌথ উদ্যোগের অভাব উভয় আমলেই লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয়তঃ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক ক্ষেত্রে সংঘর্ষ, উত্তেজনা, বে-আইনি অনুপ্রবেশ রোধ, চোরাচালান, সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদকে প্রতিহত করার কোন যৌথ উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। চতুর্থতঃ এই অঞ্চলটিতে ভারতের বিশাল উপস্থিতি একদিকে যেমন ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃত্বের দাবীদার করেছে; তেমনি অন্যদিকে অঞ্চলটির ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি সেই স্বাভাবিক নেতৃত্বকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। ভারতের স্বাভাবিক কর্তৃত্বের মধ্যে তারা সর্বদাই প্রভুত্বের ছায়া দেখছে, বাংলাদেশ ও অনুরূপভাবে 'anxiety syndrom' এর শিকার। তাই ভারত বিরোধী অবস্থান মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দেয়। ফলে কোন আমলেই এই আবহ থেকে সার্কের মঞ্চকে ব্যবহার করে বেরিয়ে আসা

সম্ভব হয়নি। পঞ্চমতঃ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান সীমান্ত সমস্যা, জলবন্টন সমস্যা, বাণিজ্য ঘাটতিকে কেন্দ্র করে সমস্যা, চাকমা সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, নারী শিশু ও মাদক চোরাচালানকে কেন্দ্র করে সমস্যা, গ্যাস আমদানিসহ পাইপলাইনের অনুমোদনকে কেন্দ্র করে সমস্যা, ট্রানজিট সমস্যা-এগুলিকে সার্কের মাধ্যমে পুরোপুরি সমাধান করা সম্ভব হয়নি।

বর্তমান বাস্তবতায় এ অঞ্চলের জনগণের নিরাপত্তার অর্থ নিছক যৌথ বা পারস্পরিক সামরিক আত্মরক্ষা নয়। এরসঙ্গে জড়িত রয়েছে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রত্যেক জাতির জাতীয় পরিচিতির মর্যাদাময় সব সংরক্ষণ এবং দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক সহযোগিতা এবং স্থিতিশীল শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণ। সুতরাং সার্কের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে সুদূর প্রসারী স্থিতিশীল কার্যক্রমের সূচনা করতে হবে যারফলে সম্ভাব্য সকল বাধা ও প্রতিবন্ধকতাকে মোকাবিলা করে অর্থপূর্ণ আঞ্চলিক সহযোগিতার পথে সার্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের যুগে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কাঠামোয় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক পৃথিবীর একমেরুকেন্দ্রিকতার ধারণাকে বহু মেরুকেন্দ্রিকতার একক হিসেবে পরিণত করতে সক্ষম হবে যদি উভয়ে অভিন্ন হৃদয় সহযোগিতার পথ ধরে। যার জন্য কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সেগুলি হলো— (১) পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতা; (২) পারস্পরিক স্বার্থকে রূপায়িত করতে একে অপরের প্রতি আস্থা ও সম্মান প্রদর্শন করা মূলতঃ নিরাপত্তা স্বার্থকে কেন্দ্র করে; (৩) নয়া-বিশ্ব রাজনীতির উন্নয়নের লক্ষ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সমঝোতার মনোভাব তৈরী করা, (৪) যৌথ নীতি রূপায়নের প্রতি দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ; (৫) সর্বোপরি উভয়দেশের মানুষের মানুষের মধ্যে নিবিড় সংযোগ ঘটানো অর্থাৎ People to People Contact.

তবেই JWG বা CBM গড়ার স্বার্থকতা বাস্তব রূপ লাভ করবে এবং বিশ্ব রাজনীতির আবর্ত নতুনভাবে উন্মেষলাভ করবে। যার সম্ভাব্য প্রবণতাগুলি হলো—

(১) বিশ্ব রাজনীতির ক্ষমতা স্থানান্তরিত হবে পশ্চিম থেকে পূর্বে।

(২) শান্তি ও সমৃদ্ধির স্বার্থে গড়ে উঠবে কৌশলগত ও সহযোগিতামূলক বন্ধুত্ব।

(৩) এই বন্ধুত্ব পৃথিবীতে বহুমেরুকেন্দ্রিকতার গুরুত্ব বহন করবে।

তারফলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক 'শান্তির ললিতবাণী' কিংবা 'উন্নয়নের বাস্তবরূপ কথা' পৃথিবীর কাছে আগ্রাসী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে পরিহাস নয় একটি শক্তিশালী প্রতি আক্রমণ হিসাবেই চিহ্নিত হবে এবং এশিয়া তথা বিশ্ব-রাজনীতির নির্ধারক হিসাবে আগামী দিনে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর তাৎপর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

তাই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর মধ্যদিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন বিরোধের বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যতম কালজয়ী তত্ত্ব বাস্তববাদ (Realism)এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় ই.এইচ.কার এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Twenty Years' Crisis' (1939) এবং মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যানস.জে.মর্গান থাউয়ের The Politics among Nations (1948) এই দুটি গ্রন্থে বাস্তববাদী তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান পাওয়া যায়। সর্বকালে সর্বত্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার নিয়ন্ত্রক শক্তি হল (Determining Factor) হল ক্ষমতা অর্জন এবং ক্ষমতার সম্প্রসারণের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা। এটাই রূঢ় বাস্তব। আদর্শের আনুষ্ঠানিক উচ্চারণের মধ্যে অনেক সময় প্রচ্ছন্ন থাকে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা। দুর্বল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সবল রাষ্ট্রের ক্ষমতার ব্যবহার আজও বিশ্ব রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। ক্ষমতা প্রয়োগের প্রবণতা এবং ক্ষমতার দ্বারা আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা যেন কিছুতেই থেমে থাকতে চায় না। ক্ষমতা অর্জনের এই অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার পরিমণ্ডলে সব রাষ্ট্রই তখন চায় নিজের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত ও সুরক্ষিত করতে। এটাই তখন হয়ে দাঁড়ায় একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল স্তম্ভ। জাতীয় শক্তি তথা ক্ষমতার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ তখন একমাত্র জাতীয় স্বার্থে পরিণত হয়। এবং আন্তর্জাতিক দুনিয়ার মূল বৈশিষ্ট্য যেহেতু নৈরাজ্য, সেহেতু জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে কোন রাষ্ট্রেরই মূল লক্ষ্য হলো সামরিক শক্তি বৃদ্ধি, কারণ সামরিক ক্ষমতাবৃদ্ধিই একটি রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি ও জাতীয় স্বার্থ পরিপূরণের মুখ্য মানদণ্ড। সেই জন্যই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় মূলতঃ ক্ষমতার রাজনীতি (Power Politics)। এই তত্ত্বের নিরিখে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিরোধ বা সমস্যাসঙ্কুল বিষয়গুলিকে ক্ষমতার রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। যথা সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্যা, জলবন্টন সমস্যা, বাণিজ্য ঘাটতিকে কেন্দ্র করে সমস্যা, চাকমা সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, সন্ত্রাসবাদকে কেন্দ্র করে সমস্যা, নারী ও শিশু ও মাদক চোরাচালনসহ প্রাসঙ্গিক সমস্যা সমূহ। এছাড়া চীনের প্রতি ভারত ও বাংলাদেশের মনোভাব, আশিয়ান ও বিমস্টেকের সঙ্গে উভয়ের সম্পর্ক তথা দক্ষিণ এশিয়াতে বৃহৎ ক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি অন্যতম।

আবার মর্গেনথাউ বলেছেন আন্তঃরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক ভূ-প্রকৃতির মধ্যে পথের দিশারী হল জাতীয় স্বার্থের ধারণা। অর্থাৎ The main signpost that helps Political realism to find its way though the landscape of International Politics is the concept of interest defined in terms of Power.[১৪] অর্থাৎ ক্ষমতার অন্বেষণ এবং জাতীয় স্বার্থকে অভিন্নভাবে দেখা দরকার। এই জাতীয় স্বার্থের ধারণার অনেকগুলি তাত্ত্বিক উপযোগিতা রয়েছে। রাষ্ট্রের কার্যকলাপ এবং যৌক্তিকতার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন ছাড়াও রাজনীতির আসল চেহারাটি ফুটিয়ে তোলা এর মাধ্যমেই সম্ভব। এভাবেই আবার রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং অন্য অরাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক স্তরে বাস্তব রাজনীতির চালিকা শক্তিই হল জাতীয় স্বার্থ। এই স্বার্থবোধে রাষ্ট্রনায়কেরা যে পরিমাণে অনুপ্রাণিত হবেন, ততটাই তাঁদের কার্যকালাপ যুক্তিসম্মত বলে প্রতীয়মান হবে। বিদেশনীতি প্রনয়নে জাতীয় স্বার্থের অনুসরণ একটা শৃঙ্খলা আনয়ন করে, যা নীতি প্রনেতাদের মতাদর্শ, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা এবং বাতিকগ্রস্ততা (obsession) থেকে অনেকাংশে মুক্ত রাখে। তিনি আরো বলেন বাস্তববাদীদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র সবসময়েই যুক্তিগ্রাহ্য কাজ করে কারণ, রাষ্ট্র সবসময়েই নিয়ন্ত্রিত হয় জাতীয় স্বার্থের দ্বারা, যার মূল উদ্দেশ্যই হলো আত্মরক্ষা, নিরাপত্তা, ক্ষমতাবৃদ্ধির ও সামর্থ বজায় রাখা। যুক্তিপূর্ণ বিদেশনীতি যেমন জাতীয় স্বার্থকে সর্বাবিধ মাত্রায় রক্ষা করে, তেমনি বিপদের সম্ভাবনাকে সর্বনিম্নমাত্রায় নিয়ে যায়— এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে তথাকথিত আদর্শগত বা নৈতিক পছন্দ বা অপছন্দকে গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করে।[১৫] যা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। উভয় দেশের অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তা উঠে আসে।

অন্যদিকে কেনেথ ওয়ালজ এর দ্বারা সূচিত নব্য বাস্তববাদ (Neo-realism) আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি অখণ্ড ও সামগ্রিক ব্যবস্থারূপে দেখতে চায়। বলা বাহুল্য এর একটি নিজস্ব পরিপূর্ণ কাঠামো আছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ঘটনাপ্রবাহ বিভিন্ন কারণে এখন অনেক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিশ্ব রাজনীতির ঘটনাগুলি অনেক নতুন নতুন শক্তিকে অবলম্বন করে নব নব ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই অবস্থায় জাতি রাষ্ট্রর বা জাতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা পুনর্মূল্যায়নের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির জগতে যেসব পরিবর্তন ঘটে চলেছে, তা অনেকটাই কাঠামোগত— এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমান যে আন্তঃরাষ্ট্র ব্যবস্থা আবির্ভূত হয়েছে তা' বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিজস্ব শক্তিগুলির থেকে মূলত স্বতন্ত্র। এর উপরে নির্ভর করেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি নিজস্ব তত্ত্বগত ক্ষেত্র গড়ে উঠতে পারে। সেই কারণে এই নব্য বাস্তববাদকে

কাঠামোগত বাস্তববাদও বলা হয়। তাই নয়া বাস্তববাদী তত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাস্তববাদী তত্ত্বের unit level (একক কেন্দ্রিক) আলোচনার স্তরের উর্দ্ধে উঠে বলা যেতে পারে যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পরিকাঠামো এবং তার থেকে নির্গত চাপ এমনকী আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কাঠামোও ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের উপর কার্যকরী। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বা ভারত সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা চীনের দৃষ্টিভঙ্গী, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ান বা কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির বাংলাদেশ সম্পর্কে মনোভাব, ইসলামী রাষ্ট্রগুলির ভারত ও বাংলাদেশ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব, SAARC, ASEAN, BIMSTEC এ উভয়ের অংশগ্রহণের বিষয়টি অন্যতম।

ওয়ালজ আরো বলেছেন যে, আন্তঃরাষ্ট্র ব্যবস্থার এককগুলির চরিত্র সাধারণভাবে এক। রাষ্ট্রগুলি তাদের নিজেদের মধ্যে যতই মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিক থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ হোক, আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাদের আচার আচরণের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[১৬] যেমন SAARC বা BIMSTEC এর মঞ্চে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য উন্নয়নকে কেন্দ্র করে ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। যার দরুন দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণ সম্ভবপর হয়ে উঠেছে এবং SAFTA বা SAPTAর প্রাসঙ্গিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরসঙ্গে সঙ্গতি রেখে ওয়ালজ আরো বলেছেন— কৌশলগত সুবিধা অর্জনের জন্য সকল রাষ্ট্রই উদ্যোগী হয়। আসলে সকল রাষ্ট্রেরই মনের মধ্যে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ কাজ করে। সুতরাং অন্য সব কাজ করার আগে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজের প্রতি প্রত্যেক রাষ্ট্রকে মনোযোগী হতে হয়। এইসূত্র ধরে বলা যায় তিস্তা চুক্তি না হলে Transit ব্যাবহার করা যাবে না অথবা বাংলাদেশের ভারতভীতি থেকে চীন বা জাপানের সঙ্গে সখ্যতা বৃদ্ধিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সুতরাং বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ককে কৌশলগত নিরাপত্তার কাঠামোতে বিশ্লেষণ সম্ভব।

তবে ইতিপূর্বে উল্লেখিত দুটি তত্ত্বে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বাস্তবমুখী বিশ্লেষণ হলেও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎকে এই দুটি তত্ত্ব সুদূর প্রসারী করতে পারে না সেভাবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কার্যবাদ বা নয়া কার্যবাদী তত্ত্ব (Functionalism and Neo-Functionalism theory)। যার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি Step by step বা ক্রম পদক্ষেপের মাধ্যমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক সংযোগ ঘটাতে পারে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে ডেভিড মিত্রানির মতে, কার্যবাদ প্রয়োজনের সূচকের উপর গুরুত্ব দেয়। বহু প্রয়োজনই আছে

যা জাতীয় সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কিছু সমস্যা সার্বিক নয়— আন্তর্জাতিক স্বার্থভিত্তিক গোষ্ঠীগঠনের কার্যকর প্রয়াস নেওয়া যায় কতকগুলি যৌথ সংস্থা গঠনের মধ্য দিয়ে যারা এই সার্বজনীন প্রয়োজনগুলি নিয়ে আলোচনা করবে। আবার রাষ্ট্রের নিরাপত্তামূলক কাজকে তিনি নেতিবাচক বলে অভিহিত করেছেন, এবং এক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন। কিন্তু অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কার্যাবলীকে তিনি সদর্থক বলে মনে করেছেন, এবং এক্ষেত্রে স্বাধীন অথচ নমনীয় কার্যকরী সংস্থা গঠনের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেছিলেন যানবাহন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষিক্ষেত্র, শিল্পায়ন, বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন বা এই ধরনের কার্যাবলী শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না— এই সমস্ত কার্যাবলী আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা দরকার।[১৭] যার দরুন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে SAARC, ASEAN বা BIMSTEC-এর গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এবং উভয় দেশ তার Co-operation Spirit বজায় রেখেই এগোচ্ছে। যারফলে কার্যকরী নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা, অথবা সাংগঠনিকভাবে বিচ্ছিন্ন কিন্তু বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গী জনকল্যাণ এবং একীকরণ দুইই চূড়ান্ত করতে পারে। তাই E.B.Hass এর এই Neo-Functionalism তত্ত্বের অনুসরণে বলা যায় এই পথেই বিশ্বের দুই প্রাচীনতম সভ্যতার কেন্দ্র বিকাশের নতুন পথ খুঁজে পাবে। বর্তমান নৈরাজ্যময় বিশ্ব ব্যবস্থায় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক একটা নতুন সহযোগিতার সবুজ সীমান্ত উন্মোচন করবে এবং এই দ্বন্দ্বদীর্ণ বিশ্বে সহযোগিতা ও সুসম্পর্কের আদর্শ স্থাপন করতে পারবে।

একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপট হলো— (i) A global power shift from West to East along with a new strategic balance in emerging among Asian powers without necessarily being in Coflict with those outside the region;

(ii) The 'rise' of China and India, and how they would relate to the world situation in general and to the sole superpower;

(iii) The global centre of gravity of political, economic and military activities and capabilities is shifting to Asia;

(iv) The reponse of the united states as the single most powerful state to the emerg-

ing geo-strategic realitics, especially when seen in the context of its inability or unwilling-ness to adjust to the above realities, its greater reliance or Unilateralism and selective Pre-emption with propensity to use military force with or without credible legitimacy, etc.

(v) future of human development, especially in Asia.[১৮]

এইরকম পরিস্থিতিতে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ভারত ও বাংলাদেশ "Cooperative security' কে 'Collective security'তে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। যার সম্ভাব্য ফলশ্রুতি হলো—

1. To be able to exercise a degree of influenc over the nations in our immediate neighbourhood to promote harmonious relationship in tune with our national interests;

2. To be able to effectively contribute towards regional and international stability and to processes an effective out of the country contingency Capability to prevent destabilisation of the small nations in our immediate neighbourhood that could have adverse security implications for us.[১৯] এক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে সি রাজামোহন বলেছেন— "India must work with them to promote economic modernitation, social harmony, and political modernisation"[২০] যারফলে প্রতিবেশী হিসাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও বিকাশে ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং এশিয়া তথা দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বলতে হয় যে— "Promotion of Confidence building measures, development of preventive diplomacy mechanism and development of conflict resolution mechanism."[২১] যার প্রয়োজনীয়তা দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে অতি সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর ঢাকা সফর ঐতিহাসিক মাইলস্টোন হিসাবে সূচিত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত চুয়াল্লিশ বছর ধরে অমীমাংসিত ছিটমহল সমস্যার সমাধান করেন স্থলসীমান্ত চুক্তি। সম্পাদনের মাধ্যমে— যা সম্পর্কে অন্য মাত্রা এনে দেয়। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সদিচ্ছা নির্মাণে মোদী অনেকটা এগিয়ে থাকতে চাইলেও, মমতার আপত্তিতে তিস্তা জলবন্টন চুক্তি নিয়ে কোন কথা হয়নি। এই একটি বিষয় বাদ দিলে, বাংলাদেশের সঙ্গে একাধিক

গুরুত্ব পূর্ণ চুক্তি ও সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য স্থলসীমান্ত চুক্তি, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি, (পুনর্নবীকরণ), ভারত-বাংলাদেশ উপকূলে পণ্য পরিবহন, আন্তর্দেশীয় নৌ-বাণিজ্য, ঢাকা-শিলং-গুয়াহাটি ও কলকাতা-ঢাকা-আগতলা বাস পরিষেবা, দু-দেশের উপকূলরক্ষী বাহিনীর মধ্যে বোঝাপড়া, নারী-পাচার জালনোট ইত্যাদি রুখতে পদক্ষেপ, বাংলাদেশকে ভারতের ২০০ কোটি ডলারের ঋণ সাহায্য, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহারের অধিকার, সার্কের জলবায়ু চুক্তি, ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল নিয়ে বোঝাপড়া, আগামী দু বছরে দুদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, ভারত-বাংলাদেশ শিক্ষা সহযোগীতা, বাংলাদেশ থেকে উত্তর পূর্ব ভারতে সাবমেরিন কেবল যোগাযোগ, বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ে যৌথ গবেষণা, জামিয়া-মিলিয়া-ইসলামিয়া ও রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চুক্তি, জীবন বিমা বিষয়ক চুক্তি— প্রভৃতি দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের উষ্ণতা বৃদ্ধি করেছে। সর্বোপরি উভয়দেশ তার আভ্যন্তরীণ উন্নয়নে একে অপরকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। যার ফলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নতুনভাবে প্রমাণ করে যে—

(১) জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা (NDA) আমলের তুলনায় সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা আমলে (UPA) ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিকাশ ও গতি উত্তরোত্তর সদর্থকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি, স্থিতী, সহযোগিতা ও মানবউন্নয়নের আন্তর্জাতিক রাজনীতির আঙ্গিনায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

(২) দক্ষিণ এশিয়া তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে BIMSTEC-কে কাজে লাগিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়ন সম্ভব।

(৩) ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে স্থায়ী ও দৃঢ় করতে সার্ককে আরো শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

(৪) দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতাবস্থা ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটাতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে বিচক্ষণভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

(৫) ইতিহাসের পথ ধরে জনগণের সঙ্গে জনগণের নিবিড় যোগাযোগ (People to People Contact)-এর উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

(৬) সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের (Cultural Exchange)-এর মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম।

তবে একথা সত্য যে মাতৃত্বের জঠর থেকে জন্ম নিয়ে ও বাংলাদেশ ভারতের আধিপত্যকে মেনে নিতে পারেনি। তাছাড়া বাংলাদেশের সমরতন্ত্রী মৌলবাদী সমাজ বাংলাদেশে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে আন্তর্জাতিক ভারতবিরোধী জঙ্গী গোষ্ঠীর সাহায্যে ভারত বিরোধীতাকে বাস্তবায়িত করে। ফলে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা স্তরে আদান প্রদান সত্ত্বেও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক একটা নির্দিষ্ট সীমানায় আবদ্ধ থেকে যেতে বাধ্য যদি উভয় দেশের উদার অকৃত্রিম হৃদ্যতার সৃষ্টি না হয়।

তাছাড়া ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বৃহৎ শক্তি জোট হিসাবে উভয় রাষ্ট্রের দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতার উপর দাঁড়িয়ে থাকলে মানব প্রগতি ও বিশ্ব শান্তির নতুন সম্ভাবনাকে তুলে ধরা সম্ভব হবে। তদুপরি এতদ অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের আধিপত্যবাদী প্রভাব সংকুচিত করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রকে বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, গবেষণা, গণমাধ্যম, সামরিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক ও কৌশলগত সহযোগিতার পারস্পরিক ক্ষেত্রকে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তবেই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক সৌহার্দ ও সম্প্রীতির আবর্তে আরো নিবিড় হবে।

তথ্যসূত্র

১. Sarkar Srimanti- 'Does Democracy matter? Political Regimes and Indo-Bangldesh Relations', in *JAIR Journal of International Relations*, Vol. 2, Issue-1, Bharati Publication, New Delhi, Jan-June 2015, p. 62

২. Khosha I.P- 'Bangladesh- India Relations' in *South Asian journal*, No. 09, Lahore, Jan-Mar 2005, p. 77

৩. Nayak Nilanjana- "Indo-Bangladesh Economic Relations: Problems and Prospects" in *West Bengal Political Science Review*, Vol. XVII, No.1 and 2, The West Bengal Political Science Assoication, Kolkata, 2014, p. 283

৪. Chakraborty Tridib- 'India and its Neighbours: Constructive Engagement from the Prism of UPA Phase-II' in *World focus*, No. 396, Series- 2, New Delhi, 2012, p. 08

৫. Tuteja Ashok- 'PM Calls for friendly ties with Neighbours', *The Tribune*, (Chandigar) 14 the September, 2012.

৬. Dr. Mahapatra Anil Kumar, "Gujral Doctrine and foreign Policy of UPA-II : An interface" in *World focus*, No. 396, Series-2, New Delhi, 2012, p. 20

৭. Karim Mohd Aminul- 'Bangladesh-India Relations', Some Recent Trends in ISAS

Working Paper, No. 96, National University of Singapore, 2009, p. 11.

৮. Ibid

৯. The Daily Star, 9th January, 2010

১০. Moses V. Nelson- "For Global R&D's big spender's India is becoming a space for enduring sucess" in *Business world*, Vol. 27, Issue-27, Express Building, New Delhi, 2007, p. 28

১১. K.Srikant- 'Indian Defence Ministers Visit to China : New Begining's' in *China Report*, Vol 42, No. 4, Sage Publication, New Delhi, 2006, p. 406

১২. Ghosal Debjani- "Emerging trends in Sino-Bangladesh Relations: A cause of concern for India?" in *JAIR Journal of International Relations*, Vol. 1, Series-2, Bharati Publications, New Delhi, 2014, p. 34

১৩. Montville Joseph V- "The Arrow and the Olive Branch : A Case for Track two Diplomacy" in John W. Mcdonald and Diane B Bendahamane (eds.) "Conflict Resolution: Track two Diplomacy" Institute for Multi Track Diplomacy, Washington DC, 1995, p. 04.

১৪. Chakraborty Radharaman & Chakraborty Sukalpa (eds.)— "Samasamayik Aatarjatik Samparka", Progressive Publisheres, Kolkata, 2004, p. 39

১৫. Basu Gautam Kumar— "Internatinal Relations : Theory and Evolution", West Bengal State Book Board, Kolkata, 2006, p. 06

১৬. Sen Baniprasad— "Samakalin Autarjatik Samparka— Bisoy Binnas O Bakhya", Mitram, Kolkata, 2010, p. 35

১৭. Op.cit, no. 2, p. 129

১৮. Singh Jasjit— "Global Power Shift: Toward a Polycentric Asian Country' in V.D.Chopra (ed.)— *Indias foreign Policy in the 21st Century*, Kalpaz Publications, Delhi, 2006, pp. 31-32.

১৯. Singn Jaswant— 'National security- An outline of our concerns', Lancer Publishers, New Delhi, 1996, pp. 59-60

২০. Rajamohan C— "Coopertive Security in South Asia" in *South Asian journal*, Oct-Nov-2004.

২১. Umebayashi Hiromichi— "Concept and approaches for the alternative security—"Paper presented at the "South Asia and South East Asia Peace Activists Conference"at Dhaka, 18-20th Feb 2000, p. 07

তথ্যপঞ্জী

GOVERNMENT DOCUMENT

1. Annual Report 1995 -1996 , Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi
2. Annual Report 1999-2000 , Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi
3. Annual Report 2000 -2001, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi
4. Annual Report 2001 -2002 , Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi
5. Annual Report 2002 -2003, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi
6. Annual Report 2004 -2005 , Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi
7. Annual Report 2005 -2006 , Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi
8. Annual Report 2006 -2007, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi
9. Annual Report 2007 -2008, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi
10. Annual Report 2008 -2009, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi
11. Annual Report 2009 -2010 , Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi
12. Annual Report 2010 -2011 , Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi
13. Annual Report 2011 -2012 , Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi
14. Annual Report 2012 -2013 , Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi
15. Annual Report 2013 -2014 , Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi
16. Annual Report 2014 -2015 , Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi
17. Agreement on South Asian Free Trade Area (SAFTA) , SAARC Secretariat , Kathmandu, 2004

18. A Brief on SAARC , SAARC Secretariat, Kathmandu, , July 2004
19. Bangladesh Documents ; Vol-2 , External Publicity Division, Ministry of Foreign Affairs , Government of the People's Republic of Bangladesh , Dhaka, Bangladesh.
20. Bangladesh – Contemporary Events and Documents , External Publicity Division, Ministry of Foreign Affairs , Government of the People's Republic of Bangladesh , Dhaka, Bangladesh.
21. Bangladesh Progress – Ministry of Information ,Peoples Republic of Bangladesh ,Dhaka.
22. Charter of the South Asian Association for Regional Cooperation , SAARC Secretariat, Kathmandu , 1986.
23. Declaration of SAARC Summits 1985-1998, Information and Media Division , SAARC Secretariat, Kathmandu ,2001.
24. Declaration of 11^{th} SAARC Summit , Information and Media Division , SAARC Secretariat, Kathmandu ,4^{th}-6^{th} jan, 2002.
25. Declaration of 12^{th} SAARC Summit , Information and Media Division , SAARC Secretariat, Kathmandu ,4^{th}-6^{th} jan ,2004.
26. Declaration of 15^{th} SAARC Summit ,No. -12, Colombo, Srilanka, 2^{nd}-3^{rd} August ,2008.
27. Declaration of 16^{th} SAARC Summit ,No. -27, Thimpu,Bhutan, 28^{th}-29^{th} April ,2010
28. Declaration of 17^{th} SAARC Summit,No -16, Addu, Maldwip, 10^{th}-11^{th} Nov,2011
29. Land Boundary Agreement 1974.
30. PM's Opening Statement at the 16^{th} SAARC Summit ,Thimpu ,Bhutan ,28^{th} April, 2008
31. SAARC Agreement on SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA) , SAARC Secretariat, Kathmandu, Nepal, August 2004.
32. SAARC Convention on Narcotic and Drugs and Psychotropic Substances, SAARC Secretariat, Kathmandu, Nepal, June 2004.
33. SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution, SAARC Secretariat, Kathmandu, Nepal, June 2004.
34. SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism, SAARC Secretariat, Kathmandu, Nepal
35. The Constitution of Bangladesh , Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, People's Republic of Bangladesh , Dhaka, Bangladesh, 1999.
36. Text in Foreign Affairs Record, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi, 1972.
37. Tin Bigha: Sathik Preakhit, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi,1992 (in Bengali)

ARTICLES

1. Ahamed Nizam —-'Critical elections and democratic consolidation : The 2008 Parliamentary elections in Bangladesh' in *Contemporary South Asia ,* Vol.-19 ,No.-02, Routledge, UK, june,2011.
2. Ahamed Khaled —-'South asia's unresolved disputes' in *South Asian Journal,*No.-02 ,Lahore,Jan-Mar,2005
3. Ahamed Imtiaz —-'Bangladesh and India : In the context of SAARC and the emerging global scenario' in *Indian Foreign Affairs Journal*, Vol.-2,No.-1,Cambridge University press india pvt . ltd.,New Delhi,Jan-Mar,2007
4. Bhuyan M. Sayefullah —-'Underdevelopment of Bangladesh : An analysis of socio-economic policy implications' in *South Asian Studies*, Vol.-24,No.-2,University of Rajasthan,Jaipur,,July-Dec,1989.
5. Begum Anwara and Khanam Rashida — 'Leadership styles of khaleda zia and Seikh Hasina of Bangladesh : A comparative study' in *Regional Studies*, Vol. –xxv,No.-2, Institute of Regional Studies, Islamabad, Spring, 2007.
6. Bhattyacharya Sukanta — 'Introducing the chakmas :A nation in the offing' in *Socialist Perspective*, Vol.-28,No.-3 and 4 , New Delhi, Dec 2000 – Mar 2001.
7. Behera Ajay Darshan —-'Insurgency in the Bangladesh hills :Chakmas' search for autonomy' in *Strategic Analysis*, Vol. –xix, No. -7, Institute of Defence Studies and Analysis, New Delhi,Oct,1996.
8. Basu Roychudhury Sabyasachi — 'Natwar sunnya hatei firlen' in *Desh* , Vol. – 72, No. -21, ABP pvt. Ltd.,Kolkata,Sep,2005. (in Bengali).
9. Chakraborti Tridib —-'Seikh Hasina's India mission :From distance to proximity' in *World focus* , No. -362, New Delhi, Feb,2010.
10. Chakraborti Tridib — 'India and its neighbours : Constructive engagement from the prism of UPA phase – II' in *World focus* , No. -396, Series -2, New Delhi,2012.
11. Chakraborty Asish —-'Prakitik gas rajnitir garoy' in *Desh,* Vol.- 72 ,No. – 4, ABP pvt. Ltd.,Kolkata,2004 (in Bengali).
12. Chakraborty R. —-'Structured Images in foreign relations – India and some of her South Asian neighbors' in *Asian Studies*, Vol.-xii, No. -1, Netaji Institute for Asian Studies,Calcutta,Jan-June, 1995.
13. Cherian John —-'Looking ahead' in *Frontline,* Vol. -21, No. -2 ,National Press, Chennai, 2004.
14. Chadda Maya —-'India in 2011- The state encounters the people' in *Asian Survey*, Vol.-52, No.-1,University of California press,USA,Jan-Feb,2012.
15. Chowdhury Nusrat Jahan —-'Missing links in Bangladesh democratization (2001-2007) : An overview' in *Regional Studies* ,Vol.-xxviii, No. -1, Institute of Regional

Studies,Islamabad, Winter,2009-2010.

16. Chakraborty Tridib —-‘SAARC expands its wing :Insinuations in the new global order’ in *World focus* ,No. -341,New Delhi,May,2008.
17. D’costa Bina and Alamgir Jalal —-‘The 1971 genocide :War crimes and political crimes’ in *Economic and Political Weekly* ,Vol. –xlvi,No. -13,EPW Research Foundation,Mumbai,Mar26,2011.
18. D’costa Bina —-‘Bangladesh in 2011 –Weak state building and different foreign policy’ in *Asian survey*, Vol. -52, No.-1, University of California press,USA, Jan-Feb, 2012.
19. Dr. Bhuiyan Shahjahan Hafez —-‘Patterns of Governance in BD : A review of five regimes-1972-2001’ in *Regional Studies*, Vol.-xxv, No. -4, Institute of Regional Studies, Islamabad, Autumn, 2007.
20. Datta Sreeradha —-‘India and Bangladesh : The Road towards common peace and prosperity’ in *Strategic Analysis*, vol.-34, No. -3, Institute for Defence Studies and Analysis, New Delhi, May,2010.
21. Ghosh Bipattaran —-‘Bangladesh :Factors Contributing to its Emergence’ in *South Asian Studies*, Vol. -29, No. -1, University of Rajasthan, Jaipur,Jan-June,1994.
22. Hussain Akmal —-‘Political development in Bangladesh(1991-98): Issues and Constraints’ in *South Asian Studies* ,Vol. -36, No. -1 and 2, University of Rajasthan,Jaipur, Jan-Dec,2001.
23. Hakim Muhammad A. —-‘Legitimacy crisis and united opposition : The fall of Ershad regime in Bangladesh’ in *South Asia Journal*, Vol. -5, No. -2, Sage Publications,New Delhi,Oct-Dec,1991.
24. Hagerty Devin T. —-‘Bangladesh in 2006 living in ‘Interesting Times’ ‘in *Asian Survey*, Vol.- xlvii, No. -1, University of California press, USA, Jan-Feb,2007.
25. Hossain M Sakhawat —-‘Indo-Bangla relations : The Strategic Factor’ in *The South Asian Review*, Vol. -3, No. -13, Reliable Printers, Dhaka,Dec,2005.
26. Hussain Imtiaz —-‘Fundamentalism and Bangladesh : No error,No terror’ in *South Asian Survey* ,Vol. -14, No.-2, Sage Publications,New Delhi,July-Dec,2007.
27. Hasmi Arshi Saleem —-‘Relations parties and militant groups in Bangladesh politics’ in *Regional Studies*, Vol. –xxvii, No. -4, Institute of Regional Studies, Islamabad, Autumn,2009.
28. Husain Syed Anwar —-‘Status of democracy in Bangladesh’ in *South Asian Studies*, Vol. -34, No. -2, University of Rajasthan, Jaipur,July-Dec,2004.
29. Hossain Monzur —-‘Bangladesh : Natural gas export’ in *South Asian Journal*, No. -9, Lahore, July-Sep,2005.
30. Jha Nalinikanta —-‘Coalition Governments and foreign policy : A case of India’s foreign policy during the UPA regime’ in *World focus*, No. -396, Issues -2, New Delhi, 2012.

31. Kaushik Surendranath —-'Politics, Islamic fundamentalism and Women's rights in Bangladesh' in *South Asian Studies*, Vol -37,No. -1, University of Rajasthan, Jaipur, Jan-Mar, 2002.
32. Karim Mohd. Aminul —-'Bangladesh – India relations : Some recent trends' in *South Asian Studies*, No. -96, National University of Singapore, Nov, 2009.
33. Khosla I. P. —-'Bangladesh – India Relations' in *South Asian Journal*, No. -9, Lahore, Jan-Mar, 2005.
34. Khan Zillur —-'Bangladesh in 1992' in *Asian Survey*, Vol. -33, No. -2, Berkley, Feb, 1993.
35. Moniruzzaman M —-'Party politics and political violence in Bangladesh : Issues, Manifestation and Consequences' in *South Asian Survey* , Vol. -16,No. -1, Sage Publications, New Delhi, Jan-June,2009.
36. Mohaiemen Naeem —-'Flying Blind : Waiting for a real reckoning on 1971' in *Economic and Political Weekly*, Vol. –XLVI,No. -36, EPW Research Foundation, Mumbai, 3rd September, 2009.
37. Mastoor Maryam —-'Bangladesh's Political turmoil, 2006-2008 : An analysis' in *Regional Studies*, Vol. –xxviii, No. -4, Institute of Regional Studies, Islamabad,Autumn, 2004.
38. Mohapatra Anil kumar —-'Gujral Doctrine and foreign policy of UPA-II : an interface' in *World focus*, No. -396, Issues -2, New Delhi, 2012.
39. Mehrotra Lakhan —-'India's look east policy : it's origin and development' in *Indian Foreign Affairs Journal*, Vol. -7, No. -1, Cambridge University Press india pvt.ltd.,New Delhi, Jan-Mar, 2012.
40. Moniruzzaman Talukdar —-'Bangladesh in 1976 : Struggle for Survival as an independent state' in *Asian Survey*,Vol. -17, No. -2, Berkley, feb,1977.
41. Mahmud Khalid —-'Bangladesh Politics : Us or Them Syndrome' in *Regional Studies*, Vol. –xxiv, No. -4, Institute of Regional Studies, Islamabad, Autumn, 2006.
42. Muhammad Mustafa Farooq —-'Dakhin asio sahayogita sansthar bis bochhar' in *Sachitra Bangladesh*, Vol. -26, No. -14, Habib Press Ltd., Dhaka,2005. (in Bengali)
43. Nayak Nilanjana —-'Indo-Bangaldesh economic relations : Problems and Prospects' in *West Bengal Political Science Review*, Vol. –xvii, No. -1 and 2 ,West Bengal political science Association,Kolkata,2014.
44. Ogden Chris —-'Norms, Indian foreign policy and the 1998-2004 National Democratic Alliance' in *The Round Table*, Vol. -99,No. -408, Routledge,UK,2010.
45. Parthsarathi G. —-'India Neighborhood Policy : Challenge and Opportunities' in *Indian Foreign Affairs Journal*, Vol. -2, No. -1, Cambridge University Press India Pvt. Ltd., New Delhi,Jan-Mar, 2007.

46. Panda Snehalata —-‘Sino-Indian relations in a new perspective’ in *Strategic Analysis*,Vol. -27, No. -1, The Institute for Defence Studies and Analysis, New Delhi,Jan-Mar,2003.
47. Rudra Kalyan —-‘Nadi sanyog ek avastab prakalpa’ in *Desh*, Vol. -70, No. -24, ABP Pvt.Ltd.,Kolkata,Oct,2003.(in Bengali)
48. Siddiqui Mustafizur R. —-‘Parliamentary by elections and democratic consolidation in Bangladesh (1996-2001)’ in *South Asian Studies*, Vol. -36, No. – 1 and 2, University of Rajasthan, Jaipur , Jan-Dec, 2001.
49. Shil Laxminarayan —-‘Twelveth SAARC Conference : Importance and Significance’ in *Yojona*,Feb, 2004.
50. Sarker Md. Masud —-‘Bangladesh foreign policy vis-à-vis India : Nature and Trends’ in *Regional Studies,* Vol. –xxvi, No. -1, Institute of Regional Studies, Islamabad, Winter, 2007-2008.
51. Seabrook Jeremy —-‘Bangladesh : Enigma of Nationhood’ in *South Asian Journal*,No. -5, Lahore, July-Sep,2004.
52. Saeed Amera —-‘Indian foreign policy under the the BJP’ in ` *Regional Studies*, Vol. – xxii, No. -2, Institute of Regional Studies, Islamabad, Spring,2004.
53. Sen Sumita —-‘The ganga water treaty – from uncertainty towards stability’ in *Asian Studies*, Vol.-xv, No. -1, Netaji Institute for Asian Studies, Calcutta,Jan-June,1997.
54. Sarkar Srimati —-‘Does Democracy Matter? Political Regimes and Indo-Bangladesh Relations’ in *JAIR Journal of International Relations*,Vol.- 2, Issue -1, Bharati Publication, New Delhi, Jan-June, 2015
55. Sen Parama — ‘Tashlimar Badale Gas’ in *Desh*, Vol. -72, No. -16, ABP pvt. Ltd.,Kolkata, June,2005.(in Bengali)
56. Thapliyal Sangeeta —-‘Bangladeshi Migrants in India : A cause for Concern’ in *South Asian Studies* , Vol. -35, No. -2, University of Rajasthan, Jaipur, July-Dec, 2000.
57. Thapliyal Sangeeta —-‘Democracy in Bangladesh : Problems and Challenges’ in *Strategic Analysis*, Vol. –xix, No. -8, Institute for Defense Studies and Analysis, New Delhi, November,1996.
58. Uddin M. Jashim —-‘Security Sector Reform in Bangladesh’ in *South Asian Survey*, Vol. -16, No. -2, Sage Publications, New Delhi, July-Dec,2004.
59. V.K. Vinayaraj —-‘India’s as Threat : Bangladesh Perceptions’ in *South Asian Survey*, Vol. –16, No. -1, Sage Publications, New Delhi, 2009.
60. Yasmin Lailufar —-‘Bangladesh India Tussles’ in *South Asian Journal* ,No. -5, Lahore,Julu-Sep, 2004

BOOKS

1. Ahamad Muzaffar and Kalam Abul (eds.) — , The *Bangladesh Foreign Relations : Changes and Directions,* The University Press, Dhaka,1989.
2. Ahamad Emajuddin (ed.) — *Foreign Policy of Bangladesh – a Small States Imperative*, The University Press Ltd., Dhaka,1984.
3. Azad Salam — *Contribution of India in the War of Liberation of Bangladesh*, Ankur Prakashani, Dhaka, 2003.
4. Azad Salam —-*Bhanga Math*, Ananda Printers, Kolkata,2004. (in Bengali)
5. Behera Navanita Chadha —-*International Relations in South Asia : Search for an Alternative Paradigm*, Sage Publications India Pvt. Ltd., New Delhi,2008.
6. Banerjee Dipankar —-*SAARC in the Twenty –first Century : Towards a Cooperative Future*, India Research Press, New Delhi, 2002.
7. Basu Gautam Kumar —-*International Relations : Theory and Evolution*, West Bengal State Book Board, Kolkata, 2006. (in Bengali)
8. Basu Gautam Kumar — *Samasamayik Antarjatik Samparka*, West Bengal State Book Board, Kolkata, 2012. (in Bengali)
9. Bhattacharya Purushattam and Mazumdar Anindyajyoti (eds.) — *Antarjatik Samparker Ruprekha,* Setu Prakashani, Kolkata, 2007. (in Bengali)
10. Chakraborty Biswanath and Nandi Debasis (eds,) —-*Bharater videshniti o Samparker Gatiprakiti*, Progressive Publishers, Kolkata, 2015. (in Bengali)
11. Chakraborti Shantanu — *Cooperation in South Asia – the Indian Perspective*, K P Bagchi and Company, Kolkata, 2008.
12. Chopra V.D. (ed.) — *India's Foreign Policy in the 21st Century*, Kalpaz Publications, Delhi 1994.
13. Chakravarty S.R.(ed.) — *Foreign Policy of Bangladesh*, Har-Anand Publications, New Delhi, 1994.
14. Chowdhury Jafar Ahmed —-*Bangladesh Foreign Economic Relations*, Oitijjya,Dhaka, 2004.
15. Chakraborty Radharaman (ed.) — *Samakalin Antarjatik Samparka*, Paschimbanga Rajya Pustak Parsad, Kolkata, 1999.(in Bengali)
16. Chakraborty Radharaman and Chakraborty Sukalpa — *Samasamayik Antarjatik Samparka*, Progressive Publishers, Kolkata, 2004. (in Bengali)
17. Dutt V.P. —*India's Foreign Policy*, Vani Prakashani, New Delhi, 1990.
18. Dutt V.P. —*India's Foreign Policy in a Changing World*, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi,1999.
19. Dutt V.P. — *India's Foreign Policy : Since Independence*, National Book Trust, New

Delhi, 2007.

20. Dixit J.N. — *External Affairs –Cross Border Relations*, Roli Books Pvt. Ltd., New Delhi, 2003.
21. Dixit J. N. —*Indian Foreign Policy and its Neighbours*, Gyan Publishing House, New Delhi, 2001.
22. Datta Sreeradha — *Caretaking Democracy – Political Process in Bangladesh 2006-08,* Institute forDefence Studies and Analysis, New Delhi, 2009.
23. Grover Veriender (ed.) —-*Bangladesh Government and Politics*, Deep and Deep Publications Pvt. Ltd., New Delhi, 2000.
24. Ghosh Anjana —-*Thanda Juddha Uttar Antarjatik Samparka* – Sankot O Prabanata, Progressive Publishers, Kolkata, 2003.(in Bengali)
25. Harshe Rajen and Seethi K. M. (eds.) — *Engaging with the World –Critical reflections on India's Foreign Policy*, Orient Longman, New Delhi,2005.
26. Hug M. Obaidul — *Caretaker Government ,Party Politics and Parliamentary Election 2001 in Bangladesh*, Mullick Brothers, Dhaka, 2007.
27. Rashid Harun ur —-*Indo-Bangladesh Relations –An Insiders View*, Har-Anand Publications Pvt. Ltd.,New Delhi, 2002.
28. Hena Abu — *Point – Counterpoint-Not Without Purpose*, Dizzy Publications, Dhaka,2005.
29. Hug Muhammad Shamsul —-*Bangladesh in International Politics – The Dilemma's of the Weak States*, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1993.
30. Jahangir B.K. and Ray Jayanta Kumar (eds.) —-*India –Bangladesh Cooperation Broadening Measures,* K P Bagchi and Company, Calcutta,1997.
31. Kabir Mohammad Humayun (ed.) — *National Security of Bangladesh in the Twenty First Century,* Academic Press and Publishers Ltd., Dhaka, 2000.
32. Khan Abdur Rob (ed.) —-*Towards BIMSTEC –Japan Comprehensive Economic Cooperation – Bangladesh Perspective*, BIISS, Dhaka, 2008.
33. Kapur Ashoke and Wilson A. Jeyaratnam — *Foreign Policy of India and her Neighbours* , St. Martin's Press, New York, 1996.
34. Kabir Sahariyar —*Bangladeshe Sampradayik Nirjatan Ebong Amar Rastradrohita*, Subarna, Dhaka, 2002. (in Bengali)
35. Maniruzzaman Talukder —*Politics and Security of Bangladesh,* University Press Ltd., Dhaka, 1994.
36. Malek S.A. — *Post one –Eleven Perspectives- Stream of thoughts Part –II*, News and Views Publications, Dhaka, 2009.
37. Maddan Davinder Kumar — *Indo-Bangladesh Economic Relations and SAARC*, Deep and Deep Publications, New Delhi, 1996.

38. Nirjataner Dalil -2001 –*Sanmilita Samajik Andolon, Ankur Prakashani*, Dhaka, 2002. (in Bengali)
39. Nandi Debasis (ed.) — Glani, Nandan, Dhaka, 1991. (in Bengali)
40. Osmany Mufleh R. and Kabir Mohammad Humayun (eds.) —-*Global War on Terror : Bangladesh Perspective*, Academic Press and Publishers Library, Dhaka, 2007.
41. Rao P. V. (ed.) — *India and ASEAN Partners Summit*, KW Publishers Pvt. Ltd. ,New Delhi, 2008.
42. Raju Adluri Subramanyam — *Reconstructing South Asia : An agenda*, Gyan Publishing house, New Delhi , 2007.
43. Singh Jaswant — *Defending India* , Macmillan India Ltd., Chennai, 1999.
44. Sharma R. R. (ed.) — *India and Emerging Asia* , Sage Publications ltd. , London, 2005.
45. Saha Rekha — *India – Bangladesh Relations*, Minerva Associates, Calcutta, 2000.
46. Sobhan Farooq (ed.) — *Dynamics of Bangladesh – India Relations* , The University Press ,Dhaka, 2005.
47. Samaddar Ranabir — *The Marginal Nation – Transborder Migration from Bangladesh to West Bengal*, Sage Publications, New Delhi, 1999.
48. Sobhan Rehman — *From aid dependence to self Relience : Development Options for Bangladesh* , The University Press Ltd. ,Dhaka, 1990.
49. Sikri Rajiv — *Challenge and Strategy : Rethinking India's Foreign Policy*, Sage Publications India Pvt. Ltd., New Delhi, 2009.
50. Singh Rajkumar —*Relation of NDA & UPA with Neighbours* , Gyan Publishing House, New Delhi, 2010.
51. Sen Baniprasad — *Samakalin Antarjatik Samparka : Bisoy Binnyas o Byakhya*, Mitram, Kolkata, 2010. (in Bengali)
52. Tajuddin Muhammad — *Foreign Policy of Bangladesh – Liberation War to Seikh Hasina,* National Book Organisation, New Delhi, 2001.
53. Sinha Atish and Mohta Madhup (eds.) — *Indian Foreign Policy – Challenges and Opportunities ,* Academic Foundation, New Delhi, 2007.
54. Zafarullah Habib and Taslim M. A. and Chowdhury Anis (eds.) — *Policy Issues in Bangladesh*, South Asian Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1994

JOURNALS

Asian Recorder (New Delhi)
Asian Studies (Kolkata)
Asian Survey (Berkeley)
Contemporary South Asia (UK)
Desh(Kolkata)

Economic and Political Weekly (Mumbai)
Frontline (Chennai)
Indian Foreign Affairs Journal (Cambridge University Press India Pvt. Ltd.,New Delhi)
Jadavpur Journal of International Relations (Jadavpur University, Kolkata)
JAIR Jounal of International Relations (New Delhi)
Regional Studies (Islamabad)
Socialist Perspective(New Delhi)
South Asian Journal (Lahore)
South Asian Studies (Rajasthan University, Jaipur)
South Asian Survey(New Delhi)
Strategic Analysis (New Delhi)
Strategic Digest (New Delhi)
The Round Table (University of London, UK)
West Bengal Political Science Review (Kolkata)
World Focus (New Delhi)
Yojona(Kolkata)

NEWSPAPERS /NEWS MAGAGINES

Anandabazar Patrika (Kolkata),(in Bengali)
Asian Times(New Delhi)
Bangladesh Observer (Dhaka)
Bartaman (Kolkata), (in Bengali)
Dainik Janakantha(Dhaka), (in Bengali)
Dainik Statesman(Kolkata),(in Bengali)
Economic and Political Weekly (Mumbai)
Frontline (Chennai)
Ganasakti(Kolkata),(in Bengali)
Indian Express (New Delhi)
News Behind The News (Dhaka)
SAFMA (Lahore)
The Daily Star (Dhaka)
The Hindu (Chennai)
The Statesman (New Delhi)
The Telegraph (Kolkata)
Vorer Kagoj (Dhaka), (in Bengali)

INTERVIEWS

1. Anisuzzaman, Emeritus Professor, University of Dhaka, An Interview with D. Mahapatra in Vidyasagar University, Midnapore, dated- 30.05.2012
2. Sahariar Kabir, Journalist & Writer of Bangladesh, an interview with D. Mahapatra in Vidyasagar University Midnapore, dated 31.05.2012
3. Mesbah Kamal, Chairperson, Research and Development Collective (RDC), University of Dhaka, An Interview with D. Mahapatra in Vidyasagar University, Midnapore, dated- 01.06.2012

WEBSITES

www.meadev.gov.in
www.amnesty.org
www.unodc.org
www.meaindia.nic.in
www.acc.org.bd
www.isas.nus.edu.sg
www.aspenindia.org
www.idsa.in
www.ipcs.org
www.jair.ogg.in

পরিশিষ্ট

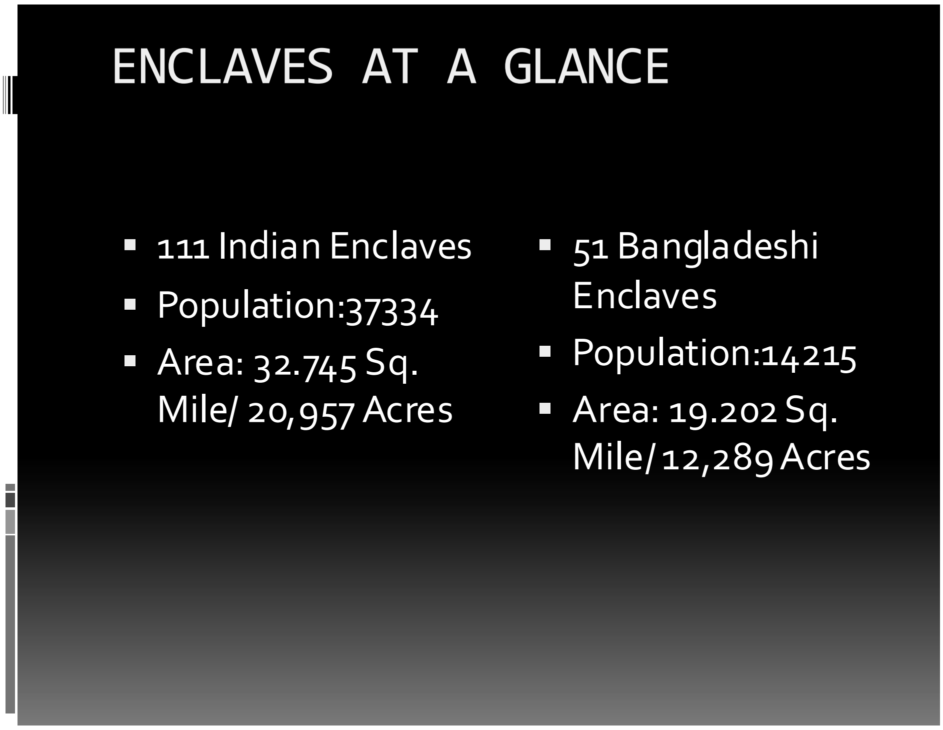

6th May in Rajya Sabha

8th May in Lok sabha

11th May in Lok sabha re introduced

6th June Land Swap Deal sign in Dhaka

31st July Land exchanged

30th Nov human exchanged

969 person came to India from Indian enclaves in Bangladesh

Nehru – Noon Treaty 1958

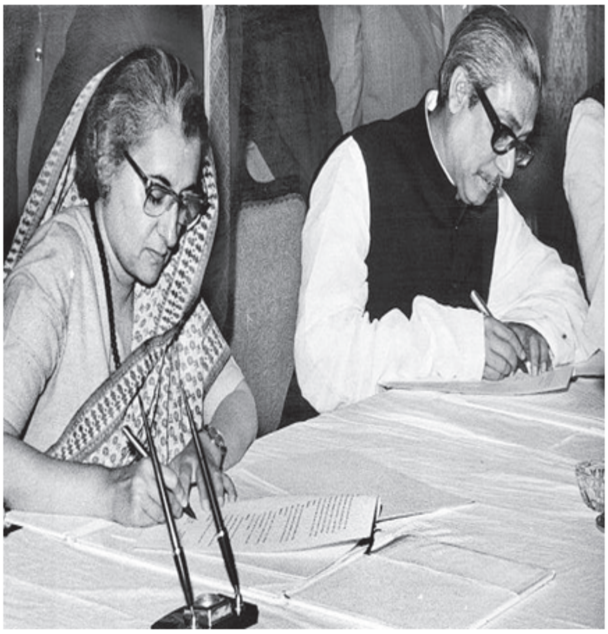

Indira – Mujib Treaty 1974

Manmohan – Hasina treaty 2011

Modi – Hasina 2015

Mamata gives Shawls to enclave people December 10 , 2014 at Nayarhat, Coochbehar

Indian Enclave people from Bangladesh to India after enclave exchange

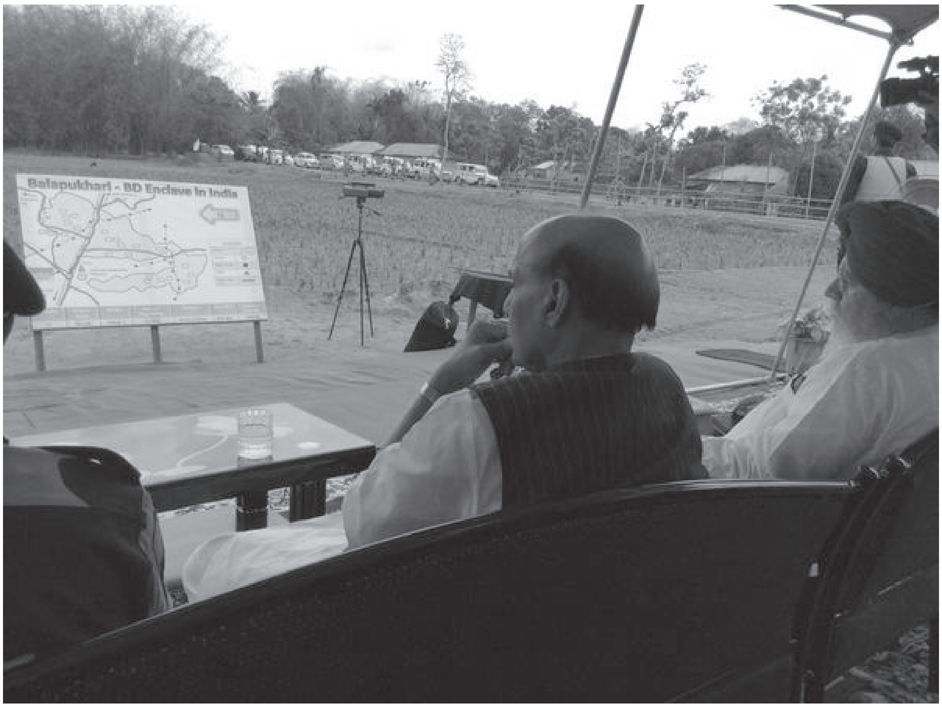

Home minister at Kuchlibari to visti border

Ershad

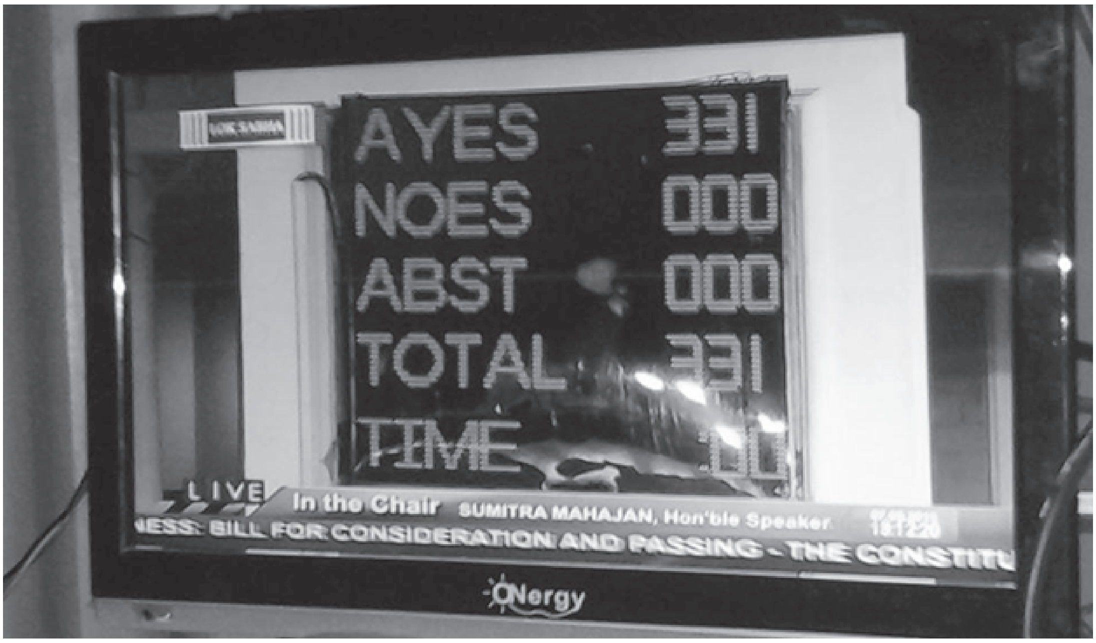

Hasina and Susma Swaraj in 2014

Appendices

1. 1972 Friendship Treaty
2. 1974 Tripartite Agreement
3. 1974 Territorial Water and Maritime Zones Act
4. 1974 Law Boundary Demarcation Agreement
5. 1977 Ganges Water Agreement
6. 1996 Ganges Water Treaty

Appendix 1

Treaty of Friendship, Cooperation and Peace between the Republic of India and the People's Republic of Bangladesh

Inspired by common ideals of peace, secularism, democracy, socialism and nationalism, Having struggled together for the realisation of these ideals and cemented ties of friendship through blood and sacrifices which led to the triumphant emergence of a free, sovereign and independent Bangladesh.

Determined to maintain fraternal and good neighbourly relations and transform their border into a border of eternal peace and friendship.

Adhering firmly to the basic tenets of non-alignment, peaceful co-existence, mutual cooperation, non-interference in internal affairs and respect for territorial integrity and sovereignty.

Determined to safeguard peace, stability and security and to promote progress of their respective countries through all possible avenues of mutual cooperation.

Determined further to expand and strengthen the existing relations of friendship between them.

Convinced that the further development of friendship and cooperation meets the national interests of both States as well as the interests of lasting peace in Asia and the world.

Resolved to contribute to strengthening world peace and security and to make efforts to bring about a relaxation of international tension and the final elimination of vestiges of colonialism, racialism and imperialism.

Convinced that in the present-day world international problems can be solved only through cooperation and not through conflict or confrontation.

Reaffirming their determination to follow the aims and principles of the United Nations Charter.

The People's Republic of Bangladesh, on the one hand, and the Republic of India, on the other, have decided to conclude the present Treaty.

Article 1

The High Contracting Parties, inspired by the ideals for which their respective peoples struggled and made sacrifices together, solemnly declare that there shall be lasting peace and friendship between their two countries and their peoples. Each side shall respect the independence, sovereignty and territorial integrity of the other and refrain from interfering in the internal affairs of the other side.

The High Contracting Parties shall further develop and strengthen the relations of friendship, good-neighbourliness and all-round cooperation existing between them, on the basis of the above-mentioned principles as well as the principles of equality and mutual benefit.

Article 2

Being guided by their devotion to the principle of equality of all peoples and States irrespective of race or creed, the High Contracting Parties condemn colonialism and racialism in all forms and manifestations and are determined to strive for their final and complete elimination.

The High Contracting Parties shall cooperate with other States in achieving these aims and support the just aspirations of peoples in their struggle against colonialism and racial discrimination and for their national liberation.

Article 3

The High Contracting Parties reaffirm their faith in the policy of non-alignment and peaceful co-existence as important factors for easing tension in the world, maintaining international peace and security, and strengthening national sovereignty and independence.

Article 4

The High Contracting Parties shall maintain regular contacts with each other on major international problems affecting the interests of both States, through meetings and exchanges of views at all levels.

Article 5

The High Contracting Parties shall continue to strengthen and widen their mutually advantageous and all-round cooperation in the economic, scientific and technical fields. The two countries shall develop mutual cooperation in the fields of trade, transport. and communications between them on the basis of the principles of equality, mutual benefit and the most favoured nation principle.

Article 6

The High Contracting Parties further agree to make joint studies and take joint action in the fields of flood control, river basin development and the development of hydro-electric power and irrigation.

Article 7

The High Contracting Parties shall promote relations in the fields of art, literature, education, culture, sports and health.

Article 8

In accordance with the ties of friendship existing between the two countries each of the High Contracting Parties solemnly declares that it shall not enter into or participate in any military alliance directed against the other Party.

Each of the High Contracting Parties shall refrain from any aggression against the other Party and shall not allow the use of its territory for committing any act that may cause military damage to or constitute a threat to the security of the other High Contracting Party.

Article 9

Each of the High Contracting Parties shall refrain from giving any assistance to any third party taking part in an armed conflict against the other Party. In case either Party is attacked or threatened with attack, the High Contracting Parties shall immediately enter into mutual consultations in order to take appropriate effective measures to eliminate the threat and thus ensure the peace and security of their countries.

Article 10

Each of the High Contracting Parties solemnly declares that it shall not undertake any commitment, secret or open, toward one or more states which may be incompatible with the present Treaty.

Article 11

The present Treaty is signed for a term of Twenty-five years and shall be subject to renewal by mutual agreement of the High Contracting Parties.

The Treaty shall come into force with immediate effect from the date of its signature.

Article 12

Any differences in interpreting any article or articles of the present Treaty that may arise between the High Contracting Parties shall be settled on a bilateral basis by peaceful means in a spirit of mutual respect and understanding.

Done in Dacca on the Nineteenth Day of March, Nineteen Hundred and Seventy-two

(Sheikh Mujibur Rahman)
Prime Minister
For the People's Republic of Bangladesh

(Indira Gandhi)
Prime Minister
For the Republic of India

Appendix 2

Text of the Bangladesh-India-Pakistan Agreement Signed in New Delhi on April 9, 1974

1. On July 2, 1972, the President of Pakistan and the Prime Minister of India signed an historic agreement at Simla under which they resolved that "the two countries put an end to the conflict and confrontation 'that have hitherto marred their relations and work for the promotion of a friendly and harmonious relationship and the establishment of durable peace in the sub-continent." The Agreement also provided for the settlement of "their differences by peaceful means through bilateral negotiations or by any other peaceful means mutually agreed upon.
2. Bangladesh welcomed the Simla Agreement. The Prime Minister of Bangladesh strongly supported its objective of reconciliation, good neighbourliness and establishment of durable peace in the sub-continent.
3. The humanitarian problems arising in the wake of the tragic events of 1971 constituted a major obstacle in the way of reconciliation and normalisation among the countries of the sub-continent. In the absence of recognition, it was not possible to have tripartite talks to settle the humanitarian problems as Bangladesh could not participate in such a meeting except on the basis of sovereign equality.
4. On April 17, 1973, India and Bangladesh took a major step forward to break the deadlock on the humanitarian issues by setting aside the political problems of recognition. In a Declaration issued on that date they said that they "are resolved to continue their efforts to reduce tension, promote friendly and harmonious relationship in the sub-continent and work together towards the establishment of a durable peace. " Inspired by this vision and "in the larger interests of reconciliation, peace and stability in the sub-continent" they jointly proposed that the problems of the detained and stranded persons should be resolved on humanisation

the Prime Minister of Bangladesh and appealed to the people of Bangladesh to forgive and forget the mistakes of the past in order to promote reconciliation. Similarly, the Prime Minister of Bangladesh had declared with regard to the atrocities and destruction committed in Bangladesh in 1971 that he wanted the people to forget the past and to make a fresh start, stating that the people of Bangladesh knew how to forgive.

15. In the light of the foregoing, and in particular, having regard to the appeal of the Prime Minister of Pakistan to the people of Bangladesh to forgive and forget the mistakes of the past, the Foreign Minister of Bangladesh stated that the Government of Bangladesh had decided not to proceed with the trials as an act of clemency. It was agreed that the 195 prisoners of war may be repatriated to Pakistan along with the other prisoners of war now in the process of repatriation under the Delhi Agreement.
16. The Minister expressed their conviction that the above agreements provide a firm basis for the resolution of the humanitarian problems arising out of the conflict of 1971. They reaffirmed the vital stake the seven hundred million people of the three countries have in peace and progress and reiterated the resolve of their Governments to work for the promotion of normalisation of relations and the establishment of durable peace in the sub-continent.

Signed in New Delhi on April 9, 1974 in three originals, each of which is equally authentic.

Sd/-	Sd/
(Kamal Hossain)	(Swaran Singh)
Minister of Foreign Affairs,	Minister for External Affairs
Government of Bangladesh.	Government of India.

(Sd/- Aziz Ahmed)
Minister of State for Defence
and Foreign Affairs,
Government of Pakistan.

Appendix 3

Act No. XXW OF 1974

An Act to provide for the declaration of the territorial waters and maritime zone:

WHEREAS clause (2) of Article 143 of the Constitution provides that Parliament may, from time to time, by law provide for the determination of the territorial waters and the continental shelf of Bangladesh;

AND WHEREAS it is necessary to provide for the declaration of the territorial waters, continental shelf and other maritime zones and for matter ancillary thereto;

It is hereby enacted as follows:

1. Short title------This Act may be called the Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974.
2. Definitions-In this Act, unless there is anything repugnant to the subject or context:
    a. "conservation zone" means a conservation zone established under section 6;
    b. "contiguous zone" means the zone of the high seas declared by section 4 to be the contiguous zone of Bangladesh;
    c. "continental shelf' means the continental shelf' of Bangladesh referred to in section 76;
    d. "economic zone" means the zone of the high seas declared under section 5 to be the economic zone of Bangladesh;
    e. "territorial waters" means the limits of sea declared under section 3 to be the territorial waters of Bangladesh.
3. Territorial waters--(1) The Government may, by notification in the official Gazette, declare the limits of the sea beyond the land territory and internal waters of Bangladesh which shall be the territorial waters of Bangladesh specifying the notification the baseline-
    a. from which such limits shall be measured; and
    b. the waters on the land territory side of which shall form part of the internal waters of Bangladesh

(2) Where a single island, rock or a composite group thereof constituting the part of the territory of Bangladesh is situated seawards from the main coast or baseline, territorial waters shall extend to the limits declared by notification under subsection

(1) Measured from the low waterline along the coast of such island, rock or composite group.

(3) The Sovereignty of the Republic extends to the territorial waters as well as to the air space over and the bed and subsoil of, such waters,

(4) No foreign ship shall, unless it enjoys the right of innocent passage, pass through the territorial water

(5) Foreign ship having the right of innocent passage throughout the territorial waters shall, while exercising such right, observe the law and rules in foresee in Bangladesh.

(6) The Government may, by notification in the official Gazette, suspend, in the specified areas of the territorial waters, the innocent passage of any ship if it is of opinion that such suspension is necessary for the security of the Republic.

(7) No foreign warship shall pass through the territorial waters except with the previous permission of the Government.

(8) The Government may take such steps as may be necessary:

a. to prevent the passage through the territorial waters of any, foreign ship having no right of innocent passage;

b. to prevent and punish the contravention of any law or rule in force in Bangladesh by any foreign ship exercising the right of innocent passage;

c. to prevent the passage of any foreign warship without previous permission of Government; and

d. to prevent and punish any activity which is prejudicial to the security or interest of the Republic.

Explanation-In this section "warship" includes any surface or sub-surface vessel or craft which is or may be used for the purpose of naval warfare.

4. Contiguous zone.

(1) The zone of the high seas contiguous to the territorial waters and extending seawards to a line six nautical miles measured from the outer limits of the territorial waters is hereby declared to be the contiguous zone of Bangladesh.

(2) The Government may exercise such powers and. take such measures in or in respect of the contiguous zone as it may consider necessary to prevent and punish the contravention of, and attempt to contravene, any law or regulation in force in Bangladesh relating to
a. the security of the Republic;
b. the immigration and sanitation; and
c. customs and other fiscal matters.

5. Economic zone
(1) The Government may by notification in the official Gazette, declare any zone of the high seas adjacent to the territorial waters to be the economic zone of Bangladesh specifying therein the limits of such zone.
(2) All natural resource within the economic zone, both living and non-living, on or under the seabed and subsoil or on the water surface or within the water column shall vest exclusively in the Republic.
(3) Nothing in sub-section (2) shall be deemed to affect fishing within the economic zone by a citizen of Bangladesh who uses for the purpose vessels -which are not *mechanically propelled.

6. Conservation zone
The Government may, with a view to the maintenance of the productivity of the living resources of the sea, by notification in the official Gazette, establish conservation zone in such areas of the sea adjacent to the territorial waters as may be specified in the notification and may take such conservation measures in any zone so established as it may deem appropriate for the purpose including measures to protect the living resources of the sea from indiscriminate exploitation, depletion or destruction.

7. Continental shelf. (1) The continental shelf of Bangladesh comprises:
a. the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast of Bangladesh but beyond the limits of the territorial waters up to the outer limits of the continental margin bordering on the ocean basin or abyssal floor; and
b. the seabed and subsoil of the analogous submarine areas adjacent to the coasts of any island, rock or any composite group thereof constituting part of the territory of Bangladesh.
(2) Subject to sub-section (1) the Government may, by notification in the official Gazette, specify the limits thereof.
(3) No person shall, except under and in accordance with the terms of, a licence or permission granted by Government

explore or exploit any resources of the continental shelf or carry out any search or excavation or conduct any research within the limits of the continental shelf. Provided that no such licence or permission shall be necessary for fishing by a citizen of Bangladesh who uses for the purpose vessels which are not mechanically propelled.

Explanation-Resources of the continental shelf include mineral and other non-living resources together with living organisms belonging to sedentary species, that is to say, organisms which at the harvestable stage either are immobile or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

(4) The Government may construct, maintain or operate within the continental shelf installations and other devices necessary for the exploration and exploitation of its resources.

8. Control of pollution. The Government may with a view to preventing and controlling marine pollution and preserving the quality and ecological balance in the marine environment in the high seas adjacent to the territorial waters, take such measures as it may deem appropriate for the purpose.

9. Power to make rules

   (1) The Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

   (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide:

      a. for the regulation of the conduct of any person in or, upon the territorial waters, contiguous zone, economic zone, conservation zone and continental shelf,
      b. for measures to protect use and exploit the resources of the economic zone;
      c. for conservation measures to protect the living resources on the sea;
      d. for measures regulating the exploration and exploitation of resources within the continental shelf,
      e. for measures. designed to prevent and control of marine pollution of the high seas.

   (3) In making any rule under this section the Government may provide that a contravention of the rule shall be punishable with imprisonment which may extent to one year or with fine which may extend to five thousand takas.

The Bangladesh *Gazette, Dhaka,* April 16, 1974
Ministry of Foreign Affairs
Dhaka, the 13th April,1974.

No. Lt-l/3/74. In exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Territorial Waters and Maritime Zones Act., 1974 (Act No. XXVI of 1974), and in suppression of any previous declaration on the subject, the Government in pleased to declare that the limit of the sea specified in paragraph 2 beyond the land territory and internal waters of Bangladesh shall be the territorial waters of Bangladesh.

2. The limits of the sea referred to in paragraph 1 shall be twelve nautical miles measured seaward and the baseline set out in paragraph 3 so that each point of the outer limit of the sea to the nearest point inward on the baselines is twelve nautical miles.
3. The baseline from which territorial waters shall be measured seaward are the straight lines linking successively the baseline points net out below:

Baseline Point	*Geographical Co-ordinates Latitude*	*Baseline Point Longitude*
No. 1	21 12 00 N	89 06 4SE.
No. 2	21 15 00 N	89 16 00 E.
No. 3	21 29 00 N	89 36 00 E.
No. 4	212100 N	89 55 00 E.
No. 5	21 1100 N	90 33 00 E.
No. 6	2107 30 N	9106 00 E.
No. 7	21 10 00 N	91 56 00 E.
No. 8	20 2145 N	92 17 30 E.

No. LT-11/3/74. - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Territorial waters and Maritime Zones Act 1974 (Act No. XXVI of 1974), the Government is pleased to declare that the zone of the high seas extending to 200 national miles measured from the baselines shall be the zone of Bangladesh.

By order of the President

FAKHRUDDIN AHMED
Additional Foreign Secretary.

11. Baikari Khal. In the Baikari Khal, the boundary should be demarcated on the agreed basis and principles, namely, that the ground shall prevail, i.e. as per the agreement reached between the Directors of the Land Records and Surveys of West Bengal and erstwhile East Pakistan in 1949. The boundary will be a fixed boundary.
12. Enclaves. The Indian enclaves in Bangladesh and the Bangladesh enclaves in India should be exchanged expeditiously, excepting the enclaves mentioned in paragraph 14 without claim to compensation for the additional area going to Bangladesh.
13. Hilli. The area will be demarcated in accordance with Radcliffe Award and the line drawn by him on the map.
14. Berubari. India will retain the southern half of South Berubari Union No. 12 and the adjacent enclaves, measuring an area of 2.64 square miles approximately, and in exchange Bangladesh will retain the Dahagram and Angarpota enclaves. India will lease in perpetuity to Bangladesh an area of 178 metres X85 metres near 'Tin Bigha' to connect Dahagram with Panbari Mouza (PS Patgram) of Bangladesh.
15. Lathitilla-Dumabari. From point Y (the last demarcated boundary pillar position), the boundary shall run southwards along the Patheria Hills RF boundary up to the point where it meets the western boundary of Dumabari Mouza. Thence, along the same Mouza boundary up to the tri-junction of Mouzas Dumabari, Lathitilla and Bara Putnigaon through the junction of the two Mouzas Dumabari and Lathitilla. From this point it shall run along the shortest distance to meet the mid-stream of Putni Chara. Thence it shall run generally southwards along the mid-stream of the course of Putni Chara at the time of demarcation, till it meets the boundary between Sylhet (Bangladesh) and Tripura (India).

Article 2

The Governments of Bangladesh and India agree that territories in adverse possession in areas already demarcated in respect of which boundary strip maps are already prepared, shall be exchanged within six months of the signing of the boundary strip maps by the plenipotentiaries. They may sign the relevant maps as early as possible and in any case not later than the 31st December, 1974. Early measures may be taken to print maps in respect of other areas where demarcation has already taken place. These should be printed by 31st May, 1975 and signed by the plenipotentiaries thereafter in order that the exchange of adversely held possessions in these areas may take place by the 31st December, 1975. In sectors still to be demarcated

transfer of territorial jurisdiction may take place within six months of the signature by plenipotentiaries on the concerned boundary strip maps.

Article 3

The Governments of Bangladesh and India agree that when areas are transferred, the people in these areas shall be Given the right of staying on where they are, as nationals of the State to which the areas are transferred. Pending demarcation of the boundary and exchange of territory by mutual agreement, there should be no disturbance of the status quo and peaceful conditions shall be maintained in the border regions. Necessary instructions in this regard shall be issued to the local authorities on the border by the two countries.

Article 4

The Governments of Bangladesh and India agree that any dispute concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled peacefully through mutual consultations.

Article 5

This Agreement shall be subject to ratification by the Governments of Bangladesh and India and Instruments of Ratification shall be exchanged as early as possible. The Agreement shall take effect from the date of the exchange of the Instruments of Ratification.

Signed in New Delhi on May 16, 1974, in two originals each of which is equally authentic.

For the Government of the
People's Republic of Bangladesh.
(Sheikh Mujibur Rahman)
Prime Minister of Bangladesh.

For the Government of the
People's Republic of India.
(Indira Gandhi)
Prime Minister of India.

Appendix 5

Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India on Sharing of the Ganges Waters at Farakka and on Augmenting its Flows: (1977)

The Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India,

DETERMINED to promote and strengthen their relations of friendship and good neighbourliness,

INSPIRED by the common desire of promoting the well-being of their peoples,

BEING desirous of sharing by mutual agreement the waters of the international rivers flowing through the territories of the two countries and of making the optimum utilisation of the water resources of their region by joint efforts,

RECOGNISING that the need, of making an interim arrangement for sharing of the Ganges Waters at Farakka in a spirit of mutual accommodation and the need for a solution of the long-term problem of augmenting the flows of the Ganges are in the mutual interests of the peoples of the two counties,

BEING desirous of finding a fair solution of the question before them, without affecting the rights and entitlements of either country other than those covered by this Agreement, or establishing any general principles of law or precedent,

Have Agreed as Follows

A. Arrangements for sharing of the waters of the Ganges at Farakka

Article 1

The quantum of waters agreed to be released by India to Bangladesh will be at Farakka.

Article 2

(i) The sharing between Bangladesh and India of the Ganges waters at Farakka from the Ist January to the 31st May every year will be with reference to the quantum shown in column 2 of the Schedule annexed hereto which is based on 75 per cent availability calculated from the recorded flows of the Ganges at Farakka from 1948 to 1973.

(ii) India shall release to Bangladesh waters by 10-day periods in quantum shown in column 4 of the Schedule:

Provided that if the actual availability at Farakka of the Ganges waters during a 10-day period is higher or lower than the quantum shown in column 2 of the Schedule it shall be shared in the proportion applicable to the period;

Provided further that if during a particular 10-day period, the Ganges flows at Farakka come down to such a level that the share of Bangladesh is lower than 80 per cent of the value shown in column 4, the release of waters to Bangladesh during that 10-day period shall not fall below 80 per cent of the value shown in column 4.

Article 3

The waters released to Bangladesh at Farakka under Article I shall not be reduced below Farakka except for reasonable uses of waters, not exceeding 200 cusecs, by India between Farakka and the point on the Ganges where both its banks are in Bangladesh.

Article 4

A Committee consisting of the representatives nominated by the two Governments (hereinafter called the Joint Committee) shall be constituted. The Joint Committee shall set up suitable teams at Farakka and Hardinge Bridge to observe and record at Farakka the daily flows below Farakka Barrage and in the Feeder Canal, as well as at Hardinge Bridge.

Article 5

The Joint Committee shall decide its own procedure and method of functioning.

Article 6

The Joint Committee shall submit to the two Governments all data collected by it and shall also submit a yearly report to both the Governments.

Article 7

The Joint Committee shall be responsible for implementing the arrangements contained in this part of the Agreement and examining any difficulty arising out of the implementation of the above arrangements and of the operation of Farakka Barrage. Any difference or dispute arising in this regard, if not resolved by the Joint Committee, shall be referred to a panel of an equal number of Bangladeshi and Indian experts nominated by the two Governments. If the difference or dispute still remains unresolved, it shall be referred to the two Governments which shall meet urgently at the appropriate level to resolve it by mutual discussion and failing that by such other arrangements as they may mutually agree upon.

B. Long-Term Arrangements

Article 8

The two Governments recognise the need to cooperate with each other in finding a solution to the long-term problem of augmenting the flows of the Ganges during the dry season.

Article 9

The Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission established by the two Governments in 1972 shall carry out investigation and study of schemes relating to the augmentation of the dry season flows the Ganges, proposed or to be proposed by either Government with a view to finding a solution which is economical and feasible. It shall submit its recommendations to the two Governments within a period of three years.

Article 10

The two Governments shall consider and agree upon a scheme or schemes, taking into account the recommendations of the Joint Rivers Commission, and take necessary measures to implement it or them as speedily as possible.

Article 11

Any difficulty, difference or dispute arising from or with regard to this part of the Agreement, if not resolved by the Joint Rivers Commission, shall be

referred to the two Governments which shall meet urgently at the appropriate level to resolve it by mutual discussion.

C. Review and Duration

Article 12

The provisions of this Agreement will be implemented by both parties in good faith. During the period for which the Agreement continues to be in force in accordance with Article XV of the Agreement, the quantum of waters agreed to be released to Bangladesh at Farakka in accordance with this Agreement shall not be reduced.

Article 13

The Agreement will be reviewed by the two Governments at the expiry of three years from the date of coming into force of this Agreement. Further reviews shall take place six months before the expiry of this Agreement or as maybe agreed upon between the two Governments.

Article 14

The review or reviews referred to in Article XIII shall entail consideration of the working, impact, implementation and progress of the arrangements contained in parts A and B of this Agreement.

Article 15

This Agreement shall enter into force upon signature and shall remain in force for a period of 5 years from the date of its coming into force. It may be extended further for a specified period by mutual agreement in the light of the review or reviews referred to in Article XIII.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by the respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Dacca on the 5th November, 1977 in the Bengali, Hindi and English languages. In the event of any conflict between the texts the English text, shall prevail.

Signed/-

Rear Admiral Musharraf Hussain Khan

Chief of Naval Staff and Member, President's Council of Advisers in Charge of the Ministry of Communications, Flood Control, Water

Signed 1-

Surjit Singh Barnala

Minister of Agriculture and Irrigation, Government of the Republic of India.

Resources and Power, Government
of the People's Republic of Bangladesh.
FOR THE GOVERNMENT OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
BANGLADESH.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF
INDIA.

SCHEDULE
(Vide Article II (I))

Sharing of waters at Farakka between 1st January and the 31st May every year

1 *Period on 75 per cent availability from observed data (1948-73).*		2 *Flows reaching Farakka (based Farakka.*	3 *Withdrawal by India at*	4 *Release to Bangladesh.*
		Cusecs	*Cusecs*	*Cusecs*
January	1-10	98,500	40,000	58,500
	11-20	89,750	38,500	51,250
	21-31	82,500	35,000	47,500
February	1-10	79,250	33,000	46,250
	11-20	74,000	31,500	42,500
	21-28,129	70,000	30,750	39,250
March	1-10	65,250	26,750	38,500
	11-20	63,500	25,500	38,000
	21-31	61,000	25,000	36,000
April	1-10	59,000	24,000	35,000
	11-20	55,500	20,750	34,750
	21-30	55,000	20,500	34,500
May	1-10	56,500	21,500	35,000
	11-20	59.250	24.000	35,250
	21-31	65,500	26,750	38,750

SIDE LETTER TO THE AGREEMENT 1

5th November, 1977

Excellency

In the course of the discussions which have taken place between us in connection with the conclusion of the Agreement between Bangladesh and

India on the sharing of the Ganges Waters at Farakka and on Augmenting its Flows, the two Governments have reached an understanding to the effect that the words "proposed or to be proposed by, either Government" occurring in Article IX in part B of the Agreement, relate to any schemes which may have been proposed or may be proposed by Bangladesh or India and do not exclude any scheme or schemes for building storages in the upper reaches of the Ganges in Nepal. The two Governments have also agreed to take such further steps as may be necessary for the investigation and study of any scheme or schemes.

The two Governments have further agreed that all the proposals designed to find a solution of the long-term problem, as mentioned in Article IX, shall be treated on an equal footing and accorded equal priority.

1 shall be grateful if you will kindly confirm that the above sets out correctly the understanding reached between our two Governments. Upon receiving your reply confirming this understanding, Article IX of the Agreement shall be interpreted and applied along with the understanding embodied in this letter.

Yours sincerely,
M. H. KHAN

SIDE LETTER TO THE AGREEMENT: 2

5th November, 1977

Excellency,

1 have today received your letter of 5th November, 1977 which reads as follows:

"In the course of the discussions which have taken place between us in connection with the conclusion of the Agreement between Bangladesh and India on the Sharing of the Ganges Waters at Farakka and on Augmenting its Flows, the two Governments have reached an understanding to the effect that the words "proposed or to be proposed by either Government", occurring in Article IX in part of B'of the Agreement, relate to any scheme or schemes which may have been proposed or may be proposed by Bangladesh or India and do not exclude any scheme or schemes for building storages in the upper reaches of the Ganges in Nepal. The two Governments have also agreed to take such further steps as may be necessary for the investigation and study of any scheme or schemes.

The two Governments have further agreed that all the proposals designed to find a solution of the long-term problem, as mentioned in Article IX, shall be treated on an equal footing and accorded equal priority."

On behalf of the Government of India I hereby confirm the understanding embodied in your afore-mentioned letter and agree that Article IX of the Agreement referred to in your letter shall be interpreted and applied along with the understanding embodied in the letters exchanged between us.

Yours sincerely
S. S. BARNALA

Appendix 6

Treaty between the Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Sharing of the Ganga/Ganges Waters: (1996)

The Government of the Republic of India and the Government of the People's Republic of Bangladesh,

DETERMINED to promote and strengthen their relations of friendship and good neighbourliness,

INSPIRED by the common desire of promoting the well being of their people's, Being desirous of sharing by mutual agreement the waters of the international rivers flowing through the territories of the two countries and of making the optimum utilisation of the water resources of their region in the fields of flood management, irrigation, river basin development and generation of hydro-power for the mutual benefit of the people's of the two countries,

RECOGNISING that the need for making an arrangement for sharing of the Ganga 1 Ganges waters at Farakka in a spirit of mutual accommodation and the need for a solution to the long-term problem of augmenting the flows of the Ganga 1 Ganges are in the mutual interests of the people's of the two countries,

BEING desirous of finding a fair and just solution without affecting the rights and entitlements of either country other that those covered by this Treaty or establishing any general principles of law or precedent,

Have Agreed as Follows

Article 1

The quantum of waters agreed to be released by India to Bangladesh will be at Farakka.

Article 2

(i) The sharing between India and Bangladesh of the Ganga 1 Ganges water at Farakka by ten day periods from the 1st January to the 31st May every year will be with reference to the formula at Annexure-I and an indicative schedule giving the implication of the sharing arrangement under Annexure-1 is at Annexure-II.

(ii) The ' indicative schedule at Annexure II, as referred to in sub para (i) above, is based on 40 years (1949-1988) 10 day period average availability of water at Farakka. Every effort would be made by the upper riparian to protect flows or water at Farakka as in the 40-years average availability as mentioned above.

(iii) In the event flow at Farakka falls below 50,000 cusecs in any 10-day period, the two governments will enter into immediate consultations to make adjustments on an emergency basis, in accordance with the principles of equity, fair play and no harm to either party.

Article 3

The water released to Bangladesh at Farakka under Articles I shall not be reduced below Farakka except for reasonable uses of waters, not exceeding 200 cusecs, by India between Farakka and the point on the Ganga 1 Ganges where both its banks are in Bangladesh.

Article 4

A Committee consisting of representatives nominated by the two Governments in equal number (hereinafter called the Joint Committee) shall be constituted following the signing of this Treaty. The Joint Committee shall set up suitable teams at Farakka and Hardinge Bridge to observe and record at Farakka the daily flow below Farakka Barrage, in the Feeder Canal, and at the Navigation Lock, as well as at the Hardinge Bridge.

Article 5

The Joint Committee shall decide its own procedure and method of functioning.

Article 6

The Joint Committee shall submit to the two Governments all data collected by it and shall also submit a yearly report to both the Governments. Following submission of the reports the two governments will meet at appropriate levels to decide upon such further actions as may be needed.

Article 7

The Joint Committee shall be responsible for implementing the arrangements contained in this Treaty and examining any difficulty arising out of the implementation of the above arrangements and of the operation of Farakka Barrage. Any difference or dispute arising in this regard, if not resolved by the Joint Committee, shall be referred to the Indo-Bangladesh Joint Rivers Commission. If the difference or the dispute still remains unresolved, it shall be referred to the two Governments which shall meet urgently at the appropriate level to resolve it by mutual discussion.

Article 8

The two Governments recognise the need to cooperate with each other in finding a solution to the long-term problem of augmenting the flows of the Ganga 1 Ganges during the dry season

Article 9

Guided by the principles of equity, fairness and no harm to either party, both the Governments agree to conclude water sharing Treaties / Agreements with regard to other common rivers.

Article 10

The sharing arrangement under this Treaty shall be reviewed by the two governments at five years interval or earlier, as required by either party and needed adjustments, based on principles of equity, fairness and no harm to either party made thereto, if necessary. It would be open to either party to seek the first review after two years to assess the impact and working of the sharing arrangement as contained in this Treaty.

Article 11

For the period of this Treaty, in the absence of mutual agreement on adjustments following reviews as mentioned in Article X, India shall release downstream of Farakka Barrage, water at a rate not less than 90 % (ninety per cent) of Bangladesh's share according to the formula referred to in Article II, until such time as mutually agreed flows are decided upon.

Article 12

This Treaty shall enter into force upon signatures and shall remain in force for a period of thirty years and it shall be renewable on the basis of mutual consent.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by the respective Governments, have signed this Treaty.

DONE at New Delhi 12th December, 1996 in Hindi, Bangla and English languages. In the event of any conflict between the texts, the English shall prevail.

Signed	Signed
(H.D. DEVE GOWDA) PRIME MINISTER, REPUBLIC OF INDIA	(SHEIKH HASINA) PRIME MINISTER, PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

ANNEXURE-I

Availability at Farakka	*Share of India*	*Share of Bangladesh*
70,000 cusecs or less	50%	50%
70,000 -75,000 cusecs	Balance of flow	35,000 cusecs
75,000 cusecs or more	40,000 cusecs	Balance of flow

Subject to the condition that India and Bangladesh each shall receive guaranteed 35,000 cusecs of water in alternate three 10-day periods during the period March 1 to May 10.

ANNEXURE-II

Schedule
(Sharing of waters at Farakka between
January 01 and May 31 every year)
If actual availability corespond to average flows of
the period 1949 to 1988 the implication of the
formula in Annex-I for the share of each side is

Period	*Average of actual flow 1949-1988 (cusecs)*	*India's share (cusecs)*	*Bangladesh's share(cusecs)*
Jan			
1-10	107,516	40,000	67,516
11-20	97,673	40,000	57,673
21-31	90,154	40,000	50,154

Period	*Average of actual flow 1949-1988 (cusecs)*	*India's share (cusecs)*	*Bangladesh's share(cusecs)*
Feb			
1-10	86,323	40,000	46,323
11-20	82,839	40,000	42,839
21-30	79,106	40,000	39106
March			
1-10	74,419	39,419	35,000
11-20	68,931	33,931	35,000
21-31	64,688	35,000	29,688
April			
1-10	63,180	28,180	35,000
11-20	62,633	35,000	27,633
21-30	60,992	25,992	35,000
May			
1-10	67,251	35,000	32,351
11-20	73,590	38,590	35,000
21-31	81,834	40,000	41,854